তত্ত্ববিদ্যা।

জ্ঞানকাণ্ড, ভোগকাণ্ড এবং

কর্ম্মকাণ্ড।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

নং ৮ ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৪।

তত্ত্ববিদ্যা।

উপক্রমণিকা।

দুইরূপ সত্যের সমবেত যোগ ভিন্ন কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না,—বিশেষ বিশেষ সত্য এবং নির্ব্বিশেষ সত্য। রূপ রস শীতোষ্ণ প্রভৃতি যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা শরীর অথবা ইন্দ্রিয়াদির সহযোগে উপলব্ধি করি, সেইগুলিই বিশেষ বিশেষ সত্য; এবং দেশ কাল ঐক্যানৈক্য কার্য্যকারণ প্রভৃতি যে সকল অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব কোন দ্রব্য বিশেষে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে না, প্রত্যুত যাহা সাধারণতঃ সকল সামগ্রীতেই ব্যাপিয়া থাকে, সেইগুলিই নির্ব্বিশেষ সত্য। উদাহরণ;—রূপরসাদি-বিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ পদার্থ সকলই আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে কিন্তু রূপরসাদি-বর্জ্জিত অখণ্ড আকাশ কখ-

নও ইন্দ্রিয়ের গম্য নহে অথচ সেই আকাশের সহিত সংশ্রব ছাড়িয়া কোন একটি পদার্থও আমাদের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে প্রকাশ পাইতে পারে না,—ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়ের সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় আকাশের এই রূপ অবশ্যম্ভাবিতা। দ্বিতীয় উদাহরণ,—বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন বিষয় সকল যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখন সকলেরই সঙ্গে আমাদের একই অভিন্ন জ্ঞান নির্ব্বিশেষে (অর্থাৎ ব্যাপক ভাবে) কার্য্য করে; সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থ বিশেষকে প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আপন জ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা—একটি অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এই প্রকার অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক সত্য সকল মূলে না থাকিলে অন্য কোন সত্যই প্রতিভাত হইতে পারে না; যথা,—আকাশ না থাকিলে বাহ্যবিষয় ইন্দ্রিয়-সমক্ষে প্রকাশ পাইতে পারে না, জ্ঞান না থাকিলে জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে না, কারণ না থাকিলে কোন ঘটনাই উৎপন্ন হইতে পারে না, ইত্যাদি। কথিত প্রকার অবশ্যম্ভাবী

এবং সার্ব্বভৌমিক সত্য-সকল সকল তত্ত্বেরই মূল তত্ত্ব; যে বিদ্যা দ্বারা এই সকল মূলতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকেই তত্ত্ব-বিদ্যা কহে। মূলতত্ত্ব-সকল অবগত হইতে পারিলে আমাদের জ্ঞান প্রশস্ত হয়, তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিলে আমাদের ইচ্ছা সুনি-য়মে নিয়মিত হয়, এবং মূলতত্ত্বে প্রীতি অভি-নিবিষ্ট হইলে সুবিমল আনন্দের উপভোগ হয়। সত্য জ্ঞান উপার্জ্জন করা, মঙ্গল ইচ্ছা-নুসারে কার্য্য করা, এবং বিমল আনন্দ উপ-ভোগ করা, এই তিন উদ্দেশ্য অনুসারে তত্ত্ববিদ্যাকে তিন কাণ্ডে বিভাগ করা গেল,—জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড এবং ভোগকাণ্ড। সর্ব্বাগ্রে আপাততঃ জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

নির্ঘণ্ট পত্র।

জ্ঞানকাণ্ড।

ভোগকাণ্ড।

কর্ম্মকাণ্ড।

জ্ঞানকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারণের প্রণালী।

ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া আমরা যে সকল বিশেষ বিশেষ সত্য উপলব্ধি করি তাহাতে আপাততঃ মূলতত্ত্বের কিছুই নিদর্শন পাওয়া যায় না; স্থূল বিষয় সকলই ইন্দ্রিয়-সমক্ষে প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করে, সেখানে ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্যই চলে না। ইন্দ্রিয়-রাজ্য হইতে আর এক গ্রাম উচ্চে উঠিয়া যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, কথিত নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বুদ্ধি-দ্বারা আয়ত্তীকৃত হইতে পারে কি না, তবে তাহার এইরূপ প্রত্যুত্তর পাই যে, তত্ত্বান্বেষণ-কার্য্যে আমাদের বুদ্ধি

ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু নিগূঢ়তম মূলতত্ত্ব সকলেতে কোন রূপেই পৌঁছিতে পারে না। শব্দ স্পর্শাদি বৈষয়িক ব্যাপার সকল ইন্দ্রিয়-সমক্ষে উদ্বোধিত হইবামাত্র, তদুপলক্ষে ঐক্যানৈক্য বস্তু-গুণ কার্য্য-কারণ প্রভৃতি যে কিছু সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার হয়, বুদ্ধি তাহা করিতে প্রস্তুত; কিন্তু, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, গুণ মাত্রেরই বস্তু আছে, অনৈক্য মাত্রেরই মধ্যে ঐক্য আছে, এই যে সকল অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব, ইহারা বুদ্ধির কোন অংশেই গম্য নহে। মূলতত্ত্ব শব্দের সম্যক্ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এইটি দেখা আবশ্যক যে, যদি কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে—মানিতে হয়, তবে অগত্যা ইহাও মানিতে হয় যে, শাখা-কারণ সকলের (অর্থাৎ যাহা কতক অংশে কারণ কতক অংশে কার্য্য—এইরূপ অসম্যক্ কারণ সকলের) কোন মূল কারণ আছে; যদি মানিতে হয় যে গুণমাত্রেরই বস্তু আছে, তবে অগত্যা ইহাও মানিতে হয়

যে, শাখা বস্তু সকলের কোন মূলাধার আছে; যদি মানিতে হয় যে, অনৈক্য মাত্রেরই মধ্যে ঐক্য আছে, তবে অগত্যা ইহাও মানিতে হয় যে, শাখা ঐক্য সকলের মধ্যে কোন মূল ঐক্য আছে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, "কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে" ইত্যাদি মূলতত্ত্ব সকলের অবশ্যম্ভাবিতার এত বল যে, তাহা আমাদিগকে একেবারেই সকল সত্যের মূলে লইয়া উত্তীর্ণ করে; পরন্তু বুদ্ধি অনন্ত কালেও আমাদিগকে তথায় লইয়া যাইতে সমর্থ হয় না।

অশ্ব, গো, হস্তী প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র জন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ঐক্যানৈক্য কিরূপ—ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, বুদ্ধির সাহায্য ব্যতি-রেকে তাহা কদাপি নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অশ্ব, গো, হস্তী ইহাদের মধ্যে সমূহ অনৈক্য বিদ্যমান, তথাপি তাহার মধ্যেও বুদ্ধি পশুত্ব-রূপ ঐক্যের সূচনা পাইয়া, উক্ত অশ্বগবাদি নানাপ্রকার জীবকে পশু-নামক এক শ্রেণীর

অভ্যন্তরে সন্নিবেশিত করে; তদনুসারে আমরা এইরূপ নিশ্চয় করি যে, হস্তী, অশ্ব, গো— ইহাদের মধ্যে শুণ্ড, খুর, শৃঙ্গ ইত্যাদি নানা বিষয়ক অনৈক্য বিদ্যমান সত্ত্বেও, পশুত্ব বিষয়ে উহাদের মধ্যে কিছুমাত্র অনৈক্য নাই—সম্পূর্ণই ঐক্য রহিয়াছে। এই প্রকারে অনৈক্যের মধ্য হইতে ঐক্যের সন্ধান বাহির করত অনেক বিষয়কে এক সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত করাতেই বুদ্ধির ক্ষমতা প্রকাশ পায়। আমাদের বুদ্ধি যদিও এই রূপে সকল বিষয়ের মধ্যেই কোন না কোন প্রকার ঐক্য অনুধাবন করিয়া প্রাপ্ত হয়, তথাপি "সকল সত্যের মূলে অবশ্যই ঐক্য বিদ্যমান থাকিতে চায়" এই যে এক মূল-গত স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস, ইহা বুদ্ধি আমাদিগকে কোন রূপেই আনিয়া দিতে পারে না; পরন্তু ঐ অনিবার্য্য বিশ্বাসটি পূর্ব্ব হইতে আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকাতেই, প্রভূত অনৈক্যের মধ্যেও বুদ্ধি অকুতোভয়ে ঐক্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যদি ঐ বিশ্বাসটি বুদ্ধির মূলে নিয়তই উৎসা-

হের সঞ্চার না করিত, তবে আর কিসের গুণে বুদ্ধির এরূপ প্রবৃত্তি হইতে পারিত যে, সকল বিষয়েতেই সে ঐক্যের অনুসন্ধান করে? অগ্রে মূল ঐক্যেতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই ত বুদ্ধি ঐক্যান্বেষণ-কার্য্যে এত পটু যে, সে কার্য্যে সে কিছুতেই অবসন্ন হয় না। অনৈক্য হইতে ক্রমে ক্রমে ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়া, অজ্ঞান হইতে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া, বিষয় হইতে ক্রমে ক্রমে আত্মার দিকে অগ্রসর হওয়া,—বুদ্ধিক্রিয়ার পদ্ধতি এইরূপ ক্রম-সাপেক্ষ; কিন্তু মূল-ঐক্যের ভাব, মূল-জ্ঞানের ভাব, মূল-আত্মার ভাব, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বুদ্ধি উত্তরোত্তর সিদ্ধি লাভে প্রত্যা-শান্বিত হয়, তাহা আত্মা-মাত্রেতেই স্বপ্রকাশ রহিয়াছে, তাহাতে বুদ্ধির নিজের কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব চলে না। এখন জানা আবশ্যক যে, আত্মার একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতিঃ আছে, যাহাকে প্রজ্ঞা কহা যায়। এই প্রজ্ঞা-দ্বারাই মূল-তত্ত্ব সকলের উপলব্ধি হইতে পারে,—

ইন্দ্রিয়-দ্বারাও নহে, বুদ্ধি-দ্বারাও নহে। বুদ্ধি স্বীয় বিষয়-সকলকে একেবারেই আয়ত্ত করিতে পারে না,—এক বিষয়ের পর অন্য বিষয়, তাহার পর আর এক বিষয়, এই রূপ ক্রমে উহা স্বকার্য্য-সাধনে অগ্রসর হয়। যথা, আমরা প্রথমে একরূপ বর্ণ দেখি, পরে আর এক রূপ বর্ণ দেখি, ইহা হইতে বুদ্ধি বর্ণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে; আমরা একবার অশ্ব দেখি, পরক্ষণে গো দেখি, অন্যবার হস্তী দেখি, ইহা হইতে বুদ্ধি পশু-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে; এই রূপ বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব সকলের দিকে অগ্রসর হয়। পরন্তু "কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্য্য হইতে পারে না" এই রূপ মূল-তত্ত্ব সকলেতে প্রজ্ঞা একেবারেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে,—নানা বিষয়ের উত্তরোত্তর পরীক্ষা হইতে বুদ্ধি যেরূপে জ্ঞানোপার্জ্জন করে, ঈশ্বরপ্রসাদাৎ প্রজ্ঞাকে সেরূপ কিছুই করিতে হয় না, প্রজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ। প্রজ্ঞার সত্য-সকল, সর্ব্বত্রই ও সর্ব্ব কালেই বলবৎ, উহাতে একটুকুও

দ্বিধা স্থান পাইতে পারে না—উহা নির্ব্বিকল্প। পাপী যে গ্লানি ভোগ করে, পুণ্যবান্ যে প্রসন্নতা লাভ করে, মধু-মক্ষিকা যে মধু-চক্র নির্ম্মাণ করে, ও পক্ষী যে নীড় প্রস্তুত করে, বৃক্ষ লতা যে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, ও গ্রহগণ যে সূর্য্য-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া নিয়মিত পথে ভ্রমণ করে. বিদ্যুৎ যে লৌহকে চুম্বক করে এবং চুম্বক যে লৌহকে আকর্ষণ করে; সকলেরই একটি না একটি গূঢ় অর্থ আছে। প্রজ্ঞা সমুদায় জগতেরই সেই গূঢ় অর্থ-সকলে পরিপূর্ণ, প্রজ্ঞাই সমুদায় জগতের তাবৎ ঘটনার অর্থ অবিতথ রূপে প্রকাশ করিতে পারে। উদাহরণ,—উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন ঘটনাই সম্ভবে না—প্রজ্ঞার এই একটি মূলতত্ত্বকে ছাড়িয়া একটি রেণুকণাও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে; উক্ত মূল-তত্ত্ব ব্যতিরেকে কোন ঘটনারই এক বিন্দুও অর্থ হইতে পারে না; প্রত্যুত যে কোন ঘটনার অর্থ আমাদের বোধগম্য হয়, তাহা উক্ত মূল-তত্ত্বেরই প্রসাদাৎ।

বুদ্ধির আনুষঙ্গিক তত্ত্ব এবং প্রজ্ঞার মূল তত্ত্ব, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখাইয়া দিলে প্রজ্ঞার ভাব অতীব সুস্পষ্ট রূপে বোধগম্য হইতে পারে। প্রত্যহই সূর্য্যোদয় হইবে, ইহা একটি বুদ্ধির তত্ত্ব; শৈশবকালাবধি আমরা প্রত্যহই নিশান্তে প্রভাত অবলোকন করিতেছি, প্রতি দিবসের এই রূপ ঘটনা-পরম্পরা হইতে বুদ্ধি উক্ত তত্ত্বটি সঙ্কলন করিয়া লইয়াছে; এবং যত অধিক দিন ঐ রূপ ঘটনা ঘটিতেছে, কথিত তত্ত্ব ততই দৃঢ়তর হইতেছে; যদি দৈবক্রমে এক দিন সূর্য্যোদয় না হয়, তাহা হইলে উক্ত তত্ত্ব একটুকু শিথিল হইবে; দুই দিন যদি সূর্য্যোদয় স্থগিত থাকে, তবে উহা আরো শিথিল হইবে; মধ্যে মধ্যে যদি সূর্য্যোদয় অবসর গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহার মূল সংশয়-তরঙ্গ কর্ত্তৃক বহুতর আঘাত প্রাপ্ত হইবে। অতএব "প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইতেছে" এই দৃষ্ট ঘটনা অনুসারেই উক্ত তত্ত্ব দিন দিন বল পাইতেছে; সুতরাং উহা দৃষ্ট ঘটনা-

বলীর আনুষঙ্গিক। এই জন্যই বুদ্ধির তত্ত্বকে আনুষঙ্গিক বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে; এক্ষণে প্রজ্ঞার তত্ত্ব কি রূপ দেখা যাউক।

অতীব শৈশব কালে আমরা সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম; তৎপরে ক্রমে আমাদের বুদ্ধিতে এই রূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছে যে প্রত্যহই সূর্য্যোদয় হইবে, অতএব বুদ্ধির উদ্রেক ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার পশ্চাদ্বর্ত্তী—প্রজ্ঞার উদ্রেক বুদ্ধিরও পশ্চাদ্বর্ত্তী। প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইতেছে, ইহার যে অবশ্য কোন একটি উপযুক্ত কারণ আছে, এ তত্ত্বটি নিতান্ত বালকের মনে সহসা বোধগম্য না হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যে মনুষ্যে এক বার প্রজ্ঞার উদ্রেক হইয়াছে, তাহার মনে উহা অখণ্ডনীয় মূলতত্ত্ব রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। বুদ্ধি যেমন পরীক্ষাকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়, প্রজ্ঞা সেরূপ করে না;—প্রজ্ঞা যখন উদ্বোধিত হয়, তখন সে অচিরাৎ পরীক্ষারূপ শৃঙ্খল ছেদ করিয়া আপন

মহিমাতে বিরাজ করিতে থাকে। "প্রত্য-হই সূর্য্যোদয় হইবে" এ সিদ্ধান্তটি তত ক্ষণই বলবৎ থাকে, যত ক্ষণ পরীক্ষাতে প্রত্যহই সূর্য্যোদয় উপলব্ধি করা হয়, কিন্তু "কারণ ব্যতীত কোন ঘটনাই ঘটে না" এতত্ত্বটি অবগত হইবার জন্য পরীক্ষার কিছু-মাত্র প্রয়োজন হয় না; —কারণ, প্রজ্ঞা—শুদ্ধ মাত্র আপনার বলে ইহা যৎপরোনাস্তি অবি-তথ রূপে স্থাপন করিতে পারে যে, ঘটনা মাত্রেরই কারণ আছে। সূর্য্য এক দিন না উঠিতে পারে; এমন দেশ আছে যেখানে ছয় মাস সূর্য্যোদয় স্থগিত থাকে; কিন্তু ঘটনা-বিশেষের উপযুক্ত কারণ আছে, এ সত্যটি কোন দেশে, কোন কালে, কোন অব-স্থাতেই ব্যর্থ হইবার নহে। দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে বুদ্ধির আনুষঙ্গিক তত্ত্ব-সকলের বিপর্য্যয় সম্ভবে; কিন্তু প্রজ্ঞার মূল তত্ত্ব-সকল সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব স্থানে ও সকল অব-স্থাতেই সমানরূপ বলবৎ থাকে—উহা অব-শ্যম্ভাবী, নির্ব্বিকল্প ও সার্ব্বভৌমিক।

বুদ্ধি মনোদ্বার দিয়া ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়-পরম্পরা হইতে নানাবিধ আনুষঙ্গিক তত্ত্ব-সকল সংগ্রহ করিয়া লয়; প্রজ্ঞা মূলতত্ত্ব-সকলকে সাক্ষাৎ আত্মাতেই স্বপ্রকাশ দেখিতে পায়। ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়-সকল যেরূপ বুদ্ধির উপজীবিকা, আত্মা সেইরূপ প্রজ্ঞার উপজীবিকা; বুদ্ধি যে রূপ বিষয় হইতে বিশ্বের জ্ঞানে আরোহণ করে, প্রজ্ঞা সেই রূপ আত্মা হইতে পরমাত্মার জ্ঞানে সমুত্থান করে। পশুত্ব জীবত্ব প্রভৃতি বুদ্ধির সংগৃহীত তত্ত্ব-সকল জ্ঞানের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, কিন্তু পরম-সত্য পরম-কারণ প্রভৃতি প্রজ্ঞার মূলতত্ত্ব-সকল জ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অলঙ্ঘনীয়; সত্য-ভাব কারণ-ভাব ব্যতিরেকে জ্ঞান একটি রেণু-কণাকেও জানিতে সমর্থ হয় না। পশুত্ব প্রভৃতি ভাব-সকলকে আমরা বাহিরের পরীক্ষা হইতে উপার্জ্জন করি, কিন্তু সত্য প্রভৃতি পরাকাষ্ঠা ভাব-সকলকে আমরা আত্মা হইতেই প্রাপ্ত হই—আত্মা হইতে প্রাপ্ত হই বটে কিন্তু পরমাত্মাই উহাদিগের

পরম নিধান। যেমন পশুত্ব প্রভৃতি ভাব-সকলকে আমরা নানাবিধ দৃষ্ট বস্তু হইতে প্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু আমাদের আত্মার জ্ঞানোপার্জ্জন-শক্তিই তাহার মূল, সুতরাং আত্মাকে ছাড়িয়া সে-সকল ভাব কিছুই নহে। সেই রূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া সত্য প্রভৃতি প্রজ্ঞার ভাব-সকল কিছুই নহে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে যে সকল বিষয়ের আভাস-মাত্র কটাক্ষ করা হইল, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার সবিশেষ তথ্য-সকল পরিষ্কার রূপে বিবৃত হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইন্দ্রিয়-বোধ, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার আধার-গত বিভিন্নতা।

ইন্দ্রিয়বোধ, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা, এ তিনের মধ্যে বাস্তবিক যে প্রভেদ আছে, ইহা পূর্ব্ব অধ্যায় দৃষ্টে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

এক্ষণে সে প্রভেদ কিরূপ, তাহার সবিশেষ তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়বোধ ব্যতিরেকে আমরা কোন বিষয়কেই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহি। এই সকল ইন্দ্রিয়-বোধ কোথা হইতে আইসে? আমাদের অন্তরে—যেখানে আমরা জীবাত্মাকে উপলব্ধি করি—সেখান হইতে নহে; এবং তাহারও অভ্যন্তরে—যেখানে আমরা সকল আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করি—সেখান হইতেও নহে; কিন্তু বাহিরের ভৌতিক বস্তু-সকল হইতেই উহারা উদ্ভূত হয়। ভৌতিক বস্তু-সকলকেই আমরা রূপ রস প্রভৃতির আধার বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকি। যখন আমাদের ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে বোধ-বিশেষের আবির্ভাব হয়, তখন আপনা হইতেই এই এক প্রত্যয় আইসে যে, উক্ত বোধোদয়ের কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে; এবং সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে উক্ত বোধ আমাদের স্বীয় ইচ্ছাতে-করিয়া

উৎপন্ন হয় নাই ; অতএব আমারদের স্বাধীন আত্মা উহার কারণ নহে, অন্য কোন পদার্থই উহার কারণ হইবে।

বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বোধের সাক্ষাৎ কারণ যদি আমরা আপনারা না হইলাম, তবে কি স্বয়ং ঈশ্বর উহার সাক্ষাৎ কারণ ? এখানে দেখা উচিত যে, ঈশ্বর শব্দে কি অর্থ বুঝায় ? অবশ্য—যিনি সমুদায়েরই মূল কারণ, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি ; এই জন্য ঈশ্বর-শব্দে এইরূপ ব্যাপক অর্থ বুঝায় যে, তিনি যেমন আলোকের কারণ, সেইরূপ তিনি শব্দেরও কারণ, সেইরূপ তিনি সকল ঘটনারই কারণ। পরন্তু যদি এমন কোন সঙ্কীর্ণ বস্তু হয় যে, তাহা কেবল আলোকেরই কারণ কিন্তু শব্দের কারণ নহে, কিংবা কেবল শব্দেরই কারণ কিন্তু আলোকের কারণ নহে, অথবা কোন একটি বিশেষ কার্য্যের কারণ কিন্তু অন্য কোন কার্য্যের কারণ নহে ; তবে সেই পরিমিত কারণকে লক্ষ্য করিয়া কখন বলা যাইতে পারে

না যে, তাহা সমুদায়েরই মূল কারণ—স্বয়ং ঈশ্বর। এই জন্য ঈশ্বরকে যখন আমরা বলি যে তিনি সমুদায়েরই মূল কারণ, তখন তাহাতে ইহাই বলা হয় যে, যদিও ঘটনা বিশেষের সাক্ষাৎ কারণ তাঁহারই ইচ্ছাতে নিযুক্ত রহিয়াছে, তথাপি তিনি স্বয়ং তাহা নহেন। অতএব বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বোধের বিশেষ বিশেষ কারণ ভৌতিক বস্তু ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়-বোধে আমাদের আপন কর্ত্তৃত্বের অভাব উপলব্ধি হয় বলিয়াই আমরা উহার কারণ বাহিরে নির্দ্দেশ করিতে কাযেকাযে বাধ্য হই; কিন্তু যে কোন ক্রিয়া আমাদের আপন কর্ত্তৃত্বে সাধিত হয়, তাহার যে আমরা আপনারাই কারণ, ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র। আমরা যদি পশুদিগের ন্যায় রূপ দর্শন, শব্দ শ্রবণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-কার্য্য সম্পাদন মাত্রেই ক্ষান্ত থাকিতাম, তাহা হইলে আমরা আপনাকে কখনো দ্রষ্টা এবং শ্রোতা রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতাম না। যদি এ

রূপ হইত যে, যখনি আমাদের চক্ষুতে আলোক নিপতিত হয়, তখনি পতঙ্গবৎ মূঢ় ভাবে আমারদের মন তাহার প্রতি আশক্ত হয়; যখনি শ্রবণে শব্দ প্রবিষ্ট হয়, তখনি মন তাহার প্রতি ধাবিত হয়; এবং তৎ তৎ সময়ে অথবা অন্য কোন সময়ে আমরা স্বাধীন-রূপে কোন কিছুতে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ না হই; তাহা হইলে বর্ণ দর্শন শব্দ শ্রবণ প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন ঘটনা সকলের মধ্যে আমরা এ রূপ কোন যোগ নিবদ্ধ করিতে পারিতাম না, যাহাতে আমারদের আপন কর্ত্তৃত্ব বোধ-গম্য হইতে পারিত এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে উপলব্ধি হইত। কিন্তু ঈশ্বরের অপর্য্যাপ্ত মঙ্গলভাব—মনুষ্যকে কেবল ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দিয়াই ক্ষান্ত নহে; বুদ্ধিরূপ আর এক উৎকৃষ্টতর বৃত্তি দিয়া উহার সমক্ষে উন্নতির গগণ-ভেদী সোপান-পরম্পরা অনাবৃত করিয়া দিয়াছে। এই বুদ্ধিই আমারদিগের কর্ত্তৃত্বের নিদানভূত—কেবল হস্ত পদ চালনাতেই কর্তৃত্ব হয় না; বুদ্ধি পূর্ব্বক আমরা

যে কোন কার্য্য করি, তাহাতেই আমাদের কর্তৃত্ব।

আমরা যখন বাহ্য বস্তু বিশেষকে প্রত্যক্ষ করি, তখন সঙ্গে সঙ্গে এই এক শক্তি অন্তরে অনুভব করি যে, ইহার সমান অন্য অন্য বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ অথবা কল্পনা করিলেও করিতে পারি; সুতরাং প্রত্যক্ষ-ক্রিয়াতে আমারদের মন উপস্থিত বিষয়েতেই সর্ব্বসমেত আবদ্ধ থাকে না; পরন্তু উহা উপস্থিত বিষয়ের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের আপন বশে থাকে, তাহাতে আর সংশয় নাই; এই হেতু আমরা স্বীয় চেষ্টা দ্বারা আমারদের মনকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অনায়াসে নিয়োগ করিতে পারি। আমরা যখন চেতনা-সহকারে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে মনো-নিবেশ করি, তখন উজ্ঝিত বিষয় আমারদের স্মরণে আবদ্ধ থাকে, উপস্থিত বিষয় আমাদের সংজ্ঞাতে প্রতিভাত হয়, এবং দুয়ের যোগ—কল্পনাতে সম্ভাবিত হয়। যথা,—আমরা চেতনা-সহকারে প্রথমে

একটা অশ্বকে প্রত্যক্ষ করিলাম, পরে একটা গো-কে প্রত্যক্ষ করিলাম গো-কে যখন সংজ্ঞাতে উপলব্ধি করিতেছি, তখন অশ্ব আমাদের স্মরণে বর্ত্তমান আছে ; এবং যখন গো এবং অশ্ব উভয়কেই পশু রূপ এক শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত করিতেছি, তখন ইতিপূর্ব্বে উহারা অবশ্যই কল্পনা-সূত্রে সংগ্রথিত হইয়াছে। পশু শব্দ বলাতে আপাততঃ কোন বিশেষ পশুকে বুঝায় না, কিন্তু সাধারণ রূপে সকল পশুকেই বুঝায়। যথা ;— অশ্ব যদিও পশু বটে, কিন্তু অশ্বই যে কেবল পশু এমন নহে, গোও পশু, হস্তীও পশু ; সুতরাং পশু বলিলে যে কেবল অশ্বকেই বুঝায়—এমন নহে, গো-কেও বুঝায়, হস্তীকেও বুঝায়। এখানে জানা আবশ্যক যে, অশ্ব, গো, হস্তী, এইরূপ বিশেষ বিশেষ পশুই আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হইতে পারে। পরন্তু জাতি-বাচক পশু, যাহা অশ্বও হইতে পারে, গোও হইতে পারে, হস্তীও হইতে পারে, তাহা কদাপি ইন্দ্রিয়-দ্বারা লক্ষিত হইতে

পারে না। ইন্দ্রিয়-গম্য অশ্ব, গো, হস্তী,—ইহারাই বিশেষ বিশেষ বিষয় ; জ্ঞান-গম্য পশু—উহাদের সম্বন্ধে একটি সাধারণ তত্ত্ব। অতএব গো বা অশ্ব বিশেষকে যখন আমরা পশু বলিয়া নিশ্চয় করি, তখন তাহাতে—বিশেষ বিশেষ বিষয়কে একটি সাধারণ তত্ত্বের অন্তর্গত করা হয়,—এই রূপ ক্রিয়াকেই বুদ্ধি কহে। সম্যক্ চেতনা-সহকারে অশ্বকে স্মরণে রাখিয়া গো-কে প্রত্যক্ষ করাতে, বা গো-কে স্মরণে রাখিয়া অশ্বকে প্রত্যক্ষ করাতে, বিশেষতঃ পশু-রূপ উভয়ের সামঞ্জস্য-ভাব স্মরণে রাখিয়া উহারদের কোনটির প্রতি মনো-নিবেশ করাতে, এই রূপ সাধারণ হইতে বিশেষ-বিশেষে অবতীর্ণ হওয়াতে, আমারদের আপনাদেরই কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়। এই হেতু ইন্দ্রিয়-বোধের সাক্ষাৎ আধার যে রূপ ভৌতিক বস্তু, বুদ্ধি-ক্রিয়ার সাক্ষাৎ আধার সেই রূপ আমরা আপনারা। বিষয়-বিশেষকে সজ্ঞান ভাবে প্রত্যক্ষ করাতেই বুদ্ধির প্রথম সূত্রপাত। আমরা যখন একটা অশ্বকে প্রত্যক্ষ

করি, তখন, যাহা অশ্ব নহে এমন সকল সামগ্রী হইতে উহাকে বিশেষ করিয়াই উহার প্রতি মনঃসংযোগ করি। এস্থলে জানা আবশ্যক যে যেমন কার্য্য বলাতে কারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ বুঝায়, অনেক বলাতে একের সহিত তাহার সম্বন্ধ বুঝায়, সেই রূপ বিশেষ বলাতে সাধারণের সহিত তাহার স্বম্বন্ধ বুঝায়। কার্য্য কারণ, এক অনেক, সাধারণ বিশেষ ইত্যাদি যুগল-গণের একটিকে যেখানে ব্যক্ত করা হয়, অন্যটি সেখানে কাযে কাযেই উহ্য থাকে। অতএব আমরা যখন একটা অশ্বকে অন্য অন্য সামগ্রী হইতে বিশেষ করিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন অশ্ব এবং উক্ত অন্য অন্য সামগ্রী সম্বন্ধে সাধারণ কোন কিছু অবশ্যই আছে,—অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ-বিষয়ের সম্বন্ধে যাহা সাধারণ, তাহা আমারদের স্ব স্ব জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। একই জ্ঞান কর্ত্তৃক অশ্ব, গো, হস্তী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সকল প্রত্যক্ষ হয়; বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ-বিষয় বলিবা-

মাত্র একই চেতন-পদার্থ উহাদের সাধারণ প্রত্যক্ষ-কর্ত্তা রূপে আপনা হইতেই প্রতিপন্ন হয়। এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, অশ্ব-বিশেষকে পশু বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার এই মাত্র অর্থ যে, অশ্ব, গো, হস্তী, ইহারা সকলে সাধারণ-রূপে একই চেতনের জ্ঞাতব্য বিষয়। এই রূপ সাধারণ চেতনকে মনোযোগ-দ্বারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে নিযুক্ত করাতে বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব প্রকাশিত হয়; এবং বুদ্ধির দ্বারা বস্তু সকলকে বিশেষ বিশেষ করিয়া জানিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতা-রূপে আপনাকে উপলব্ধি করা অগত্যাই ঘটিয়া উঠে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয় বোধ অনুসরণ করিয়া আমরা যে রূপ ভৌতিক বস্তুতে উপনীত হই, সেই রূপ বুদ্ধি-ক্রিয়া অনুসরণ করিয়া আমরা আপন আত্মাতে উত্তীর্ণ হই।

পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে ইন্দ্রিয়-বোধ-সকলের আধার বহির্ব্বস্তু, এক্ষণে পাওয়া গেল যে বুদ্ধি-ক্রিয়ার আধার আমার-

দের আত্মা। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—যাহাকে প্রজ্ঞা কহা যায়—যাহা কোন সৃষ্ট জীবের কর্ত্তৃত্বের উপর নির্ভর করে না—তাহার আধার কোন্ বস্তু? স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান তাহাকেই বলিতে পারা যায়, যাহা আপনা হইতেই সিদ্ধ, আপনাতেই পর্য্যাপ্ত, যাহা আর কাহারো সহায়তার অপেক্ষা করে না; এবং যেখানে যত জ্ঞান আছে বা হইতে পারে, সকলেরই মূলে—যাহা অবশ্যম্ভাবি-রূপে বর্ত্তমান থাকিতে চায়। পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখা হইয়াছে যে অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক মূল-তত্ত্ব-সকলই প্রজ্ঞার সম্বল; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে সে সকল মূলতত্ত্ব কোথা হইতে আইসে? উহারা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে যে উহারা বাহিরের কোন পদার্থ হইতে আসিবে; উহারা বুদ্ধি কর্ত্তৃক পরীক্ষা-পরম্পরা হইতে সংগৃহীত নহে যে—উহারা আমাদের স্বীয় কর্ত্তৃত্বে সম্ভাবিত হইবে; প্রত্যুত উহারা পূর্ব্ব হইতে আমারদের আত্মাতে আছে বলিয়াই এত কাল

আমরা বুদ্ধি-বৃত্তি-সকলকে চালনা করিতে পারিয়াছি ও ভৌতিক বস্তু-সকলকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। দেশ অসীম, কাল অসীম, আমি এক, ঘটনা মাত্রেরই কারণ আছে, ইত্যাদি তত্ত্বগুলিকে যদি বুদ্ধি খাটাইয়া পরীক্ষা সহকারে জানিতে হইত, তাহা হইলে আমরা কোন কালেই তাহাতে কৃত-কার্য্য হইতাম না। দেশ অসীম - ইহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি বলিয়া, অগণ্য অগণ্য নক্ষত্রকে অবলীলাক্রমে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি; কাল অসীম - ইহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি বলিয়া, শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা ছিল, অদ্য তাহা অম্লান বদনে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি; আমি এক - ইহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি বলিয়া, পরীক্ষা দ্বারা শত শত ঘটনাকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছি; ঘটনা-মাত্রেরই কারণ আছে—ইহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি বলিয়া, যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহারই কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত

হইতেছি। পণ্ডিতেরা ইহাও পরীক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই যে, পৃথিবীর স্থান-বিশেষে সূর্য্যের দৈনিক উদয়াস্ত হয় কি না; কিন্তু দেশ কাল—অসীম কি সসীম? আমি এক কি অনেক? ঘটনাবিশেষের কোন কারণ আছে বা নাই? এ সকল বিষয় পরীক্ষা করা উন্মাদ ভিন্ন আর কাহারও কার্য্য হইতে পারে না। মূলতত্ত্ব-সকলকে আমরা বহির্ব্বস্তু হইতে প্রাপ্ত হই নাই, আপন কর্ত্তৃত্বে পরীক্ষা করিয়াও প্রাপ্ত হই নাই, তবে উহারদিগকে কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি? মূলতত্ত্ব-সকল অবশ্যম্ভাবী, নির্ব্বিকল্প, সার্ব্বভৌমিক ও অনতিক্রমণীয়; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী, নির্ব্বিকল্প, অনতিক্রমণীয়, সর্ব্বান্তর্যামী, এক জন পুরুষ হইতেই উহা আমারদের আত্মাতে প্রকাশিত হইতেছে। অনেক প্রত্যক্ষ-বিষয়ের মধ্য হইতে বুদ্ধি যখন এক একটি তত্ত্ব সংগ্রহ করে, তখন তাহাতে যেমন একই জীবাত্মার উপলব্ধি হয়; সেই রূপ প্রজ্ঞা যখন অনেক জীবাত্মার মধ্য হইতে এক এক মূলতত্ত্বের

সন্ধান পায়, তখন তাহাতে একই পরমাত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়াই মূলতত্ত্ব-সকল সকলের আত্মাতেই সমান-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমরা যে-সকল জ্ঞান আপন বুদ্ধি-প্রভাবে উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহার মূল আমরা আপনারা, ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না; কিন্তু যাহা আমরা বুদ্ধি চালনা ব্যতিরেকেও সহজেই প্রাপ্ত হইয়াছি, এমন সকল সহজ জ্ঞানের কেবল তিনিই মাত্র আকর হইতে পারেন—যিনি আমারদের আত্মার আকর। যাঁহা হইতে আমরা আত্মা পাইয়াছি এবং যাঁহার বলে আমাদের আত্মা বিধৃত রহিয়াছে, তাঁহা হইতে আমারদের সহজ জ্ঞান-সকল সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইতেছে। আমি যেমন আপনার চেষ্টাতে পৃথিবীতে আসি নাই, "আমি আছি" এ জ্ঞানও সেইরূপ আমার আপন চেষ্টাতে উদ্ভূত হয় নাই,—প্রত্যুত আমি যেখান হইতে আসিয়াছি, "আমি আছি" এ জ্ঞানও সেইখান হইতে

আসিয়াছে এবং অদ্যাপি আসিতেছে। এইরূপ আর আর যত মূল জ্ঞান আছে, সকলই সেই একই আকর হইতে উৎসারিত হইতেছে। প্রজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃ-সিদ্ধ জ্ঞান যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্ফূর্ত্তি পায়, তিনি অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বয়ম্ভু পুরুষ; প্রজ্ঞা সকল-জ্ঞানের মূল-বর্ত্তী,—মূলজ্ঞান যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তে, তিনি অবশ্য মূলাধার পুরুষ; প্রজ্ঞা—এইরূপ—পরমাত্মার প্রতি আমাদের লক্ষ্যকে প্রত্যাবর্ত্তিত করে। ইন্দ্রিয়-বোধ-রূপ লক্ষণ যেমন বহির্বস্তু রূপ আধারকে জ্ঞাপন করে, বুদ্ধি-রূপ লক্ষণ যেমন জীবাত্মারূপ আধারকে জ্ঞাপন করে, প্রজ্ঞা-লক্ষণ—সেইরূপ সর্ব্ব-মূলাধার পরমাত্মাকে জ্ঞাপন করে।

বর্ত্তমান প্রস্তাব-সম্বন্ধে দর্শনকারদিগকে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, যাঁহারা বলেন যে অন্ধ শক্তি হইতে মূল-তত্ত্ব-সকল উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহারদিগকে শাক্ত উপাধি দেওয়া যাইতে

পারে। দ্বিতীয়, যাঁহারা বলেন যে বুদ্ধি হইতে মূলতত্ত্ব-সকল উদ্ভূত হইয়াছে— সুতরাং আমরা আপনারাই মূলতত্ত্ব-সকলের উদ্ভাবক–তাঁহারদিগকে বৌদ্ধ উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। তৃতীয়, যাঁহারা বলেন, পরব্রহ্মই মূলতত্ত্ব-সকলের সর্ব্বস্ব–তাঁহাদের কথাই যথার্থ–তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম উপাধি দেওয়া গেল। শাক্তেরা জড় শক্তিকেই মূল সত্য বিবেচনা করেন; ইঁহারদের মতে জড় শক্তি হইতেই আত্মা উদ্ভূত হইয়াছে, এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। বৌদ্ধেরা আপনাকেই মূল সত্য বিবেচনা করেন। ইহাঁরা মনে করেন যে যদি আমি না থাকিতাম, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে জগৎও থাকিত না, ঈশ্বরও থাকিতেন না,— আমি থাকাতেই আমার সম্বন্ধে ঈশ্বর থাকিতে পারিতেছেন ও জগৎ থাকিতে পারিতেছে। অতএব আমিই মূল সত্য, আর আর সত্য আমারই আনুষঙ্গিক। ইঁহাদের মতে বাহিরের জড় বস্তু-সকল আমাদের স্ব স্ব জীবাত্মা-

রই আবির্ভাব, এবং ঈশ্বর জীবাত্মা-রই প্রকল্পিত একটা ভাব-মাত্র। ইঁহারা সকল তত্ত্বেরই বাস্তবিকতা বিষয়ে সংশয় করেন; কারণ আমি লইয়া যখন সকল সত্য, তখন আমার বাহিরে সত্য কিরূপে থাকিবে,—ভ্রমবশতই আমরা বস্তু-সকল বাহিরে উপলব্ধি করি। এইরূপ বৌদ্ধেরা অবশেষে সংশয়বাদী হইয়া পরিণত হন। ব্রাহ্মেরা বলেন যে পরব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই স্থিতি করিতেছে এবং তাঁহারই প্রসাদাৎ অনন্ত কাল উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। সকলই বাস্তবিক; সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রসাদে সকলই সত্য, কিছুই স্বপ্নবৎ অর্থ-শূন্য নহে, সকলেরই গূঢ় অর্থ আছে; সকলই মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে; মূলে সকলই সত্য, পরিণামে সকলই মঙ্গল; পরব্রহ্ম সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় জগৎ ধারণ করিতেছেন। এই তিন প্রকার মতের মধ্যে শেষোক্ত মতই সত্য, তাহাতে আর সংশয়

নাই। শাক্তেরা এই রূপ সিদ্ধান্ত করেন যে ইন্দ্রিয়-বোধ হইতেই ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উদ্রেক হয়। বৌদ্ধেরা এই রূপ স্থির করেন যে আমাদের আত্ম-কর্ত্তৃত্ব অবশ্য ইন্দ্রিয়-বোধ হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু আমরা যেহেতু বুদ্ধিরই স্রোত অনুসরণ করিয়া প্রজ্ঞাতে আরোহণ করি, এই হেতু বুদ্ধির দ্বৈধ-জনক তর্ক-বিতর্ক-ময় সিদ্ধান্তেরই উপর প্রজ্ঞার তত্ত্ব-সকল নির্ভর করিতেছে। ব্রাহ্মেরা এই রূপ নিশ্চয় করেন যে ইন্দ্রিয়-বোধ হইতে বুদ্ধি উদ্ভূত হয় না, এবং বুদ্ধি হইতেও প্রজ্ঞা উদ্ভূত হয় না; কিন্তু উহারা তিনই আপন আপন উচ্চ নীচ পদবী অনুসারে সমবেত হইয়া কার্য্য করে। অস্ফুট মুকুলের পত্র-সকল যেরূপ সংহত-ভাবে অবস্থান করে, এবং প্রস্ফুটন-কালে উহারা যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিণত হয়; সেই রূপ অতীব শৈশব কালের অস্ফুট অবস্থায় ইন্দ্রিয়-বোধ, বুদ্ধি, এবং প্রজ্ঞা তিনই সংহত ও সম্বৃত ভাবে অবস্থান করে, পরে বয়োবৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে উহারা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। মনুষ্যের শৈশব কালে ইন্দ্রিয়-বোধ-সকল যেমন প্রস্ফুটিত হইতে থাকে বুদ্ধিও তেমনি প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া বিষয়-সকলকে আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে থাকে। শৈশব কালে সকল ঘটনাই নূতন— সে সময়ে "কি জানিব? জানিবার আছে কি? জানিয়া ফল কি?" এবংবিধ বিলাপ-ধ্বনির এক মুহূর্ত্তও অবকাশ থাকে না। নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে গেলে ব্যাকরণ আবশ্যক, গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক, আর কত না আবশ্যক; কিন্তু এক জন অনভিজ্ঞ শিশু কেমন অব-লীলা-ক্রমে একটা ভাষাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে—উহাকে চেষ্টা করিয়া কেহই শিক্ষা দান করে না,—উহার আপন সহজ চেষ্টাই সর্ব্বস্ব। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে কুক্কুরাদি জন্তু-বিশেষ যেমন ইন্দ্রিয়-বোধের উত্তেজনা-বশতঃ মনুষ্যের কথানুসারে কার্য্য করে, শিশুর ভাষা শিক্ষাও সেই প্রণালীতেই সম্পন্ন হয়; কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই

প্রকাশ পাইবে যে পূর্ব্বোক্তের সহিত শেষো-ক্তের কেবল মাত্রার প্রভেদ নহে, উহাদের মধ্যে স্বরূপতই প্রভেদ। একটা কুক্কুর প্রভুর মুখ হইতে একটি বিশেষ শব্দ শুনিবামাত্র অমনি একটি বিশেষ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে ; কিন্তু সহস্র কথা কর্ণ-গোচর করিয়াও একটি ব্যাকরণ-ঘটিত নিয়মকে কোন কালে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। পূর্ব্বোক্ত রূপ বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বোধের অনুবর্ত্তী হইয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করা—অন্ধ অভ্যা-সেরই গুণে হইয়া থাকে; কিন্তু বিশেষ বিশেষ শব্দ শ্রবণ হইতে ব্যাকরণ-ঘটিত সাধারণ নিয়মে পদ নিক্ষেপ করা—সবিশেষ বুদ্ধি চালনা ব্যতি-রেকে কোন রূপেই সম্ভব-সাধ্য নহে। একটা কুক্কুর শ্রুত শব্দ অনুসারে কার্য্য করে মাত্র, কিন্তু একটি শিশু, কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাকরণের নিয়মানুসারে শব্দের অর্থ সংগ্রহ করিয়া লয়। এই দুই ক্রিয়া যে এক নহে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। একটি শিশু কেমন আগ্রহের সহিত নূতন নূতন বস্তুর

প্রতি মনঃ সমর্পণ করে, এবং কেমন অ ক্লেশে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা-সকলের সহিত উপস্থিত ঘটনা-সকলের যোগ সাধন করিয়া জ্ঞানরাজ্যকে ক্রমশই বিস্তার করিতে থাকে। পরিবার-পাঠশালা——মাতা পিতা যেখানকার শিক্ষক ও ভ্রাতা ভগিনী যেখানকার বয়স্যদল—এই আদিম পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি মনোযোগ করিয়া দেখিলে কোন্ সচেতন ব্যক্তি এরূপ কথা মুখে আনিতে পারেন যে, শিশুদিগের অস্ফুট হৃদয়ে মনুষ্যত্বের অধিষ্ঠান নাই! পরিবার-পাঠশালার স্নেহময় ক্রোড় হইতে সামাজিক পাঠশালায় প্রবেশ কালে বালকেরা সহজ অবস্থা হইতে কঠোরতায় পদ নিক্ষেপ করে; এক জন বালক পরিবার-পাঠশালায় কোন শৃঙ্খলা ব্যতিরেকেও যে ব্যাকরণ দুই বৎসরে আয়ত্ত করিয়াছে, সামাজিক পাঠশালায় তাহাই আবার শৃঙ্খলা-অনুসারে শিক্ষা করিতে গিয়া চারি বৎসরেও পারিয়া উঠে না। মনুষ্য-শিশুর মনে বাহির হইতে যেমন ইন্দ্রিয়-বোধ কার্য্য

করিতে থাকে, অন্তর হইতেও সেই রূপ বুদ্ধির প্রভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, এবং তাহার আরও অভ্যন্তর হইতে, প্রজ্ঞার প্রসাদ— ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, অবতীর্ণ হইতে থাকে। প্রজ্ঞা ব্যতীত মনুষ্যোচিত উন্নতিশীল বুদ্ধি-ক্রিয়া কি রূপে চলিবে? বুদ্ধি-কর্ত্তৃক জ্ঞান-উপার্জ্জনের অন্ত নাই;—মনুষ্যের মন ক্রমিকই ভাবিতেছে, ক্রমিকই বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেছে, ক্রমিকই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছে, উহা এক দণ্ডও নিশ্চিন্ত নাই। উহা যখন জ্ঞান-পথের এক বার পথিক হইয়াছে, তখন উহা চিরকালই তাহাই থাকিবে; কিন্তু উহার গম্য নিকেতন কোথায়? জ্ঞানের মূল উৎস কোথায়? জ্ঞান-পথিকের অবলম্বন-যষ্টি কোথায়? প্রজ্ঞাই জ্ঞানের গম্য স্থান, প্রজ্ঞাই জ্ঞানের মূল উৎস, প্রজ্ঞাই জ্ঞানের অবলম্বন-যষ্টি.—প্রজ্ঞা ব্যতীত উন্নতিশীল বুদ্ধি-ক্রিয়া এক পদও চলিতে পারে না। অসীম-উন্নতি-স্পৃহা ব্যতিরেকে মনুষ্য-শিশু কি জন্য নব নব সামগ্রী শিক্ষা করিতে যত্ন পাইবে?

একটা পশুকে বেত্রাঘাত পূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হয়, কিন্তু মনুষ্য-শিশু যেমন আগ্রহের সহিত স্তন্য পান করে তেমনি আগ্রহের সহিত জ্ঞান শিক্ষা করে। অসীমতার ভাব, জ্ঞান-স্পৃহা, আত্মার স্থায়িত্ব, এই সকল ভাব শিশুর মনে অব্যক্ত-ভাবে অবস্থান করে বলিয়া, উহা পশু হইতে সমধিক অসহায় হইলেও, উহাকে তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। মনুষ্য-শিশুর মনে ইন্দ্রিয়-বোধও যে সময় কার্য্য করে, বুদ্ধিও সেই সময় কার্য্য করে, প্রজ্ঞাও সেই সময়ে কার্য্য করে, কিন্তু উহারা অস্ফুট ভাবেই কার্য্য করে। এই জন্য এ সময়ে উহারদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধরিতে পারা যায় না; পরন্তু এ সময়েও যে উহারা তিনই একত্রে স্ফূর্ত্তি পায়, এবিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু ইহা অবশ্য মানিতে হইবে যে, সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়-বোধ, পরে বুদ্ধি, তাহার পরে প্রজ্ঞা,—একের পর অন্য,—এই রূপেই উহারা স্ব-স্ব-পদোচিত পরিস্ফুটতা লাভে সমর্থ হয়।

শৈশবাবস্থা হইতে মনুষ্যের বয়ঃক্রম যত ঊর্দ্ধে পদনিক্ষেপ করে, ততই বিষয়াকর্ষণ এক দিকে প্রবল হয়, আত্মার প্রভাব অপর দিকে জাগ্রত হইয়া উঠে, এবং ক্রমে ক্রমে পরমাত্মার মঙ্গল-জ্যোতি সর্ব্বোপরি প্রকাশমান হয়। এক্ষণকার এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-বোধ, বুদ্ধি, এবং প্রজ্ঞা. তিনকে পৃথক্ রূপে অনায়াসে অবধারণ করা যাইতে পারে; কিন্তু কোন অবস্থাতেই এ রূপ হইতে পারে না যে, উহারা পরস্পরের সহিত একেবারেই সম্পর্ক-রহিত। আমাদের যদি ইন্দ্রিয়-বোধ না থাকে, তবে বুদ্ধি-মাত্র দ্বারা আমরা কি অবগত হইব? যদি বুদ্ধি না থাকে, তবে ইন্দ্রিয়-বোধ-সকলকে কিরূপে জ্ঞানে আয়ত্ত করিব? যদি প্রজ্ঞা না থাকে, তবে সর্ব্বভুক্ সংশয়-গ্রাস হইতে কি রূপে রক্ষা পাইব? অতএব প্রজ্ঞা, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-বোধ, ইহারা সকল অবস্থাতেই এক যোগে কার্য্য করে, কখনই ইহার অন্যথা হয় না। কিন্তু প্রজ্ঞার পদবী, সকল হইতে উচ্চতম; ইন্দ্রিয় যেখানে যাইতে

পারে না, বুদ্ধি যেখানে নিরস্ত হয়, প্রজ্ঞা সেই খানে থাকিয়া বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-বোধ উভয়কেই নিয়মিত করিতেছে। ইন্দ্রিয়-বোধ এবং বুদ্ধি-ক্রিয়া, উভয়ই কতকগুলি সার্ব্ব-ভৌমিক নিয়মের অধীন এবং প্রজ্ঞা হইতেই সেই সকল নিয়ম পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। অতএব এরূপ কখনই নহে যে, প্রজ্ঞা—বুদ্ধি প্রভৃতি সকলকে উপেক্ষা করিয়া উদাসীনের ন্যায় উচ্চ প্রদেশে অবস্থান করিতেছে। প্রজ্ঞা যেমন আপন স্বরূপে অবস্থিতি করে, সেই রূপ আবার বুদ্ধির মধ্যেও উহা কার্য্য করে এবং সকলের প্রান্ত-স্থিত ইন্দ্রিয়-বোধ পর্য্যন্তও উহার প্রভাব স্ফূর্ত্তি পায়। এতদনুসারে মূল-তত্ত্ব-সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল—ইন্দ্রিয়-ঘটিত, বুদ্ধি-ঘটিত ও প্রজ্ঞা-ঘটিত। যে কোন মূল-তত্ত্ব অনুসারে ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সম্পাদিত হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়-ঘটিত মূলতত্ত্ব; যদনুসারে বুদ্ধি-ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব; যদনুসারে প্রজ্ঞা আপন স্বরূপে স্থিতি করে, তাহাই প্রজ্ঞা-ঘটিত মূলতত্ত্ব।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইন্দ্রিয়-ঘটিত মূলতত্ত্ব।

বিষয়ের সত্তা স্বতন্ত্র এবং বিষয়ের আবির্ভাব স্বতন্ত্র;—আবির্ভাব-টুকুতেই ইন্দ্রিয়ের যাহা কিছু প্রয়োজন; তদ্ব্যতীত, সত্তা-বিষয়ক কোন তথ্য নিরূপণ করিতে হইলে, বুদ্ধি-চালনার আবশ্যকতা হয়। যথা;—আমি পদব্রজে চলিতেছি,—এস্থলে চলন-রূপ বাহ্য আবির্ভাব-টুকুই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে পারে; কিন্তু, কে চলিতেছে,—আমি চলিতেছি, না আমার পদ চলিতেছে, এ বিষয়ের মীমাংসা করা—বিষয় এবং বিষয়ীর সত্তা-গত ভেদ অবধারণ করা—কোন প্রকারেই ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম নহে, বুদ্ধিরই তাহাতে অধিকার। মনে কর যে, রামায়ণের কোন একটি বৃত্তান্ত একখানি পটে চিত্রিত রহি-

য়াছে এবং তাহার নিম্নে বিজ্ঞাপন-স্বরূপ উক্ত চিত্র-রচনার মর্ম্ম লিখিত আছে; এতদবস্থায় এক জন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত চিত্র-পট দৃষ্টে উহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু নিম্নের বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে তাহার নিকটে সকলই সুস্পষ্ট হইবে। প্রথমে দর্শকের নয়নে যে কতকগুলি বর্ণময় আকৃতি প্রকাশ পাইতেছিল, তাহাই কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয়; পশ্চাৎ, চিত্রকরের মনের ভাবানুসারে উহাদের মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ অবধারিত হইল, এই রূপে—রচনার আকর হইতে রচনার ভাব যে সংগৃহীত হইল, ইহা বুদ্ধি-চালনা ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়-মাত্র দ্বারা কোন রূপেই হইতে পারে না। এই বুদ্ধিকে আপাততঃ সম্বৃত রাখিয়া, এখন কেবল ইন্দ্রিয়-বোধ মাত্র সংঘটন পক্ষে যে যে মূলতত্ত্ব আবশ্যক, তাহারই প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

অন্তরের অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং বাহিরের স্থান ব্যাপন, এই দুইটি ব্যাপার, সকল

ইন্দ্রিয়-বোধের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণ-বিশেষ দৃষ্ট হইবামাত্র আমারদের অন্তঃকরণের অবস্থা-পরিবর্ত্তন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায় যে, সেই বর্ণটি আকাশ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছে; শব্দ-বিশেষ শ্রুত হইবামাত্র ঐ রূপই অন্তঃকরণের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, উহা কর্ণ-কুহর-গামী রূপে বহির্দ্দেশে অনুভূত হয়। কাল ব্যতিরেকে অন্তরে পরিবর্ত্তন সম্ভবে না, দেশ ব্যতিরেকে বাহিরে অবস্থান সম্ভবে না। অতএব দেশ এবং কাল এই দুই উপকূলের মধ্যেই, তাবৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে।

বহির্ব্বিষয়কে আমরা যদিও দেশ এবং কাল উভয়েতেই প্রত্যক্ষ করি, তথাপি উহার বহির্ভাব যে টুকু, তাহা কেবল দেশেরই প্রসাদাৎ, কালের তাহাতে হস্ত নাই; এবং আমারদের অন্তঃকরণের ব্যাপার যে টুকু, তাহাতে দেশের কোন অধিকার নাই, তাহাতে কেবল কালেরই প্রাদুর্ভাব। এক

অনেক, কার্য্য কারণ, ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-সকল যে রূপ সাম্বন্ধিক, অন্তর বাহির শব্দও সেই রূপ সাম্বন্ধিক; সুতরাং দেশ কালকেও সাম্বন্ধিক বলিতে হইবে। অতএব আমারদের অন্তঃকরণের অবস্থা সম্বন্ধেই বহির্ব্বিষয় দেশে অবস্থান করে, এবং বহির্ব্বিষয়-সম্বন্ধেই আমাদের অন্তঃকরণের অবস্থা কালে পরিবর্ত্তিত হয়। দেশ কালের সাম্বন্ধিকতার বিষয় স্পষ্ট রূপে বুঝিতে হইলে গতি-ক্রিয়ার প্রতি এক বার মনো-নিবেশ করিলেই তাহাতে কৃত-কার্য্য হইতে পারা যায়। গতিশীল বস্তু যত দ্রুত চলে, দেশ-বিশেষে উহা তত অল্পকাল থাকিতে পায় এবং যত মন্দ চলে তত অধিক কাল থাকিতে পায়; এই রূপ দেশ-বিশেষে অধিক কাল থাকাতেই আপেক্ষিক স্থিরতা, অল্প কাল থাকাতেই আপেক্ষিক দ্রুততা; সুতরাং বস্তু-সকল যে পরিমাণে দেশ-বিশেষে থাকে, সেই পরিমাণে উহা স্থির থাকে; এবং যে পরিমাণে উহা দেশ-বিশেষে বদ্ধ না থাকে, সেই পরিমাণে উহা দ্রুত চলে; এইরূপ

দেখা যাইতেছে যে, স্থিরতার ভাব মুখ্য-রূপে দেশেরই সহিত সংলগ্ন হয় এবং প্রবাহের ভাব মুখ্য-রূপে কালেরই সহিত সংলগ্ন হয়।

দেশ কালে অবস্থিত বিষয়-সকলকে আমরা ইন্দ্রিয়-দ্বারা প্রত্যক্ষ করি বটে, কিন্তু দেশ কাল স্বয়ং আমাদের ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। আকাশ-স্থিত বায়ুকে আমরা স্পর্শ-দ্বারা অবগত হই বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ আকাশকে আমরা কদাপি সে রূপে অবগত হইতে পারি না। আকাশ-স্থিত আলোককে আমরা দৃষ্টি-দ্বারা উপলব্ধি করি বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ আকাশকে সে রূপ করিয়া কখনই প্রাপ্ত হইতে পারি না। এই রূপ কালবর্ত্তী ঘটনা-প্রবাহকে আমরা অন্তঃকরণে অনুভব করি বটে, কিন্তু শূন্য কালকে আমরা সে রূপে কখনই আয়ত্ত করিতে পারি না;— পূর্ব্বে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অসীম দেশ-কালকে আমরা বুদ্ধি-দ্বারা উপার্জ্জন করি নাই। কি রূপেই বা করিব? বস্তু-সকলের সীমা-বিশিষ্ট আয়তন হইতে

অসীম দেশে আমরা কি প্রকারে নিঃসংশয়-রূপে উপনীত হইব? বুদ্ধি দ্বারা এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় হইতে পারে যে, যে-সকল ভৌতিক বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই দেশ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছে; কিন্তু সমুদায় ভৌতিক বস্তুই যে, দেশ ব্যাপিয়া থাকিবে, এ রূপ যৎপরোনাস্তি নিশ্চয় বাণী বুদ্ধির মুখ হইতে কোন রূপেই বাহির হইতে পারে না; সুতরাং উক্ত মূল-তত্ত্বটি প্রজ্ঞা হইতে অবতীর্ণ হইতেছে। অসীম-দেশ-কাল-সম্বন্ধীয় এই যে অনিবার্য্য নিশ্চয়তা, ইহা সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতেই আমারদের আত্মাতে মুদ্রিত হইতেছে; কেন না, অন্য কুত্রাপি হইতে ওরূপ হওয়া অসম্ভব।

দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ, এই তিনটী দেশের অবয়ব; ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, এই তিনটি কালের অবয়ব। কোন বিষয়-বিশেষ যখন আমাদের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে আবির্ভূত হয়, তখন দূরত্ব, বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, আকাশের এই তিনটি লক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাইতে থাকে।

প্রথমতঃ কতক না কতক পরিমাণ দেশের ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষয়-সকল আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যভিমুখী হয়,—ইহাতেই তাহাদের দূরত্ব প্রকাশ পায়; দ্বিতীয়তঃ পরমাণু-সকলের পরস্পরের মধ্যে কতক না কতক পরিমাণ দেশের ব্যবধান বর্ত্তে,—ইহাতেই তাহারদের বিস্তৃতি প্রকাশ পায়; তৃতীয়তঃ এক পরমাণুর পৃষ্ঠে অন্য পরমাণু—পরমাণু-সকল এইরূপে পরস্পরকে ব্যাপিয়া (অর্থাৎ আবরণ করিয়া) থাকে,—ইহাতে তাহাদের ব্যাপ্তি প্রকাশ পায়। অন্য এক দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের মনের উপরে বিষয়ের এরূপ প্রাদুর্ভাব যে, অতীত কালে বিষয়-বিশেষের যেরূপ আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে,—পশ্চাৎক্ষণে—আমাদের মানস-ক্ষেত্রে তাহারই পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকে; অতঃপর অতীত কালের সেই আবৃত্তি বর্ত্তমানের নবোদিত উত্তেজনার সহিত একত্র গুণিত হয়; এবং পরিশেষে ঐরূপ গুণনের ভবিষ্যৎ-লভ্য প্রবর্দ্ধিত ফলের দিকে আমাদের

মন ধাবিত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে. বিষয়-সকল যেরূপ প্রণালীতে আমাদের মনের উপরে কার্য্য করে, তাহাতে ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—কালের এই তিনটি লক্ষণ একান্তই আবশ্যক হয়। দেশের গুণে বিষয়-সকল বাহিরে প্রকাশ পায়, কালের গুণে তাহারা আমাদের অন্তঃকরণে মুদ্রিত হয়। এই যে দেশ এবং কাল. ইহারা বুদ্ধির সম্বন্ধে কিছুই নহে—কেবল শূন্য মাত্র; কিন্তু ইন্দ্রিয়-বোধের সম্বন্ধে উহারা সর্ব্বস্ব। এমন কি, দেশ-কাল-মূলক শূন্য অবকাশ যদি বিলুপ্ত হয়, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-সকলের ইন্দ্রিয়-গত আবির্ভাবও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এক্ষণে, ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—কালের এই তিনটি অবয়ব, এবং দীর্ঘ প্রস্থ বেধ—দেশের এই তিনটি অবয়ব, উভয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-বোধের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা অবধারণ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ তাবৎ ইন্দ্রিয়-বোধের সহিত কোন না কোন প্রকার গতির উপলব্ধি

হওয়া আবশ্যক। যখন কোন কিছু আমার-দের শরীরকে স্পর্শ করে, যখন আলোক চক্ষুতে নিপতিত হয়, শব্দ শ্রবণে আহত হয়, গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করে, রসনাতে আস্বাদের সঞ্চার হয়, তখন তাহার সঙ্গে কোন না কোন প্রকার গতি অবিচ্ছেদে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে ;—কেন না, বাহ্য বিষয়ের সহিত অন্তঃ-করণের—দেশের সহিত কালের যে সম্বন্ধের ঘটনা হয়,—গতির মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে তাহা কোন রূপেই হইতে পারে না ; এমন কি, কেবল একটা স্তব্ধ পাষাণকেও যখন আমরা সম্মুখে অবলোকন করি, তখন আলোকের গতি-সূত্রেই আমরা সেরূপ করিতে সমর্থ হই। যদি এরূপ মনে করা যায় যে, আলো-কের সহিত গতির কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইলে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, আলোক বাহির হইতে অন্তরে নহে—কিন্তু, একেবারেই আমাদের অন্তরে কার্য্য করি-তেছে ;—সুতরাং ওরূপ হইলে উহা যে অন্তর হইতে আসিতেছে না, প্রত্যুত বাহির

হইতেই আসিতেছে, এ তথ্যটির বিপর্য্যয়-দশা উপস্থিত হয়। অতএব গতি—বাহ্য-বিষয় এবং ইন্দ্রিয়-ব্যাপার এ দুয়ের মধ্যস্থিত সেতু-স্বরূপ; এই জন্য ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-সম্বন্ধে উহা অলঙ্ঘনীয়। গতি-ক্রিয়ার সহিত দেশ কালের এই রূপ সম্বন্ধ যে, গতির সমাধা হইতে গেলে কাল অতীত হওয়া চাই এবং দেশ দৈর্ঘ্যে লঙ্ঘিত হওয়া চাই; অতএব কালের অতীত অবয়ব এবং দেশের দৈর্ঘ্য-অবয়ব, গতি-ক্রিয়াতে এই দুইটি অবয়ব একত্রে পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়-বোধের প্রথম লক্ষণ—গতি, দ্বিতীয় লক্ষণ—প্রতিভা। গতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইন্দ্রিয়-বোধ-সকলকে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়,—এই প্রতিভান-ক্রিয়াকেই এখানে প্রতিভা কহা যাইতেছে। যথা;—আলোকের গতি যখন চক্ষুর প্রত্যভিমুখীন হয়, আলোকের প্রতিভা (অর্থাৎ প্রকাশ) তখন চক্ষুর সম্মুখে বিস্তারিত হয়। কালের অত্যয় এবং দেশের দৈর্ঘ্য—এই দুইটি যেমন গতির সম্ভাবনা-পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়,

সেইরূপ কালের বর্ত্তমানতা এবং দেশের বিস্তার—এই দুইটি প্রতিভানের সম্ভাবনা পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ;—এক মুহূর্ত্তের পর অন্য মুহূর্ত্ত, ইত্যাদিক্রমে কাল অতীত না হইলে যেমন গতি সিদ্ধ হইতে পারে না, প্রতিভানের তাহা নহে,—যে মুহূর্ত্ত সাক্ষাৎ বর্ত্তমান তাহাই প্রতিভানের উপযুক্ত কাল। পুনশ্চ, গতি যেমন দেশের দৈর্ঘ্য-মাত্রে ভর করিয়া প্রবাহিত হয়, প্রতিভান সে-প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে না,—প্রতি-ভানের জন্য দেশের কতক পরিমাণ বিস্তার নিতান্তই অপেক্ষিত হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, কালের বর্ত্তমানতা-অবয়ব এবং দেশের বিস্তৃতি-অবয়ব,—প্রতি-ভার সহিত এই দুইটি অবয়ব একত্রে পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়-বোধের তৃতীয় লক্ষণ—আবরণ। ইন্দ্রিয়-বোধ আকাশের এক পৃষ্ঠে প্রতিভাত হয়, অন্য পৃষ্ঠে আবৃত হইয়া থাকে। একটা ধবল কাগজের উপরি-ভাগে যখন ধবল-বর্ণ প্রতিভাত হয়, তখন ইহাতে আর

সংশয় থাকে না যে, সেই কাগজের কতক দূর অভ্যন্তর পর্য্যন্তও সে বর্ণ আবহমান রহিয়াছে। কেন না, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-বোধেরই যেমন কতক পরিমাণ বিস্তার থাকা নিতান্ত আবশ্যক, সেইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-বোধেরই কতক পরিমাণ বেধ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, বিস্তারাংশই বর্ত্তমানে প্রকাশ পায়, বেধাংশ ভবিষ্যৎ-প্রকাশ্য-রূপে আবৃত থাকে। সুতরাং আবরণ-ক্রিয়াতে দেশের বেধাংশ এবং কালের ভবিষ্যৎ-অংশ উভয়ের সমন্বয় উপলব্ধি হইতে পারে। যাহা বলা হইল, তাহা নিম্নের লতা দেখিলে স্পষ্ট হইবে।

কাল	দেশ		ইন্দ্রিয়বোধ
ভূত	দীর্ঘ	(দূর)	গতি
বর্ত্তমান	প্রস্থ	(বিস্তৃত)	প্রতিভা
ভবিষ্যৎ	বেধ	(ব্যাপ্ত)	আবরণ

চতুর্থ অধ্যায়।

বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব।

বুদ্ধি কাহাকে বলে—বুদ্ধির লক্ষণ কি ?—ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথোচিত রূপে সমালোচিত হইয়াছে। যথা,—"গো বা অশ্ব বিশেষকে যখন আমরা পশু বলিয়া নিশ্চয় করি, তখন তাহাতে—বিশেষ বিষয়কে একটি সাধারণ তত্ত্বের অন্তর্গত করা হয়,—এই রূপ ক্রিয়াকেই বুদ্ধি কহে"। এখানে ইহার মর্ম্ম আরও কিছু স্পষ্টরূপে বিবৃত করা যাইতেছে। মনে কর, এক জন দর্শক দূর হইতে একটা পশুকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; এবং এই রূপ চিন্তা করিতেছেন যে, "এটা পশু বটে তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু এটা কোন্ পশু—অশ্ব, না গো, না হস্তী ?" দর্শক এখানে কি করিতেছেন ? না—সাধারণ-পশু-জ্ঞান হইতে তিনি কোন একটা বিশেষ-পশু-জ্ঞানে অবতীর্ণ হইবার জন্য পন্থা-অন্বেষণ করিতে-

ছেন ;—ইহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইলেই তাঁহার বুদ্ধি চরিতার্থ হয় ; কিন্তু যতক্ষণ তিনি তাহা না হইতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার মনে কেবল এইরূপ ভাবনাই চলিতে থাকে যে "এটা কোন্ পশু—অশ্ব না গো ?" ইত্যাদি। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, ভাবনা-দ্বারা সাধারণ হইতে বিশেষে—আত্মা হইতে বিষয়ে—অবতীর্ণ হওয়াতেই বুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। * অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাইতেছে।

সাধারণ-পশু এবং বিশেষ-পশু এ দুয়ের মধ্যে যেমন একটি সম্বন্ধ আছে, মন এবং বিষয় এ দুয়ের মধ্যেও অবিকল সেইরূপ সম্বন্ধ। যথা,—সাধারণ-পশু সম্বন্ধে বিশেষ-পশু অনেক, মনের সম্বন্ধে বিষয় অনেক ; গো বা মহিষ রূপ বিশেষ পশুকেই কল্পনা করা যাইতে পারে—সাধারণ-পশুকে কল্পনা করা যায় না, বিষয়কেই কল্পনা করা যাইতে পারে—মনকে কল্পনা করা যায় না ; ইত্যাদি। সাধারণ-পশু আমাদের মনের ভাবনাতেই পাওয়া যায়, বিশেষ বিশেষ পশুই আমারদের ইন্দ্রিয় অথবা কল্পনা-গোচরে বিষয়রূপে প্রকাশ পায় ; বিশেষ অশ্ব, বিশেষ গো ইহারাই বিষয় ; সাধারণ অশ্ব, সাধারণ গো, ইহারা আমারদের মনের ভাবনা।

বস্তু-সকলের আবির্ভাব-মাত্র উপলব্ধি করিয়াই বুদ্ধি পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না,—বুদ্ধি সত্তা চায়। ইন্দ্রিয়েতে রূপ-রসাদি আবির্ভাব বিন্যস্ত হইলে, বুদ্ধি তদুপলক্ষে সত্তা-বিশেষের নিরূপণ করে। যথা আলোক দেখিবামাত্র বুদ্ধি অমনি স্থির করে যে, এ আলোক আত্মার গুণ নহে, কিন্তু বিষয়-বিশেষের গুণ,—এই রূপে বুদ্ধি আত্মার সত্তা-হইতে বিষয়-বিশেষের সত্তাকে বিভিন্ন করিয়া অবলোকন করে। এই জন্য, ইন্দ্রিয়-কার্য্যের পক্ষে দেশ-কাল-মূলক অবকাশ যেমন নিতান্ত আবশ্যক,—বুদ্ধি-কার্য্যের পক্ষে বিষয়-বিষয়ী-মূলক সত্তা সেইরূপ নিতান্ত আবশ্যক। জ্ঞাতা-বিষয়ী আছে এবং জ্ঞাতব্য-বিষয় আছে, এই বিশ্বাসটি ব্যতিরেকে বুদ্ধি এক পদও চলিতে পারে না। যে জানিতেছে, সেই মুখ্য রূপে বিষয়ী; ও যাহাকে জানা হইতেছে, তাহাই মুখ্য রূপে বিষয়। যাহাকে আমরা চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি তাহা বিষয়ী নহে, কিন্তু যে চক্ষু দ্বারা দেখিতেছে সেই

বিষয়ী ; যাহাকে আমরা দেহান্তর্গত অবস্থা-বিশেষ বলিয়া অন্তঃকরণে অনুভব করিতেছি তাহা বিষয়ী নহে, কিন্তু যে উক্ত প্রকার অনুভব করিতেছে সেই বিষয়ী ; সুখের অবস্থা বিষয়ী নহে, কিন্তু আপন সুখের অবস্থাকে যে জানিতেছে সেই বিষয়ী ; ভয়ের অবস্থা বিষয়ী নহে, কিন্তু ভয়ের অবস্থাকে যে জানিতেছে সেই বিষয়ী ; এই রূপ দেখা যাইতেছে যে ভৌতিক বস্তু দূরে থাকুক অন্তঃকরণের কোন অবস্থা-বিশেষও বিষয়ী-পদবীর যোগ্য নহে। তাহাই বিষয়ী, যাহা আন্তরিক তাবৎ অবস্থারই মূলে জ্ঞাতা-রূপে অবস্থান করে। বিষয়ী আছে অর্থাৎ আমাদের স্ব স্ব আত্মা আছে, ইহা একটি যৎপরোনাস্তি অবিতথ সত্য। "আমি আছি" ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বলে "আমি নাই" সে যদি বাস্তবিকই না থাকে, তবে "আমি নাই" একথা কে বলিতেছে ? যদি "আমি" না থাকে তবে "আমার"-ও কাযে কাযে থাকিতে পারে

না। আমি নাই অথচ যে কথা উক্ত হইল তাহা আমার কথা, আমি নাই অথচ এটি আমার, এ দুইটি বিরোধী কথা একত্রে কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? অতএব আমি আছি, ইহা একেবারেই সংশয়-রহিত। বহির্ব্বস্তু আছে, ইহাও ঐ প্রকার সংশয়রহিত; কেন না, ইহা একেবারে অবশ্যম্ভাবী যে, বিষয়ী বিষয়ের মধ্যে বিভিন্নতা নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে বুদ্ধি-ক্রিয়া এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারে না। এরূপ নহে যে এ তত্ত্বটি কোথা বা সংলগ্ন হয়, কোথা বা নাও সংলগ্ন হইতে পারে; ইহা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নহে; সুতরাং ইহা যে একটি প্রজ্ঞানিহিত মূলতত্ত্ব, ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। এই মূলতত্ত্ব অনুসারে ইহা একান্ত আবশ্যক যে, এককে জানিতে হইলে অনেককেও সঙ্গে সঙ্গে জানা চাই, বিষয়ীকে জানিতে হইলে বিষয়কেও সঙ্গে সঙ্গে জানা চাই, ইত্যাদি; কেন না, এক—অনেক হইতে বিভিন্ন, ও অনেক—এক হইতে বিভিন্ন, এই রূপ বিভিন্নতা থাকাতেই—এক এবং অনেক

উভয়েরই অর্থ হইতে পারিতেছে। এতদ্ব্য-তীত এক হইতে অভিন্ন অনেক, অথবা অনেক হইতে অভিন্ন এক,—বিষয়ী হইতে অভিন্ন বিষয়, অথবা বিষয় হইতে অভিন্ন বিষয়ী,—ইহা কোন প্রকারেই বোধ-সাধ্য নহে। যখন আমরা জানিতেছি যে আত্মা আছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতেছি যে এমনও সকল বস্তু আছে যাহা আত্মা হইতে বিভিন্ন, এইটি আত্মা এবং এইটি আত্মা নহে—এই রূপেই আত্মার নির্দ্দেশ; সুতরাং আত্মা আছে কিন্তু বহির্ব্বস্তু নাই, ইহা অসম্ভব!

বিষয়ীর অবয়ব তিনটি—জ্ঞান, ভাব, এবং ইচ্ছা; বিষয়-বিশেষকে জানিবার সময় এই তিন অবয়বই কার্য্যে লাগে। জ্ঞাতব্য বিষয়ের ব্যাপ্তি বা ইয়ত্তা থাকা (অর্থাৎ সামান্য-বিশেষ*

* সামান্য অর্থাৎ সমানতা, বিশেষ অর্থাৎ সমানতার ব্যতিরেকে যাহা অবশিষ্ট থাকে। যথা, অশ্ব এবং গো উভয়ের মধ্যে চতুষ্পাদত্ব-বিষয়ে সমানতা আছে, তদ্ব্য-তিরেকে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে শৃঙ্গ খুরাদির বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। সমানতা (বা সামান্য) এবং ঐক্য—

অথবা ঐক্যানৈক্য বা একত্ব অনেকত্ব থাকা) জ্ঞানের পক্ষে মুখ্য রূপে আবশ্যক ; জ্ঞাতব্য বিষয়ের লক্ষণ (যথা সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ) থাকা ভাবের পক্ষে মুখ্য রূপে আবশ্যক ; জ্ঞাতব্য বিষয়ের শক্তি থাকা ইচ্ছার পক্ষে মুখ্য রূপে আবশ্যক। কাষ্ঠ-লোষ্ট-সদৃশ কোন বস্তু যাহার লক্ষণ এবং শক্তি আমা-দের নিকটে নিতান্তই উপেক্ষণীয়, তাহা এক বা অনেক—ইহা জানাতে কেবল জানা মাত্রই হয়, কেবল জ্ঞানই চরিতার্থ হয়, পরন্তু ভাব বা ইচ্ছার পক্ষে কিছুই ফল দর্শে না। আমরা যখন বস্তু-বিশেষের লক্ষণ অবগত হই, তখনই ভাব-বিশেষের উদ্দীপন হয় ;— সুলক্ষণ দেখিলেই আমাদের মনে আনন্দ

স্থল-বিশেষে একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। বিশেষ এবং অনৈক্যও ঐরূপ। যথা, গো এবং অশ্বের চতুষ্পদত্ব-বিষয়ে সমানতা আছে কিম্বা ঐক্য আছে শৃঙ্গ খুরাদির বিষয়ে বিশেষত্ব আছে কিম্বা অনৈক্য আছে।

উপস্থিত হয়, কুলক্ষণ দেখিলেই ঘৃণা উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ একত্ব অনেকত্ব অনুসারে আমরা বস্তু-বিশেষকে সংক্ষেপে অথবা বাহুল্য-রূপে জ্ঞানে ধারণ করি, দ্বিতীয়তঃ সুলক্ষণ কুলক্ষণ অনুসারে তাহাকে হেয় বা উপাদেয় রূপে ভাবে উপভোগ করি ; উদাহরণ.—অশ্বগবাদি নানা জন্তুকে আমরা পশু বলিয়া সংক্ষেপে জানি, অথবা অশ্বগবাদির প্রত্যেককে সবিশেষে জানিয়া পশু-বিষয়ে বাহুল্য রূপে জ্ঞান লাভ করি ; সুগন্ধ লক্ষণকে আমরা উপাদেয়রূপে অনুভব করি, দুর্গন্ধ লক্ষণকে আমরা হেয়রূপে অনুভব করি। তৃতীয়তঃ আমরা যখন বস্তু-বিশেষের শক্তি অবগত হই, তখনই ইচ্ছা আপন লক্ষ্য সাধনে তৎপর হয়। সুরাপায়ীর পক্ষে সুরা অতীব উপাদেয় হইলেও উক্ত ব্যক্তি যখন জানিতে পারে যে, সুরাতে আয়ুঃ-শোষিণী শক্তি অবস্থান করে, তখন ইচ্ছা অমনি সুরাপানের প্রতিবাদী হইয়া দণ্ডায়মান হয় ; যখন রোগী ব্যক্তি জানিতে পারে যে, তিক্ত ঔষধ-বিশেষে আরোগ্যদায়িনী শক্তি অবস্থান

করে, তখন উক্ত সামগ্রী রসনাতে অতীব হেয় হইলেও ইচ্ছা তাহা সেবন করিতে অগ্রসর হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের পক্ষে ব্যাপ্তি বা ইয়ত্তা যেমন আবশ্যক, ভাবের পক্ষে লক্ষণ তেমনি আবশ্যক, ইচ্ছার পক্ষে শক্তি তথৈব আবশ্যক। ইহার এই একটি স্পষ্ট উদাহরণ;—আমরা জ্ঞান-মাত্র দ্বারা আত্মাকে উহার লক্ষণ এবং শক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া, উহাকে কেবল "এক" বলিয়া অবধারণ করিতে পারি, এবং এই রূপ উহাকে এক বলিয়া না জানিলে উহাকে জানাই হয় না; কিন্তু এ রূপ জানাতে আমাদের ভাবে আনন্দও উদিত হয় না, ইচ্ছাতে স্বাধীনতাও প্রকাশ পায় না; পরন্তু এরূপ জানা কেবল জানা মাত্র সার। কিন্তু যখন আমরা আত্মাকে সত্য-পরায়ণ, কৃতজ্ঞ, সাধু, পবিত্র, ইত্যাদি সর্ব্ব-সুলক্ষণ-যুক্ত বলিয়া অনুভব করি, তখন আমারদের ভাবে আনন্দ আবির্ভূত হয়; এবং যখন ইন্দ্রিয়াদির উপরে আত্মার শক্তির প্রাদুর্ভাব উপলব্ধি করি, তখন আমারদের

ইচ্ছাতে স্বাধীনতা আবির্ভূত হয়। এই রূপ, ব্যাপ্তি, লক্ষণ, এবং শক্তি,—এই তিনের সম্বন্ধে জ্ঞান, ভাব, এবং ইচ্ছার পৃথক্ পৃথক প্রাধান্য স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

ব্যাপ্তি-বিষয়ে বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ এই যে, একই বিষয়ী নানা বিষয় জ্ঞাত হয়;—এক বিষয়ের সহিত অন্য বিষয়ের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে, উভয়ের কোনটিকেই জানা যাইতে পারে না। একটা বৃক্ষকে জানিতে হইলে, মৃত্তিকা, পাষাণ, জীব-জন্তু প্রভৃতি এমন একটা কোন সামগ্রীকে জানা আবশ্যক, যাহা বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন; সুতরাং জ্ঞানের সম্বন্ধে বিষয় অনেক না হইলেই নয়। অতএব আমাদের জ্ঞানের সম্বন্ধে বিষয়ী এক, ও বিষয় অনেক;—সুতরাং বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী এক, এবং বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় অনেক। দ্বিতীয়তঃ, বিষয় এবং বিষয়ী, উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, তাহাতে একত্ব অনেকত্ব উভয়ই বিদ্যমান। বিষয়ের গুণে জ্ঞানকে যেমন অনেক বলিয়া

গণ্য করিতে হয়, বিষয়ীর গুণে সেই রূপ উহাকে এক বলিয়া নিশ্চয় করিতে হয়। এক দিকে ঘট-জ্ঞান পট-জ্ঞান প্রভৃতি নানা জ্ঞান; অপর দিকে একই আত্মজ্ঞান; এই রূপ, সকল জ্ঞানেরই এই এক অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ যে, উহারা অনেকে এক সূত্রে গ্রথিত; সুতরাং বিষয় এবং বিষয়ীর সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, তাহা এক এবং অনেক উভয়েরই সন্ধি-স্থল,—তাহা সমষ্টি-শব্দের বাচ্য। অতএব ব্যাপ্তি-বিষয়ে বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব এই তিনটি,—বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী এক, বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় অনেক, এবং উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান তাহা সমষ্টি-বদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ;—লক্ষণ-বিষয়ে বিষয়ের সহিত বিষয়ীর এই রূপ সম্বন্ধ যে, বিষয়ীতেই জ্ঞান-লক্ষণের সত্তা, এবং বিষয়েতে উক্ত লক্ষণের অভাব, অবস্থান করে; অতএব জ্ঞান-সম্বন্ধে—বিষয় অভাবাত্মক, বিষয়ী ভাবাত্মক;—সুতরাং বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় অভাবাত্মক, বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী ভাবাত্মক। অতঃপর,

বিষয় এবং বিষয়ীর সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, তাহা এক দিকে আত্মাকে জানে, এক দিকে বিষয়কে জানে ;—আলোককে জানা সম্বন্ধে আপেক্ষিক অন্ধকারকে জানা যেমন অভাবাত্মক, বিষয়ীকে জানা সম্বন্ধে বিষয়কে জানাও সেইরূপ অভাবাত্মক,—সুতরাং জ্ঞান, এক দিকে যেমন ভাবাত্মক, অপর দিকে উহা তেমনি অভাবাত্মক। এক অনেক—এ দুয়ের সন্ধিস্থলে যেমন সমষ্টি, ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক—এ দুয়ের সন্ধিস্থল সেই রূপ সীমাত্মক। উদাহরণ যথা,—সূর্য্যের তুলনায় প্রদীপেতে আলোকের অভাব আছে, কিন্তু খদ্যোতের তুলনায় উহাতে আলোকের অভাব নাই,—এই রূপ, প্রদীপে যখন আলো-কের সত্তাও আছে এবং অভাবও আছে, তখন তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, উহাতে আলোকের সীমা আছে। অত-এব ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে ভাবও আছে অভাবও আছে, তাহা সীমাত্মক। এতদনুসারে সিদ্ধান্ত হইতেছে

যে, লক্ষণ-বিষয়ে বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব এই তিনটি,—বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী ভাবাত্মক, বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় অভাবাত্মক, এবং উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান তাহা সীমাত্মক।

তৃতীয়তঃ;—শক্তি-বিষয়ে বিষয়ীর সহিত বিষয়ের এই রূপ সম্বন্ধ যে, বিষয়ী আপনা কর্ত্তৃক জ্ঞাত হয়, এবং বিষয় অন্য কর্ত্তৃক (অর্থাৎ বিষয়ী কর্ত্তৃক) জ্ঞাত হয়। জানা—একটি ক্রিয়া, এবং জ্ঞাত হওয়া—সেই ক্রিয়ার কার্য্য অথবা ফল, এবং যে শক্তি দ্বারা জ্ঞান-ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাই জ্ঞান-শক্তি। বিষয়ী আপনারই জ্ঞান-শক্তি দ্বারা জ্ঞাত হয়; বিষয় অন্যের জ্ঞান-শক্তি দ্বারা জ্ঞাত হয়। সুতরাং জ্ঞাত-হওয়া সম্বন্ধে, বিষয়ী আপনার উপর নির্ভর করে, বিষয় অন্যের উপর নির্ভর করে। অতএব বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী স্বাধীন (অর্থাৎ আপনার অধীন) এবং বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় পরাধীন। পুনশ্চ আমরা যে কোন বস্তুকে জানি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানিতেই হয়।—যখন একখান

পুস্তককে জানিতেছি, তখন ইহাও সঙ্গে সঙ্গে জানিতেছি যে, আমিই উক্ত পুস্তককে জানিতেছি। আমারদের জ্ঞান কখনও ঘটকে জানিতেছে, কখন তাহাকে নাও জানিতেছে কখন পটকে জানিতেছে, কখন তাহাকে নাও জানিতেছে; কিন্তু উহা আপনাকে সর্ব্বদাই জানিতেছে; কেন না, জ্ঞান যাহা কিছু জানে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উহা আপনাকে জানে। এরূপ হইতে পারে যে, এক ব্যক্তির ঘট-জ্ঞান নাই, অথচ তাহার আত্ম-জ্ঞান আছে; কিন্তু ইহা কদাপি হইতে পারে না যে, এক ব্যক্তির আত্ম-জ্ঞান নাই অথচ তাহার ঘট-জ্ঞান আছে। অতএব আত্ম-জ্ঞান আপনারই গুণে স্থিতি করিতেছে;—সুতরাং ইহা স্বাধীন। এবং এই আত্ম-জ্ঞানেরই গুণে অন্যান্য বিশেষ বিশেষ জ্ঞান স্থিতি করিতেছে;—সুতরাং ইহারা পরাধীন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, বিষয় এবং বিষয়ী. উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, তাহাতে স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা উভয়ই

যোগ-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ;—একই আত্ম-জ্ঞানের অধীনে নানা বিষয়-জ্ঞান পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হইতেছে। স্বাধীন এবং পরাধীন দুয়ের সংযোগকে পরস্পরাধীন বলা যাইতে পারে। যথা ;—কোন সমাজ-ভুক্ত কতিপয় ব্যক্তিকে পরস্পরাধীন বলিলে ইহাই বলা হয় যে, উহারা প্রত্যেকে উক্ত সমাজের অধীন,—সুতরাং সমাজান্তর্গত অন্যান্য ব্যক্তির অধীন এবং সমাজান্তর্গত আপনার অধীন ;—সুতরাং, প্রত্যেকেই এক দিকে যেমন পরাধীন অন্য দিকে তেমনি স্বাধীন। অতএব শক্তি-বিষয়ে বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব এই তিনটি ;—বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী স্বাধীন, বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় পরাধীন, এবং উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান তাহা পরস্পরাধীন। যাহা বলা হইল, তাহা নিম্নের লতা দৃষ্টে সুন্দর-রূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

বিষয়ী	বিষয়	বুদ্ধি
এক	অনেক	সমষ্টি
ভাবাত্মক	অভাবাত্মক	সীমাত্মক
স্বাধীন	পরাধীন	পরস্পরাধীন

উপরে যে কয়েকটি সহজ তথ্য অবধারিত হইল, তদুপলক্ষে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, উহাদিগকে আমরা কিরূপ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি, তবে তাহার উত্তর এই যে, বিষয়-সমূহের পরীক্ষা-দ্বারা নহে—পরন্তু প্রজ্ঞা-নিহিত কয়েকটি মূলতত্ত্বের অবলম্বন-দ্বারাই আমরা উল্লিখিত অমূল্য সত্য-গুলিকে মুষ্টি-মধ্যে ধারণ করিতেছি। যথা,—প্রজ্ঞানিহিত ঐক্যানৈক্যের মূলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া আমরা ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, আমি এক. বিষয় অনেক; বস্তু-গুণের মূলতত্ত্ব অবলম্বন দ্বারা আমরা এই সত্যটির সন্ধান পাইয়াছি যে. আমি ভাবাত্মক, বিষয় অভা-বাত্মক; কার্য্য-কারণের মূল-তত্ত্ব অবলম্বন দ্বারা আমরা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিতেছি

যে, আমি স্বাধীন, বিষয় পরাধীন। ঐক্যানৈক্য, বস্তু-গুণ, কার্য্য-কারণ, এই যে-সকল মূলতত্ত্ব—ইহারা আমারদের স্বোপার্জ্জিত বিত্ত নহে, ইহারা আমারদের পৈতৃক ধন; পরমপিতার করুণা-স্রোতেই উহারা প্রেরিত হইতেছে "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ"। যিনি আমারদের সাক্ষাৎ পিতা, যিনি আমারদের পুরাতন পিতামহ, তিনি স্বয়ং গোপনে গোপনে উক্ত ধন-সকল আমারদের হস্তে নিহিত করিতেছেন; আমরা প্রার্থনা করি নাই, অথচ আমাদের কিসে মঙ্গল হয় এই জন্য তিনি ব্যস্ত রহিয়াছেন।

ঐক্যানৈক্য প্রভৃতি মূলতত্ত্ব-সকল যদি স্বতঃ-সিদ্ধ-রূপে আমারদের আত্মাতে না থাকিত, তাহা হইলে আমরা সহস্র পরীক্ষা করিয়াও জানিতে পারিতাম না যে, আমি এক, বহির্ব্বিষয় অনেক; আমাতে জ্ঞানের অভাব নাই, বহির্ব্বিষয়ে জ্ঞানের অভাব আছে; আমি স্বাধীন কারণ, বহির্ব্বিষয় পরাধীন কার্য্য এবং এই কয়টি মূলতত্ত্বকে অগ্রে স্বতঃ-সিদ্ধ-

রূপে না জানিলে, আমরা কোন কিছুই পরীক্ষা করিতে পারিতাম না। অতএব উক্ত তত্ত্ব-সকল পরীক্ষা দ্বারা অর্জ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, উহারা থাকাতেই পরীক্ষা মুহূর্ত্ত কাল বর্ত্তিয়া থাকিতে পারিতেছে; সুতরাং উহারা সকল পরীক্ষারই মূলীভূত নিবন্ধন-স্বরূপ। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমাদের আত্মা পরিমিত আত্মা,—জাগ্রদবস্থায় আমাদের চেতনার যেমন প্রাদুর্ভাব হয়, সুষুপ্তি-অবস্থায় তাহার তেমনি খর্ব্বতা হয়। কিন্তু আমাদের আত্মা যে কোন অবস্থায় পতিত হউক না কেন, তৎ-সম্বন্ধে যে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে—কোন কিছুতেই তাহার একটির লেশ মাত্রও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। যথা,—জাগ্রদবস্থাতেও আমি এক, সুষুপ্তি-অবস্থাতেও আমি এক; সেই এক যে—আত্মা, তাহাই চেতনাগুণের আধার হইবার উপযুক্ত, অনেক যে বিষয়, তাহা সেরূপ হইবার কোন অংশেই উপযুক্ত নহে,—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে

সমর্থ নহে। সুষুপ্তি-অবস্থায় অথবা মূর্চ্ছা-বস্থায় আত্মাতে চেতনার বিলক্ষণ খর্ব্বতা হয়,—কিন্তু তাহাতে কি? সেই চেতনার যখনই পুনরুদ্রেক হইবে, তখনই সে এক-মাত্র আত্মাকেই আপন আধার-পদে বরণ করিবে, ইহাতে ত আর সন্দেহ নাই। কেন না, প্রজ্ঞা ইহা সুনিশ্চিত-রূপে বলিয়া দিতেছে যে, এক-আত্মা ব্যতীত অনেক-বিষয়—কোন মতেই চেতন-গুণের আধার-পদে বরণ-যোগ্য হইতে পারে না। মনে কর যে, পথি-মধ্যে একটা যষ্টি ভূতলে পড়িয়া আছে; ইতিমধ্যে দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় নামক দুই ব্যক্তি তাহার দুই প্রান্ত-ভাগ ধরিয়া উত্তোলন করিল; ইহাতে ঐ যষ্টিটির প্রতি দুই জনেরই সমান অধিকার বর্ত্তিল—সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐ যষ্টি-উপলক্ষে এরূপ বলা যাইতে পারে না যে, উহা দেবদত্তেরই যষ্টি—ধনঞ্জয়ের যষ্টি নহে; কিন্তু যদি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া বলেন যে, আমি জানি এ যষ্টিটি দেবদত্তের সম্পত্তি, তখন

অবশ্য উক্ত সামগ্রীতে দেবদত্তেরই অধি-
কার সপ্রমাণ হয়। এখানে যেমন দেবদত্ত
এবং ধনঞ্জয় দুই জনে যষ্টির দুই প্রান্ত-ভাগ
ধরিয়া থাকাতে, যষ্টিটি দুই জনের মধ্য-
স্থলে স্থিতি করিতেছে; সেইরূপ, জ্ঞান—
বিষয় এবং বিষয়ী এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী; সুতরাং
বিষয়ী যেমন বলিতে পারে যে, "জ্ঞান আ-
মার", বিষয়ও সেইরূপ বলিতে পারে যে,
"জ্ঞান আমার"; তবে যে, ঘট-জ্ঞান উপ-
লক্ষে আমরা বলি যে, ইহা "আমারই
জ্ঞান—ইহা ঘটের জ্ঞান নহে, জ্ঞানের
প্রতি বিষয়ীরই অধিকার, তাহার প্রতি
বিষয়ের অধিকার নাই" এরূপ কেন বলি?
আমরা কি বিষয়ীর অনর্থক পক্ষপাতী?
কখনই না;—প্রজ্ঞা মধ্যস্থ-স্বরূপ হইয়া
আমাদিগকে বলে যে, আমি বলিতেছি
"জ্ঞান আত্মারই সম্পত্তি, উহা কোন কালেই
বিষয়ের সম্পত্তি নহে";—শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞার
কথাতে আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না,
এই জন্যই আমরা অন্য কোন প্রমাণের

অপেক্ষা না করিয়া—ইহা একেবারেই নিঃসংশয়-রূপে শিরোধার্য্য করি যে, এক-আত্মাই জ্ঞান-রত্নের অধিকারী, অনেক-বিষয় (কি নিদ্রা-কালে কি জাগ্রৎ কালে) কোন কালেই সে-রত্নের অধিকারী নহে। অতঃপর গণিত-সংক্রান্ত আর একটি উপমা প্রদর্শন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, যথা;—

একটা চক্রের বেষ্টন-রেখাকে পরিধি কহা যায়, এবং তাহার মধ্য-বিন্দু হইতে পরিধি—পর্য্যন্ত যে সকল সমান সরল-রেখা টানা যাইতে পারে, তাহাদের প্রত্যেককে অর কহা যায়। চক্রের পরিধিকে উহার অর দিয়া একপ্রকারে পরিমাণ করিতে পারা যায়, অন্যপ্রকারে সেরূপ করিতে পারা যায় না। উদাহরণ;—যদি একটা চক্রের পরিধিতে (অর্থাৎ বেষ্টন-ভাগে) তিনটি বিন্দু পরস্পর হইতে সমান দূরে বিন্যস্ত হয়, তবে সেই বিন্দু-ত্রয়ের যোগে চক্রের মধ্যে একটা সম-ভুজ ত্রিকোণ পাওয়া যাইতে পারে;

সেই ত্রিকোণের প্রত্যেক ধার এক-অর পরিমাণ আয়ত; সুতরাং সেই ত্রিকোণের (তিন ধারের সমষ্টি-রূপ) বেষ্টন-রেখা ঠিক তিন-অর-পরিমাণ আয়ত; চক্রের বেষ্টন-রেখা (অথবা পরিধি) অবশ্য তাহার অভ্যন্তরস্থিত সেই ত্রিকোণের বেষ্টন-রেখা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আয়ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; অতএব ইহা নিশ্চয় যে, উক্ত ত্রিকোণের বেষ্টন-রেখা যখন তিন-অর-পরিমাণ আয়ত, তখন উক্ত চক্রের বেষ্টন-রেখার পরিমাণ অবশ্য তিন অর হইতেও অধিক হইবে। পূর্ব্ব-বৎ প্রণালী অনুসারে চক্র-মধ্যে যদি একটা সম-ভুজ ষট্-কোণ আঁকা যায়, তবে তাহার বেষ্টন-রেখার পরিমাণ চক্র-পরিধির পরিমাণের আরও নিকটবর্ত্তী হইবে; যদি তথায় দ্বাদশ-কোণ আঁকা যায়, তবে ততোধিক; এমন কি, সহস্র-কোণ, দশ-সহস্র-কোণ, কোটি-কোণ, এইরূপ চক্রাভ্যন্তরস্থিত পরিধি-সংলগ্ন বহু-কোণ ক্ষেত্রের যতই কোণাধিক্য হইবে, ততই

তাহার বেষ্টনের পরিমাণ—চক্র পরিধির পরিমাণের সমধিক নিকটবর্ত্তী হইবে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, চক্রের পরিধি—তাহার অর-দ্বারা যত ইচ্ছা তত অধিকতর পরিমেয় হইতে পারে বটে, কিন্তু কোন কালেই একেবারে ঠিক অবিকলরূপে পরিমেয় হইতে পারে না। এস্থলে যেমন আমরা ইহা জানি না যে, অর-সম্বন্ধে পরিধির পরিমাণ ঠিক কত-সংখ্যক, অথচ ইহা আমরা নিশ্চয় জানি যে, অর এবং পরিধি দুয়ের মধ্যে একটি ধ্রুব পরিমাণ-পরিমেয়-সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেইরূপ, ইহা যদিও আমরা না জানি যে, চেতনা-গুণের মাত্রা কত পরিমাণ প্রবর্দ্ধিত হইলে আত্মার পরাকাষ্ঠা-চরিতার্থতা সিদ্ধ হইতে পারে, তথাপি প্রজ্ঞার প্রসাদে ইহা আমরা নিশ্চয় জানি যে, আত্মা এবং চেতনা-গুণ উভয়ের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য বস্তু-গুণ (অথবা আধার-আধেয়) সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে,—যে সম্বন্ধ কোন অবস্থাতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। অতঃপর

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সুষুপ্তি-কালে আত্মা যে একমাত্র থাকে, ইহা কিরূপে জানা যাইতে পারে? তবে তাহার উত্তর এই যে, সামান্য-বিশেষের (অথবা ঐক্যা-নৈক্যের) মূলতত্ত্ব, যাহা প্রজ্ঞাতে নিহিত আছে, তাহা আমাদিগকে এইরূপ কহে যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা-বিশেষের মধ্যে আত্মার সামান্য (অর্থাৎ সমানত্ব বা একত্ব) কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে; প্রজ্ঞার এই যে আশ্বাস-বাক্য, ইহার প্রতি একান্ত বিশ্বাস-বশতই আমরা এ বিষয়ে যৎপরোনাস্তি স্থির-নিশ্চয় আছি যে, আমাদের জ্ঞানের সমধিক খর্ব্বতা হইলেও আমাদের আত্মার একত্বের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয় না—পরন্তু উহা যেমন তেমনি সমান ভাবে বর্ত্তমান থাকে। গণিতান্তর্গত সূক্ষ্মাংশ-গণনার (Differential Calculus) বিষয় যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত আছেন, তাঁহারা অবশ্য জানেন যে, যদি কোন অবয়ব-দ্বয় পরস্পরের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ-নিয়মে আবদ্ধ হয়,

তবে তাহাদের পরস্পরের স্থূলাংশ সকলের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ-নিয়ম বর্ত্তে, তাহাদের লুপ্তাবশেষ অতিমাত্র সূক্ষ্মাংশ-সকলের মধ্যেও সেই একই সম্বন্ধ-নিয়ম সমান-রূপে বলবৎ থাকে; এখানেও সেইরূপ জানা আবশ্যক যে, জাগ্রৎ-কালের উজ্জ্বল-জ্ঞানের পক্ষে যে প্রকার ঐক্যানৈক্যের সম্বন্ধ-নিয়ম একান্ত আবশ্যক হয়, সুষুপ্তি কালের অতীব স্বল্পাবশিষ্ট জ্ঞানের পক্ষেও সেই নিয়ম সমান-রূপে বলবৎ থাকে। অবশেষে ইহা আর বাহুল্য রূপে প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা নাই যে, একই কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব—বিষয় হইতে জ্ঞানে, জ্ঞান হইতে আত্মাতে প্রবাহিত হইয়া, বিষয়কে পরাধীন, জ্ঞানকে পরস্পরাধীন, এবং আত্মাকে স্বাধীন রূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। যথা;—বিশেষ বিশেষ কার্য্যের সূত্র ধরিয়া আমরা ভূরি ভূরি পরস্পরাধীন কারণ জালে উত্তীর্ণ হইতে পারি, এবং সেই কারণ-জাল অবলম্বন করিয়া তাহাদের চরম অভিসন্ধি-রূপ মূলস্থিত এমনি একটি কারণে উপনীত হইতে

পারি, যে কারণ আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত স্মুতরাং স্বাধীন।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রজ্ঞা-ঘটিত মূলতত্ত্ব।

প্রজ্ঞা কাহাকে বলে?—বুদ্ধির লক্ষণ পূর্ব্বে এই রূপ স্থির করা হইয়াছে যে "সাধারণ হইতে বিশেষে—আত্মা হইতে বিষয়ে—অবতীর্ণ হওয়াতেই বুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায়"। প্রজ্ঞা-সম্বন্ধে এক্ষণে বক্তব্য এই যে, সাধারণ হইতে সার্ব্বভৌমিক – আত্মা হইতে পরমাত্মা—এই ঊর্দ্ধ-মুখ পথে, যে এক জ্ঞানবৃত্তি নিরন্তর স্ফূর্ত্তি পায়, তাহাকেই প্রজ্ঞা কহে। সাধারণ হইতে সাধারণ—তাহা হইতেও সাধারণ – একান্ত সর্ব্ব-সাধারণ—কি? না – সত্য। সত্যের সহিত যাহার কোন সম্পর্ক নাই, এমন বস্তু কোথায়

এই সার্ব্বভৌমিক সত্য-ভাবে, যেখানকার যত—সমুদায়-প্রজ্ঞা বলবৎ-রূপে আকৃষ্ট রহিয়াছে;—কদাপি বিচলিত হইবার নহে। এক্ষণে,—প্রজ্ঞা-ঘটিত মূলতত্ত্ব কি কি তাহাই অন্বেষণ করা যাইতেছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে-সকল মূলতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, প্রজ্ঞা-নিহিত সত্য-ভাবই তাহারদিগের অবশ্যম্ভাবিতার নিদান-স্বরূপ। দেশ অবশ্যই দীর্ঘে প্রস্থে এবং বেধে অপরিসীম বিস্তৃত হইবে; কাল অবশ্যই ভূত হইতে বর্ত্তমানে ও বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে অবিরত বহমান হইবে; বিষয়ী অবশ্যই এক, ভাবাত্মক, ও স্বাধীন হইবে; বিষয় অবশ্যই অনেক, অভাবাত্মক, ও পরাধীন হইবে;-ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবিতা কোথা হইতে আসিতেছে? আমি বলিতেছি—অথবা অন্য কেহ বলিতেছেন-বলিয়া নহে; পরন্তু মূল-সত্যেরই বলে, উক্ত তত্ত্ব-সকল অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। যিনি সকল সত্যের মূল, তিনিই মূল-সত্য; এবং বিশেষতঃ

আমারদের অন্তরে এই যে একটি মূল-সত্যের ভাব বর্ত্তমান আছে, ইহার যিনি মূল, তিনিই সেই মূল-সত্য। এই মূল-সত্যে অবিশ্বাস করিলে বিশ্বাস করিবার আর কিছুই থাকে না। যে ব্যক্তি বলে যে, “ মূল–সত্য নাই”, তাহার প্রতি বক্তব্য এই যে “ তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য কি মিথ্যা ? তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে উহার মূলে সত্য থাকাতেই উহা সত্য হইয়াছে, নতুবা আর কিসের গুণে উহা সত্য হইল ? সুতরাং মূল-সত্যের অস্তিত্ব—তোমার আপন কথা অনুসারেই প্রতিপন্ন হইতেছে”। এই মূল-সত্যই সৎ শব্দের অভিধেয়। বন শব্দের সহিত বন্য শব্দের যে রূপ সম্বন্ধ, সৎ শব্দের সহিত সত্য শব্দেরও সেই রূপ সম্বন্ধ। বনের গুণেই যেমন পশু-বিশেষ বন্য শব্দে অভিহিত হয়, সেই রূপ সতের গুণেই বস্তু-সকল সত্য শব্দের বাচ্য হইয়াছে। অতএব সৎ এবং মূল-সত্য উভয়ের একই অর্থ। মূল-সত্য যখন আছেন, তখন তিনি চিরকালই আছেন ;

কেন না, তিনি যদি কোন এক সময়ে না থাকিতেন, তাহা হইলে পরক্ষণে তিনি কোথা হইতে আসিবেন? শূন্য-অভাব-অসত্য হইতে সত্য কি রূপে বিনির্গত হইবে? "কথমসতঃ সজ্জায়তে"। পূর্ব্বে যদি অভাব মাত্র ছিল, তবে পরেও অভাব মাত্র না থাকিবার সম্ভাবনা কি? অতএব মূল-সত্য সর্ব্বক্ষণই বিদ্যমান আছেন;—যখন কোন জীবাত্মাই ছিল না, তখনও সেই মূল-সত্য বর্ত্তমান ছিলেন, এখনও তিনিই বর্ত্তমান আছেন। সেই যে পুরাতন এবং সনাতন সত্য, তিনি যেমন আমারদের মুখের কথার উপর নির্ভর করেন না, যেমন তিনি আমারদের শারীরিক মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক বলে স্থিতি করেন না, সেই রূপ তিনি অন্য কাহারও উপর নির্ভর করেন না, অন্য কাহারও বলে স্থিতি করেন না, তিনি আপনারই উপর নির্ভর করেন, আপনারই বলে স্থিতি করেন;—তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি আমারদের এই আধুনিক জ্ঞানের গুণে সত্য হয়েন নাই,

প্রত্যুত সেই সত্যেরই গুণে আমারদের এই জ্ঞান সত্য হইয়াছে। আমরা আপনার বলে তাঁহাকে জানিতেছি না, প্রত্যুত তিনি আমারদিগকে জ্ঞান প্রেরণ করাতেই আমরা তাঁহাকে জানিতেছি। তিনি অবিতথ সত্য-রূপে আমাদের সমক্ষে স্বয়ং বিরাজ করিতে-ছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে কাযেকাযেই জানিতেছি। এমন কখনই হইতে পারে না যে, তিনি বাস্তবিক এক রূপ হইয়া আর এক রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। প্রত্যুত ইহাই বিশ্বাস-যোগ্য যে, মূল-সত্য আপনার ভাব যাহা আমাদের আত্মাতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি যথার্থ রূপেই আপনার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আমা-রদের আত্ম-জ্ঞান যেমন আমারদের আত্মার স্বরূপের যথার্থই পরিচয় দিতেছে; অর্থাৎ "আত্মা আমাদের জ্ঞানে 'এক' রূপে প্রকাশ পাইতেছে বটে কিন্তু বাস্তবিক উহা দুই" ইহা যেমন অসম্ভব;—সেই রূপ মূল সত্য এবং মূল-সত্যের প্রজ্ঞা-গত ভাব, এ দুয়ের

মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ স্থান পাওয়া অসম্ভব; অর্থাৎ,—যদি মূল-সত্যের ভাব একমেবাদ্বিতীয়ং ও পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ যিনি মূল-সত্য তাঁহারই যে ঐ সকল লক্ষণ, ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। এতদনুসারে মূল-সত্যের স্বতঃ-সিদ্ধ লক্ষণ সকল নির্ণয় করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ।—অবশ্যম্ভাবী মূল-সত্যের ভাব, যাহা আমারদের অন্তরে নিহিত আছে, তাহা সকল সত্যের সম্বন্ধেই এক মাত্র অদ্বি-তীয়; কারণ, এই মূল-সত্যভাব অনুসারেই আমরা আপনাকে সত্য বলিতেছি, ইহারই অনুসারে আমরা অন্য ব্যক্তিকে সত্য বলি-তেছি, এবং এই একই সত্য-ভাব অনুসারে—কি জ্ঞান, কি জড়,—সকলকেই আমরা সত্য বলিতেছি। অতএব সাক্ষাৎ মূল-সত্য—যিনি উক্ত সত্য-ভাবের পরম প্রতিষ্ঠা—তিনি যে যথার্থই একমেবাদ্বিতীয়ং, ইহার কদাপি অন্যথা হইতে পারে না। কেন না, ইতি-পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মূল-সত্যের ভাব

এবং সাক্ষাৎ মূল-সত্য, উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ স্থান পাইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ।—এই অন্তর্নিহিত মূল সত্য-ভাব অনুসারেই আমরা বস্তু সকলের সদাত্মক বা ভাবাত্মক লক্ষণ সকল অবগত হই;—অর্থাৎ যাহা যে পরিমাণে এই মূল সত্য-ভাবের অনুযায়ী, তাহাকে সেই পরিমাণেই ভাবাত্মক বলিয়া অবধারণ করি। যথা;—জ্ঞান উক্ত সত্য-ভাবের অনুযায়ী হওয়াতে উহাকে আমরা ভাবাত্মক বলিয়া নিশ্চয় করি, মূঢ়তা সেরূপ না হওয়াতে ইহাকে আমরা অভাবাত্মক বলিয়া স্থির করি;—সুতরাং মূল-সত্যে সকল প্রকার ভাবাত্মক লক্ষণই বিদ্যমান আছে, এবং কোন অভাবাত্মক লক্ষণই তাঁহার রূপকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। উদাহরণ;—জড়-বস্তুর জ্ঞেয়ত্ব লক্ষণ আছে কিন্তু জ্ঞাতৃত্ব লক্ষণ নাই; সুতরাং জ্ঞেয়ত্ব উহার ভাবাত্মক লক্ষণ এবং অজ্ঞাতৃত্ব বা অজ্ঞতা উহার অভাবাত্মক লক্ষণ; আমারদের আত্মা আপনাকে আপনি জানে, সুতরাং ইহাতে

জ্ঞেয়ত্ব লক্ষণও আছে এবং জ্ঞাতৃত্ব লক্ষণও আছে। জড়-বস্তুতে জ্ঞেয়ত্ব-রূপ কেবল একটি-মাত্র ভাবাত্মক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আত্মাতে জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব রূপ দুইটি ভাবাত্মক লক্ষণ একত্র অবস্থিতি করে, সুতরাং আত্মার সম্বন্ধে জড়-বস্তু অভাবাত্মক। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, জড়-বস্তুর জ্ঞেয়ত্ব-রূপ ভাবাত্মক লক্ষণ যেটি, তাহা আমাদের আত্মাতে আছে; কিন্তু তাহার অজ্ঞতা রূপ অভাবাত্মক লক্ষণ যেটি, তাহা আমাদের আত্মাতে নাই। কিন্তু আমাদের এই আত্মাতে এক দিকে যেমন জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব-রূপ দ্বিবিধ ভাবাত্মক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, অন্য দিকে আবার উহাতে অল্পজ্ঞতা-রূপ অভাবাত্মক লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, পরমাত্মাতে সকল ভাবাত্মক লক্ষণই বিদ্যমান আছে,—সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব-রূপ যে দুই জ্ঞান-সম্বন্ধীয় ভাবাত্মক লক্ষণ জীবাত্মাতে অবস্থান করে, সে-দুই লক্ষণও তাঁহাতে অবশ্যই বিদ্যমান আছে,—কিন্তু জীবাত্মাতে

অল্পজ্ঞতা-রূপ অভাবাত্মক লক্ষণ যাহা দেখা গেল, তাহা পরমাত্মাতে কদাপি স্থান পাইতে পারে না ;—যেমন জড়-বস্তুর অজ্ঞতা-রূপ অভাবাত্মক লক্ষণ জীবাত্মাতে স্থান পাইতে পারে না,—সেইরূপ। আর আর লক্ষণ সম্বন্ধেও ঐরূপ ;—অর্থাৎ পরমাত্মাতে মঙ্গল-ভাবের এক-টুকুও অভাব নাই, সুতরাং তাঁহাতে অমঙ্গল ভাবের সম্পূর্ণ অভাব আছে ; তাঁহাতে জ্ঞানের একটুকুও অভাব নাই, অজ্ঞানের সম্পূর্ণই অভাব আছে; স্বাধীনতার এক টুকুও অভাব নাই, পরাধীনতার সম্পূর্ণই অভাব আছে। এই রূপ পরমাত্মাতে ভাবের অভাব নাই, প্রত্যুত অভাবেরই অভাব আছে,—অর্থাৎ তাঁহাতে কোন কিছুরই অভাব নাই; অতএব পরমাত্মা সর্ব্বতোভাবে ভাবাত্মক, তিনি পূর্ণ।

তৃতীয়তঃ।—পরমাত্মা যে সম্পূর্ণ-রূপে স্বাধীন (এক কথায়—তিনি যে স্বতন্ত্র), তাহা ইতি-পূর্ব্বে যথোচিত রূপে স্থাপিত হইয়াছে। যখন বলা হইয়াছে যে, সমুদায়

জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা অদ্বৈত, পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র; তখন তাঁহার সম্বন্ধে জগৎ যে, বিচিত্র, অপূর্ণ, এবং আশ্রিত, ইহা আর বলিবার অবশিষ্ট নাই। পরমাত্মার দ্বিতীয় একেবারে অসম্ভব, জগতের প্রত্যেক বস্তুর দ্বিতীয় সর্ব্ব প্রকারে আবশ্যক; পরমাত্মার কিছুরই অভাব নাই, জগৎ অভাব-দ্বারা নিয়তই ভ্রাম্যমান হইতেছে; পরমাত্মা আপনারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছেন, জগৎ অন্যের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না।

ইহা স্থির-সিদ্ধান্তই আছে যে, জগতের এক বস্তু অপর যে কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাও আবার অন্য আর এক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে; এবং যে সকল বস্তু পরস্পরাশ্রিত, তাহারাও আর একটি কোন সাধারণ আশ্রয়ের অবলম্বন ব্যতীত থাকিতে পারে না। উদাহরণ;—পৃথিবীর পরমাণু-সকল পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া আছে; এক পরমাণু নিকটস্থ আর এক পরমাণুকে এক দিকে আকর্ষণ করিতেছে এবং

শেষোক্ত পূর্ব্বোক্তকে তাহার বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছে ; এই রূপ আশ্রয়-সম্বন্ধে একের যাহা অভাব, অন্যে তাহা মোচন করত পৃথিবীর তাবৎ পরমাণু এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই-সকল পরমাণু-গণের পরস্পর সংযোগ-সাধক একটা কোন আশ্রয় যে অবশ্যই মূলে আছে, ইহা প্রথমতঃ সহজেই প্রতীয়মান হয় ; পশ্চাতে অনুসন্ধান দ্বারা জানা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থিত কেন্দ্রই সেই আশ্রয়-স্থান ; কেন না, তাহারই এক মাত্র আকর্ষণ বশতঃ পৃথিবীস্থ তাবৎ পরমাণু পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে ক্ষমবান্ হইতেছে। যেমন আকর্ষণাদি জড়-শক্তির আশ্রয়ে জড় বস্তু-সকল অবস্থিতি করে, সেই রূপ আবার জ্ঞান-প্রেমাদি চেতন-শক্তির আশ্রয়ে চেতন পদার্থ-সকলকে নির্ভর করিতে দেখা যায়। আত্মাদিগের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাবের সঞ্চার হইলে, এক আত্মা অন্য আত্মাকে কেমন আশ্চর্য্য রূপে ধারণ করিয়া থাকে ; প্রিয় ব্যক্তি নিকটে থাকিলে রোগ শোকের কেমন

উপশম হয় ; পিতা-পুত্রের আত্মার মধ্যে কেমন এক নিগূঢ় বন্ধন অবস্থিতি করে ; ঈশ্বর-পরায়ণ সাধু ব্যক্তি নিকটে থাকিলে মৃত্যু-কালেও কেমন অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ কেন হয় ? না ঈশ্বরের পূর্ণ ভাব, সমুদায় আত্মা-কে গূঢ় রূপে আকর্ষণ করাতে, উহারা পর-স্পর পরস্পরের সহিত এক না এক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছে, এবং সকলেই স্ব স্ব জীবন ধারণে অনুরাগী ও উদ্যোগী হইতেছে। জীব-নের প্রতি অনুরাগই জীবনের মূল ; এই অনু-রাগ শিথিল হইলে জীবনের মূলও শিথিল হইয়া যায়। ঈশ্বরের পূর্ণ জীবন্ত-ভাব যাঁহা-দের অন্তর্দৃষ্টি-পথে যত স্পষ্ট-রূপে আবি-র্ভূত হয়, তাঁহারা আপনারদিগের জীবনের উন্নতি পক্ষে তত অধিক অনুরাগী হন, এবং সেই অনুরাগ, ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ-জ্যোতি হইতে যতই আহুতি প্রাপ্ত হয়, ততই তাঁহারদের জীবন-শিখা আরও তেজস্বী ও ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে। কিন্তু যাঁহাদের মনে ঈশ্বরের ভাব এখনও যথোচিত পরিস্ফুট না হইয়াছে,

তাঁহারদের চক্ষে জীবন কখন কখন শূন্য রূপ ধারণ করে; এ অবস্থায় সাধুসঙ্গই তাঁহাদের পক্ষে মহৌষধ,—কেন না যথার্থ সাধু ব্যক্তির আত্মোৎসাহে অনেক নির্জীব হৃদয় জীবন পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারে, তাঁহার জ্ঞানা লোকে অনেক পথ-হারা পথিক পথ অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারে। আত্মাদিগের মধ্যে এই যে আশ্রয়-আশ্রিত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়,—এক মাত্র পরমাত্মা সকলের মূলে থাকাতেই এ রূপ হইতে পারিতেছে। তিনি মূলে থাকাতেই সকল আত্মা একই পূর্ণ ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে উৎসুক হইতেছে; এবং যিনি যত পূর্ণতার মাত্রা সঞ্চয় করিতেছেন, তিনি সেই পরিমাণে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের আত্মাতে অনুরাগ ও জীবন সঞ্চার করিয়া তাঁহারদিগকে উন্নতির পথে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন। অতএব এক বস্তুর আশ্রয় অন্য বস্তু, তাহার আশ্রয় আর এক বস্তু,—জগতের তাবৎ পদার্থই এই প্রকারে চলিতেছে। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, উহারদের

চরম আশ্রয়-দাতা কে?—এ প্রশ্ন কোন রূপেই নিবারণীয় নহে। চরম-আশ্রয় কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি আপনারই আশ্রয়ে আপনি স্থিতি করিতেছেন, যিনি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন;—সুতরাং পরমাত্মাই সমুদায় জগতের এক মাত্র মূল-কারণ এবং মূল-আশ্রয়।

এক্ষণে প্রজ্ঞার স্বতঃ-সিদ্ধ লক্ষণ-সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ।—বুদ্ধি এক এক পদ করিয়া সাধারণ হইতে সাধারণ তত্ত্ব-সকলে আরোহণ করে, প্রজ্ঞা একেবারেই সর্ব্বোপরিস্থ সত্যে মস্তক উন্নত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। সত্যের সত্য, আত্মার আত্মা, পরমাত্মাই প্রজ্ঞার চরম পর্য্যাপ্তি-স্থল। সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা স্বয়ং প্রজ্ঞার আকর হওয়াতে, এক জনের আত্মাতে প্রজ্ঞা যাহা বলে তাহা সকল আত্মা হইতেই সায় পায়—প্রজ্ঞা সার্ব্বভৌমিক।

দ্বিতীয়তঃ।—অপূর্ণ জগতে আমারদের

প্রজ্ঞা কখনই তৃপ্তি লাভে সমর্থ হয় না, কেন না জগতের সর্ব্বত্রই সত্যের অভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে; কেবল ঈশ্বরেতে লেশ মাত্রও সত্যের অভাব নাই। যখন অপূর্ণ-কিছুতেই প্রজ্ঞার তৃপ্তি হয় না, তখন ইহা বলা বাহুল্য যে, পূর্ণ-স্বরূপই উহার এক মাত্র উপজীব্য; তাঁহারই প্রসাদ উপভোগ করিয়া উহা নিত্য নিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হই-তেছে। প্রজ্ঞাকে যখন আমরা দেখি, তখন দেখি যে, স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক উহা প্রকাশিত হইতেছে; এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের প্রতি আমারদের বিশ্বাস এত প্রবল যে, তাঁহার নিকট হইতে অল্প কিছু পাইয়া আমাদের আশার কোন মতেই নিবৃত্তি হয় না। যাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয়, তাঁহার দান কি অক্ষয় হইবে না? অতএব সাক্ষাৎ তাঁহার নিকট হইতে আমরা যাহা কিছু প্রাপ্ত হই, তাহা হইতে আরও অধিক প্রাপ্তির জন্য আমাদের মন প্রত্যাশাপন্ন না হইয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে আমাদের কিছুই

ছিল না—তিনি যে কারণে আমারদিগকে এই অল্প কিছু প্রদান করিলেন, সেই একই কারণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা প্রত্যাশা করিতেছি যে, তিনি যখন আমারদের প্রার্থনার পূর্ব্বে আমারদের মহৎ অভাব-সকল পূর্ণ করিয়াছেন, তখন আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ অনিবার্য্য প্রার্থনা তিনি কেন না পূর্ণ করিবেন ? এবং এ প্রত্যাশার যখন তিনি নিজেই মূল, তখন তিনি যে উহা পূর্ণ করিবেনই, তাহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। আমরা যেমন দেখিতেছি যে, তিনি স্বয়ং প্রজ্ঞা-দ্বারা আমারদের আত্মার অভাব মোচন করিতেছেন, তেমনি ইহাও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি যে, উক্ত মঙ্গল কার্য্যে তিনি কখনই কৃপণতা করিবেন না ; অতএব ঈশ্বর-প্রসাদে আমারদের প্রজ্ঞা যে চির-উন্নতিশীল, ইহা আমরা নিশ্চয় রূপে জানিতেছি।

তৃতীয়তঃ।—প্রজ্ঞা অবশ্যম্ভাবী। প্রজ্ঞা যদিও অবশ্যম্ভাবি-রূপে আমারদের উপরে আধিপত্য করে, তথাপি তাহাতে আম

দের স্বাধীনতার কোন অনিষ্ট-সম্ভাবনা দূরে থাকুক, তাহাতেই আরও আমারদের স্বাধীনতার প্রাণ-ধারণ সম্পাদিত হয়। প্রজ্ঞা আমারদিগকে বলে যে, "তোমার ইচ্ছা হয় তুমি আমার সঙ্গে আইস, ইচ্ছা না হয় আসিও না, তোমার উপরে আমি বল-প্রয়োগ করিতে চাই না";—সুতরাং প্রজ্ঞাতে বলের আধিপত্য নাই প্রত্যুত স্বাধীনতারই আধিপত্য। ক্ষুৎপিপাসা আমাদিগকে বলে যে, "আমরা যাহা বলি, তাহা ভাল হউক মন্দ হউক তোমাকে তাহা করিতেই হইবে"। পরন্তু প্রজ্ঞা-নিহিত ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্য, আমাদিগকে কহে যে, "আমারদের কথা যদি তোমার ভাল বিবেচনা হয়, তবেই তাহা গ্রহণ কর, নতুবা তাহা গ্রাহ্য করিও না।" পশ্চাৎ আমরা দেখি যে, প্রজ্ঞা যাহা বলিতেছে তাহা কোন অংশেই অগ্রাহ্য নহে, তাহা অবশ্যই শিরোধার্য্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রজ্ঞার অবশ্যম্ভাবিতাই আমারদের স্বাধীনতার নিদান-স্বরূপ; এবং প্রজ্ঞার এই

ক্ষ বশ্যম্ভাবি-প্রভাব দ্বারাই, পরমাত্মা আমারদের মন হরণ করিয়া, সার্ব্বভৌমিক সুশৃঙ্খলার অধীনে—শান্তি মুক্তি ও মঙ্গলের অধীনে—আপনারই অধীনে আমারদিগকে দিন দিন আহ্বান করিতেছেন। প্রজ্ঞার প্রভাব দেহ মনের উপরে, উৎকৃষ্ট জীব ও নিকৃষ্ট জীবের উপরে, সহৃদয় আত্মীয়দিগের মধ্যে, সর্ব্বত্রই স্ফূর্ত্তি পায়। এবং জগৎ সংসারে প্রজ্ঞা যতই উজ্জ্বল রূপে স্ফূর্ত্তি পাইবে, ততই জীবাত্মা-সকল একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের অধীন হইয়া, ব্রহ্মবান্ হইয়া, স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবে;—ইহাতে জন-সমাজে পরম সুশৃঙ্খলা সমানীত হইবে। জ্ঞান যাহা বলে তদনুসারে চলাই যদি স্বাধীনতা হয়, জ্ঞানের অধীন হওয়াতেই যদি স্বাধীনতা হয়, তবে পূর্ণ-জ্ঞান-স্বরূপের অধীন হইলে আমারদের স্বাধীনতা কত না প্রবর্দ্ধিত হইবে? প্রজ্ঞার প্রভাব পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাতে নিশ্বসিত হয়, জীবাত্মা হইতে জীবাত্মাতে সঞ্চারিত হয়, এবং

জড়ীভূত বিষয়-রাশিকে আত্মার অধীনে আনয়ন করে। অতএব প্রজ্ঞা জড়বৎ অকর্ম্মণ্য নহে।—উহা ব্রহ্মতেজে বলী হইয়া, উৎসাহে পূর্ণ হইয়া, যখন জগৎ-সংসারে অভ্যুদিত হয়, তখন প্রভুর কর্ত্তৃত্বে যেমন দাসের কর্ত্তৃত্ব, অথবা সেনাপতির কর্ত্তৃত্বে যেমন সেনাগণের কর্ত্তৃত্ব, সেই রূপ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বে আমারদের আপনারদেরই কর্ত্তৃত্ব জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। সকল বস্তুই ঈশ্বরের অধীন; কিন্তু প্রজ্ঞার অবশ্যম্ভাবিতার গুণে আমরা স্বাধীন-রূপে, জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রীতি সহকারে, ঈশ্বরের অধীন হইতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রজ্ঞা-ঘটিত মূল-তত্ত্বগুলিকে নিম্নে লতা-বদ্ধ করা গেল।

পরমাত্মা	জগৎ	প্রজ্ঞা
অদ্বৈত	বিচিত্র	সার্ব্বভৌমিক
পূর্ণ	অপূর্ণ	উন্নতিশীল বা উদয়োন্মুখ
স্বতন্ত্র	আশ্রিত	অবশ্যম্ভাবী

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপসংহার।

ইতি পূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে যে সকল মূল-তত্ত্ব লতাবদ্ধ করা হইয়াছে, সকল-গুলি একত্র করিয়া যেরূপ একটি বিস্তীর্ণ লতা পরিকল্পিত হইতে পারে, তাহা পর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল।

পরমাত্মা	জগৎ	সম্বন্ধমূলক প্রজ্ঞা
অদ্বৈত	বিচিত্র	সার্ব্ব-ভৌমিক
পূর্ণ	অপূর্ণ	উন্নতিশীল বা উদয়োন্মুখ
স্বতন্ত্র	আশ্রিত	অবশ্যম্ভাবী

জগৎ

বিষয়ী	বিষয়	সম্বন্ধমূলক বুদ্ধি
এক	অনেক	সমষ্টি-বদ্ধ
ভাবাত্মক	অভাবাত্মক	সীমাত্মক
স্বাধীন	পরাধীন	পরস্পরাধীন

বিষয়

কালিক	দৈশিক	সম্বন্ধমূলক
আবির্ভাব	আবির্ভাব	ইন্দ্রিয়-বোধ
ভূত	দূর (দীর্ঘ)	গত্যাত্মক
বর্ত্তমান	বিস্তৃত(প্রস্থ)	প্রতিভাত্মক
ভবিষ্যৎ	ব্যাপ্ত (বেধ)	আবরণাত্মক

অত্রোপরি-স্থিত লতা সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব।—কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও লক্ষণ বিষয়ক জ্ঞান মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধ নহে। ইহাঁরা বলেন যে এক আর একে দুই হয়, এই প্রকার তুচ্ছ জ্ঞান-সকলকেই যাহা কিছু সর্ব্ববাদি-সম্মত দেখা যায়,—কিন্তু ঈশ্বর আছেন, তিনি পূর্ণ-জ্ঞান মঙ্গল-স্বরূপ এবং সমুদায়ের এক মাত্র স্রষ্টা, এবম্বিধ গুরুতর জ্ঞান-সকল ঈশ্বরানুগৃহীত বিশেষ বিশেষ মহাত্মার উপদেশ ব্যতীত কাহারও মনে স্বতঃ উদয় হইতে পারে না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, উপদেশের কথা যখন হইল, তখন একে একে দুই হয়, ইহাও শিক্ষক-বিশেষের উপদেশানুসারে আমরা শিখিয়াছি; কিন্তু উক্ত শিক্ষক কাহার নিকট হইতে শিখিয়াছেন? আর এক শিক্ষকের নিকট হইতে; এ শিক্ষকও আবার আর এক শিক্ষকের নিকট হইতে উক্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন; কিন্তু এ রূপ শিক্ষক-পরম্পরার সংখ্যা কি অনন্ত? কেহই কি আপনা হইতে উক্ত

জ্ঞানের সূত্র অন্বেষণ করিয়া পান নাই? অবশ্যই এক জন কেহ আপনার আন্তরিক স্বভাব হইতে উহার আভাস পাইয়া শিষ্যানু-শিষ্য পরম্পরায় তাহাই বহমান করত, তাহাকে উন্নতি-মুখে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা বলিয়া কি তাহার স্বতঃসিদ্ধতা বিষয়ে আমাদের লেশ মাত্রও সংশয় হয়? আমরা কি এরূপ মনে করি যে, শিক্ষক বলিয়াছেন বলি-য়াই তাহা আমারদের শিরোধার্য্য? প্রত্যুত আমরা কি এরূপ মনে করি না যে, শিক্ষক বলুন বা না বলুন—তাহা স্বতঃ-সিদ্ধ হওয়াতে তাহার কোন প্রকারেই অন্যথা হইতে পারে না? এই রূপ যিনি মূল-সত্য, তিনি এক মাত্র অদ্বিতীয় ও জ্ঞান-স্বরূপ, ইহা আমরা যদিও শিক্ষক-বিশেষের নিকট হইতে প্রকাশ্য-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি উহা গূঢ়-রূপে আমাদের অন্তরে আপনা-আপনি ছিল, সুতরাং উহা স্বতঃ-সিদ্ধ—এবিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় হইতে পারে না। এস্থলে এই আর একটি প্রশ্ন আসিতে পারে যে, "একে

একে দুই হয়", এই যৎসামান্য জ্ঞানও আমরা যেখান হইতে পাইতেছি, "জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বর আছেন"— এই অত্যাবশ্যক জ্ঞানও কি সেই খান হইতে আসিতেছে? ইহার উত্তর এই যে, আত্মা এক না হইলে, একের ভাব কোথা হইতে আসিত? বিষয় অনেক না হইলে, অনেকের ভাব কোথা হইতে আসিত? জ্ঞান সমষ্টি-বদ্ধ না হইলে, সমষ্টির ভাব কোথা হইতে আসিত? অতএব ইহাতে আর সংশয় কি যে, উক্ত তিনটি মূলতত্ত্বের প্রসাদেই, এক এবং এক—এ দুয়ের সমষ্টি দুই রূপে পরিগণিত হইতে পারিতেছে। অতএব সংখ্যা-সম্বন্ধীয় স্বতঃ-সিদ্ধতা এবং আত্মা বা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় স্বতঃ-সিদ্ধতা, উভয়ই যে একই উৎস হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে, ইহা একটুকুও অযথার্থ নহে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। এখানকার ঐ লতাটির অধোভাগে, দেশ, কাল এবং ইন্দ্রিয়-বোধের যোগাযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে বক্তব্য এই যে, বিষয়ের আবির্ভাব-সকল গতি

দ্বারা আমাদের মনে মুদ্রিত হয়, প্রতিভা দ্বারা আমাদের মনকে উত্তেজিত করে, এবং আবরণ দ্বারা—কৌতূহল জন্মাইয়া—আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। শৈশবাবস্থায় যতক্ষণ না আমাদের বুদ্ধি পরিপক্ক হয়, ততক্ষণ ঐরূপে আবির্ভাব-সকল-দ্বারা আমরা কেবলই ইতস্ততঃ চালিত হইতে থাকি। পরন্তু শৈশবাবস্থা অতীত হইবার উপক্রম-সময়ে, যখন বিষয়ের আবির্ভাব-সকল আমাদের জ্ঞানেতে পরিপাক পাইতে থাকে, তখন সে-সকল আবির্ভাবকে আমরা বুদ্ধিযোগে আমাদের নিজের সত্তা হইতে পৃথক্ করিয়া অবধারণ করি। এখানে জানা আবশ্যক যে, যে কোন আবির্ভাব আমাদের নিজের সত্তা হইতে ঐরূপে পৃথক্-কৃত হয়, তাহা কাযেই অন্য কোন বস্তু-বিশেষের সত্তাশ্রিত-রূপে প্রতিভাত হয়; সুতরাং আবির্ভাব-বিশেষকে আত্মার সত্তা হইতে পৃথক্ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, ভিন্ন বস্তুর সত্তা গ্রহণ না করিয়া বুদ্ধি কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

বিষয়ী আপন জ্ঞানেতেই আপনি প্রকাশ পায়—বিষয়ী স্বপ্রকাশ; কিন্তু বিষয় সেরূপ নহে, কেননা ইহা কেবল অন্যের জ্ঞানেতেই প্রকাশ পায়। আত্মান্ধ হইয়া অান্যের জ্ঞানে প্রকাশিত হইতে গেলে, সেই পরকীয় জ্ঞানের নিয়মাধীন হইয়াই প্রকাশিত হইতে হয়, স্বাধীন-রূপে প্রকাশিত হওয়া যায় না। এই হেতু বিষয় আপনি যে রূপ, সে রূপে আবির্ভূত না হইয়া, বিষয়ীর অভিমত ছদ্ম-বেশ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হয়; সুতরাং বিষয়-সকলের প্রকৃত ভাব এক রূপ এবং উহারদের আবির্ভাব আর এক রূপ। ইন্দ্রিয়-বোধ-সহকারে বিষয়ের আবির্ভাব, অগ্রে দেশ কালে প্রতিভাত হইলে, পশ্চাতে উহার স্বরূপ-গত লক্ষণ-সকল বুদ্ধি-সংক্রান্ত প্রজ্ঞার যোগে অভিব্যক্ত হয়। বিষয়-সকল বাস্তবিক অনেক, অভাবাত্মক, ও পরাধীন, অথচ উহারা এক ভাবাত্মক এবং স্বাধীন-রূপ ছদ্ম বেশ ধরিয়া দেশ কালে প্রবেশ করত ইন্দ্রিয়-প্রহরি-গণকে প্রবঞ্চিত করে,

কিন্তু বুদ্ধি সেই ছদ্ম-বেশ ভেদ করিয়া বিষয়ের বাস্তবিক লক্ষণ-সকল অবগত হইতে চেষ্টা করে; এবং প্রজ্ঞাতে উক্ত লক্ষণ-সকল অবিতথ-রূপে প্রকাশমান হয়।

অতএব বিষয়-সকল ইন্দ্রিয়-সমক্ষে যে রূপ দেখায়, তাহা সত্য নহে—তাহা ভান মাত্র, তাহা জ্ঞান নহে—তাহা বোধ মাত্র। যথা;—ইন্দ্রিয়-সমক্ষে সূর্য্য অতিশয় অল্পায়তন বলিয়া বোধই হইতে পারে,—জানা হইতে পারে না;—কেবল বুদ্ধি-দ্বারাই জানা হইতে পারে যে, উহার আয়তন বাস্তবিক অতীব সুবিশাল। এই জন্য ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াকে ইন্দ্রিয়-বোধ বলা যেমন সঙ্গত, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বলা কখনই সে প্রকার সঙ্গত নহে। একটা মৃৎপিণ্ডকে হস্তে ধারণ করিলে ইন্দ্রিয়-সমক্ষে আপাততঃ বোধ হয় যে, এই একটি বিষয়কেই কেবল আমি উপলব্ধি করিতেছি; কিন্তু বাস্তবিক এই যে, উহাকে আমরা আপন হস্ত-প্রদেশ হইতে এবং অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া অবলোকন করিতেছি, সুতরাং অন্যান্য

বস্তুকেও সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করিতে হই-
তেছে। দ্বিতীয়তঃ হৃৎপিণ্ড-টাকে সাক্ষাৎ
প্রত্যক্ষ দেখিয়া বোধ হয় যেন, উপস্থিত চেতন-
ভাব উহার মধ্য হইতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে
কিন্তু বাস্তবিক উহা অচেতন বস্তু—উহার
ভিতরে কোন ভাব নাই। তৃতীয়তঃ বোধ
হয় যেন উহা আপন শক্তিতে স্থিতি করি-
তেছে; কিন্তু বাস্তবিক উহা সচেতনবৎ
স্বাধীন বস্তু নহে—সুতরাং উহা অন্যের অধী-
নেই অবস্থান করিতেছে।

এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, বিষয়-সকল
ইন্দ্রিয়-সকাশে যে রূপে আবির্ভূত হয়, তাহা
উহারদের স্বরূপের অবিকল প্রতিরূপ নহে।
যেমন এক ব্যক্তি স্বরূপতঃ সাধু নহে, আপ-
নাকে আপনি সাধু বলিয়া জানে না,—অথচ
সাধু-সমাজে যথাসাধ্য সাধু-ভাব প্রকাশ ক-
রিতে বাধ্য হয়; সেই রূপ, বিষয় আপনাকে
আপনি সত্য বলিয়া জানে না, অথচ বিষ-
য়ীর সমক্ষে যথা সাধ্য সত্য-ভাব প্রকাশ
করিতে বাধ্য হয়। বিষয়ের মায়া-জাল, বিষ-

য়ের কৃত্রিমতা, এই প্রকার বচন-সকল পুরাতন কালাবধি যাবতীয় তত্ত্ব-বিৎ-গণের গ্রন্থে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু আত্মারও যে ঐরূপ কৃত্রিমতা হইতে পারে, এবং ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয়—পরমাত্মা-রও যে ঐরূপ কৃত্রিমতা হইতে পারে, ইহা কেবল আধুনিক ইউরোপীয় কোন কোন তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতের গ্রন্থ-মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু শেষোক্ত আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক তাহার আর সন্দেহ নাই; কারণ, পরমাত্মা যখন সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন, তখন তিনি যে আপনাকে অসত্য-রূপে প্রকাশ করিবেন, ইহা ত একেবারেই অসম্ভব এতদ্ব্যতীত,—কোন মনুষ্যই জ্ঞান-সত্ত্বে আপ-নার নিকটে আপনি অসত্য-রূপে প্রকাশ পাইতে ইচ্ছা করে না, কেবল অজ্ঞতা বশতই মনুষ্য ওরূপ করিতে বাধ্য হয়। মনুষ্য অপনি এক রূপ হইয়া অন্যের নিকটে আর এক রূপ দেখাইলে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয় না বটে, কিন্তু আপনার নিকট হইতে আপনার

স্বভাব ঐ রূপ গোপন রাখা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ইহা অস্বীকার করা যাইতেছে না যে, ব্যক্তি-বিশেষ বিষয়-মায়াজালে এরূপ আচ্ছন্ন হইতে পারে যে, সে ব্যক্তি অভিমান বশতঃ আপনি বাস্তবিক ক্ষুদ্র হইয়াও আপনাকে মহৎ মনে না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না;—এখানকার কেবল এই মাত্র তাৎপর্য্য যে, আত্মা যে পরিমাণে স্বধর্ম্মানুযায়ী, অর্থাৎ উহা যে পরিমাণে জ্ঞানবান্ ও স্বাধীন, সেই পরিমাণে উহা আপনার নিকটে যথার্থ রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে; কারণ, আত্মা স্বাধীন-রূপে ও সজ্ঞান-রূপে কেন যে আপনাকে আপনি প্রতারিত করিবে, ইহার একটুকুও অর্থ হইতে পারে না। আরও এই দেখা যায় যে, সাধু মহাত্মারা অন্যের নিকটেও আপনাদিগকে অসত্য রূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না, প্রত্যুত ইঁহারা আপনাদের পবিত্র অন্তঃকরণকে সাধারণ-সমক্ষে যথার্থ-রূপে প্রকাশ করিতেই সর্ব্বদা যত্ন পাইয়া থাকেন। ঈশ্বরের ভক্তেরাই যখন

এই রূপ, তখন স্বয়ং ঈশ্বর আমারদের ক্ষুধিত আত্মা-সমক্ষে আপনাকে যে রূপ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ঠিক সত্য কেন না হইবে? অতএব ইন্দ্রিয়গণই মায়ার রাজ্য বা আবির্ভাবের রাজ্য, বুদ্ধি আপেক্ষিক সত্যের রাজ্য বা ভাবের রাজ্য, প্রজ্ঞা পরম সত্যের রাজ্য বা প্রভাবের রাজ্য।

ইন্দ্রিয়গণকে অবিশ্বাস করাই জ্ঞান-উপার্জ্জনের প্রথম সোপান; কেন না মায়াবী ইন্দ্রিয়গণের প্রতিকূলে সংগ্রাম করিয়াই বুদ্ধি সত্য-রাজ্যে আপন অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। উদাহরণ;—সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে না, কিন্তু পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; দূরস্থিত নক্ষত্র-বিশেষ চক্ষুতে এক-সংখ্যক দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা দ্বিসংখ্যক; সূর্য্যের আলোক একই প্রকার দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক উহা সপ্ত প্রকার বর্ণের সংমিশ্র; মোহ বশত মনে হয় যে, বিষয় স্বাধীন, আত্মা পরাধীন;—কিন্তু বাস্তবিক আত্মা স্বাধীন, বিষয় পরাধনী; এই

রূপ আরও ভূরি ভূরি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এত ক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ নিতান্তই অবিশ্বাসের পাত্র, বুদ্ধি কতক বিশ্বাসের যোগ্য, ও প্রজ্ঞা সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য।

বর্ত্তমান স্থলের লতা দেখিয়া সহসা এই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, মূল-তত্ত্ব সকলের তিনটি সোপান,—দেশ কাল, বিষয়বিষয়ী, ঈশ্বর জগৎ; ইহার মধ্যে উচ্চতম সোপানের সহিত মধ্যম সোপানের যেমন একটি মিল আছে, অধঃস্থিত সোপানের সহিত সেরূপ না হইবার কারণ কি? ইহার প্রতি আমারদের বক্তব্য এই যে, অধঃস্থিত সোপানেও জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছা মূলক সম্বন্ধের একপ্রকার নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে, যথা; কালের যে তিনটি অবয়ব (ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ) তথায় বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভূত কালের সহিত জ্ঞানের বিশিষ্টরূপ সম্বন্ধ, বর্ত্তমানের সহিত ভাবের

বিশিষ্ট-রূপ সম্বন্ধ, এবং ভবিষ্যতের সহিত ইচ্ছার বিশিষ্ট-রূপ সম্বন্ধ. স্পষ্ট-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ;—যাহা পূর্ব্বে ছিল বা হইয়াছে, তাহাই আবিষ্কার করা জ্ঞানের সবিশেষ লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ, সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা,—যাহা বর্ত্তমান. অথবা ভূত-পূর্ব্ব বা ভাবি সুখ দুঃখ—যাহা কল্পনাতে ঠিক যেন বর্ত্তমান, তাহারই প্রতি—বর্ত্তমান কালেরই প্রতি—ভাবের সবিশেষ লক্ষ্য। তৃতীয়তঃ, ইহা অতীব স্পষ্ট যে, ভবিষ্যৎ কার্য্যের প্রতিই ইচ্ছার সবিশেষ লক্ষ্য। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, বিষয়ীর—একত্র ভাবাত্মকতা এবং স্বাধীনতা—এ তিনটির সঙ্গে যেমন, কালের—ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—এতিনটির সঙ্গেও তেমনি, জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছার সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে।

তৃতীয় প্রস্তাব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্পষ্ট-রূপে স্থাপিত হইয়াছে যে, বুদ্ধি-চালনাতে আমারদের আপনাদেরই কর্ত্তৃত্ব সপ্রমাণ হয় ; এক্ষণে, প্রজ্ঞাতে উক্ত কর্ত্তৃত্বের যে রূপ

নিষ্প্রয়োজনীয়তা, তাহাই প্রদর্শন করা যাই-তেছে। আমারদের আপনারদের বলে সত্য জানাতে বুদ্ধির প্রভাব ব্যক্ত হয়, পরন্তু সত্যের বলে সত্য জানাতে প্রজ্ঞারই মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। সত্যের বলে জানা, মঙ্গলের বলে কার্য্য করা, এবং সৌন্দর্য্যের বলে প্রীতি করা, এ তিনটি একই প্রকার উন্নত অবস্থার কার্য্য। সত্যে বিশ্বাস, সৌন্দর্য্যে অনুরাগ, এবং মঙ্গলে উৎসাহ,—ইহাতেই প্রজ্ঞার প্রাধান্য, ইহাতেই মনুষ্যত্ব। নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য যখন আমারদের সম্মুখে, তখন কি আমরা যুক্তি ও কর্ত্তৃত্ব পুরঃসর তাহাতে প্রীতি সমর্পণ করি? না আমাদের প্রীতি আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে? এই রূপ, অবিতথ সত্য যখন আমারদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে বিরাজ করে, তখন আমারদের বিশ্বাস আপনা হইতেই আবির্ভূত হয়; এবং যখন অমায়িক মঙ্গল আমারদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আপনা হইতেই আমাদের উৎসাহ প্রজ্বলিত

হইয়া উঠে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হই-
তেছে যে, পরমাত্মা আমাদের ব্যাকুলতা ও
একান্ত আগ্রহ দেখিয়া এবং প্রার্থনা শ্রবণ
করিয়া যখন কৃপা-পূর্ব্বক আপনাকে আমার-
দের নিকট পরিষ্কার-রূপে ব্যক্ত করেন, তখন
আমারদের জ্ঞান প্রীতি কর্ত্তৃত্ব ও সমুদায়
মনের বৃত্তি যথোচিত চরিতার্থতা-পথে সহ-
জেই ধাবমান হয়, এবং তাহাতে আমরা
যৎপরোনাস্তি কৃতার্থ হই। আমারদের
আপন কর্ত্তৃত্ব যে রূপ বুদ্ধির প্রাণ, ঈশ্বরের
প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সেই রূপ প্রজ্ঞার প্রাণ।
ঈশ্বরের বাক্য-স্বরূপ প্রজ্ঞা-নিহিত সত্য-সকলে
যদি আমারদের শ্রদ্ধার হানি হয়, তাহা
হইলে কেবল তর্ক-মাত্রের বলে আমরা
কখনই উহারদিগকে আয়ত্ত করিতে পারি
না। যে ব্যক্তি বলে যে ঈশ্বর নাই, অথবা
আমি নাই, অথবা বাহ্য বস্তু নাই, তাহার
সহিত ঐ-সকল বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক
করিতে গেলে অনর্থক বাক্য ব্যয় ভিন্ন আর
কোন ফলই দর্শিতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং

আমারদিগকে বলিতেছেন যে, "তুমি বাস্তবিক পদার্থ, মৃত্যুর হস্তেও তোমার বিনাশ নাই"—তাঁহার এ কথায় অবিশ্বাস করিয়া ফল কি? তিনি বলিতেছেন যে, "সকলের উপরে আমি বিরাজমান আছি, সকলেতেই মঙ্গল হইবে, ভয় নাই,'—ইহাতেই বা অবিশ্বাস করিয়া ফল কি? উক্ত-সকল বাক্যের প্রতি বিশ্বাসের অধিকার যাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা কি বহু-মূল্য নহে? তাহাতে কি আমারদের আত্মার তৃপ্তি হয় না? সত্যে বিশ্বাস না করিয়া অসত্যে বিশ্বাস করাই কি শ্রেয়ঃ? অতএব উক্ত প্রকার বিশ্বাস কোন অংশেই পরিত্যজ্য নহে, প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয়;—"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্তু"। স্বতঃ-সিদ্ধ সত্য-সকল যে নিতান্ত বিশ্বাস-যোগ্য, ও সে বিশ্বাস যে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-সাপেক্ষ, তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডীয় বিখ্যাত পণ্ডিত সর্ উইলিয়ম হামিল্টন এই রূপ মত ব্যক্ত করি-

য়াছেন যে, "কতকগুলি সত্য, যাহাকে আমরা স্বতঃ-সিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা যখন আমরা বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি না; তখন তদ্বিষয়ে আমরা হাঁ কি না কোন কথা কহিবারই অধিকারী নহি"। এতদুপলক্ষে আমারদের বক্তব্য এই যে, আমারদের বুদ্ধি উক্ত প্রকার সত্য-বিশেষকে সম্যক্-রূপে আয়ত্ত করিতে পরাভব মানিলেও, আমরা তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না; এবং তাহাতে বিশ্বাস করিবার অধিকার আমারদের সম্পূর্ণ আছে ও তাহাতে অবিশ্বাস করিবার লেশ মাত্রও অধিকার নাই। এতদ্বিরুদ্ধে কথিত মহাত্মার যুক্তি-প্রণালী এই রূপ; যথা, আকাশ অসীম—ইহাও আমরা জানিতে পারি না, আকাশ যে অসীম নহে—ইহাও আমরা জানিতে পারি না। ইহার প্রমাণ,—প্রথমতঃ, আকাশকে আমরা যত পরিমাণ আয়ত বলিয়া জানিতে পারি, উহাকে তাহা হইতেও অধিক আয়ত বলিয়া না জানিলে উহাকে অসীম বলিয়া

জানা হয় না ; এই রূপ আকাশের আয়তন আমারদের জ্ঞানের অতীত হওয়াতেই উহা অসীমরূপে প্রকাশ পায়, সুতরাং উহার অসীমতা—জ্ঞান কর্ত্তৃক অবধারিত হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, আকাশের সীমা আছে ; কেন না, যদি বলা যায় যে, আকাশ এই টুকু, তাহা হইলে উহা যে; তাহা হইতেও আর একটুকু অধিক, ইহা বলিবার বাধা কি ? অতএব ইহা যেমন জানিতে পারা যায় না যে, আকাশ অসীম, ইহাও সেই রূপ জানিতে পারা যায় না যে, আকাশের সীমা আছে। সর্ উইলিয়ম হামিল্টনের এই রূপ দ্বৈধ-জনক তর্ক বিতর্ক সত্য-জ্যোতিকে নির্ব্বাণ করিতে উদ্যত হইলেও, সত্য-জ্যোতি তাহাতে আন্দোলন পাইয়া যে আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, ইহা কিছু মাত্র বিচিত্র নহে। সকল মনুষ্যই নিঃসংশয়-রূপে জানিতেছে যে, আকাশ অসীম, কিন্তু আকাশের সীমা আছে ইহা বিশ্বাস করিতে কেহই সমর্থ নহে ; এতদবস্থায় কোন্ বিচারে

সিদ্ধ হইতে পারে যে, আকাশের অসীমতা ও সসীমতা উভয়ই জ্ঞানের চক্ষে সমদৃষ্টি-ভাজন? অতএব এ বিষয়ে আর অধিক বাক্য-ব্যয়ের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি এ রূপ প্রশ্ন করা যায় যে, আকাশের অসীমতা আমরা কি রূপে অবগত হই? তবে ইহার যথোচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক। আমারদের জ্ঞান শরীর-পিঞ্জরে কিয়ৎ পরিমাণে আবদ্ধ হওয়াতে, উহা সমুদায় আকাশকে সমান দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে না; আপনার শরীর-গত আকাশকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী মনে করে, এবং তাহা হইতে যে আকাশ-খণ্ড যত বিচ্ছিন্ন, তাহাকে ততই দূরবর্ত্তী মনে করে; কিন্তু যদি আমারদের জ্ঞান কিছু মাত্র দেহ-বদ্ধ না হইয়া, ঐশ্বরিক জ্ঞানের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ হইত, তাহা হইলে অসীম আকাশকে আমরা একই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এককালেই অবলোকন করিতাম, তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব ঈশ্বরের নিরপেক্ষ ও অমায়িক জ্ঞানের প্রতি আমারদের বিশ্বাস অটল

থাকাতেই তাঁহার সম-দৃষ্টি-ভাজন অসীম আকাশের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না ; "জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে" "সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহি চরণ, কর বিনা করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে"। আমরা আপনারা যাহা জানি, তাহারই কেবল অস্তিত্ব আছে, ও অন্য ব্যক্তি যাহা জানে তাহার অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ-স্থল,—এ রূপ বলা যেমন স্পর্দ্ধা মাত্র ; আমরা আপনারা অসীম আকাশকে জ্ঞানে ধারণ করিতে পারি না বলিয়া উহা আছে কি না সন্দেহ-স্থল—এ উক্তিও সেই রূপ। কেন না উহাকে জ্ঞানে ধারণ করিতে আমরাই অশক্ত, ঈশ্বর কদাপি অশক্ত নহেন ; অতএব যদি ইহা স্বীকৃত হয় যে, আমরা যাহা নাও জানি, তাহার অস্তিত্ব থাকিবার বাধা নাই, এবং ঈশ্বর যাহা জানেন তাহার অবশ্যই অস্তিত্ব আছে, তাহা হইলেই অসীম আকা-শের অস্তিত্ব আপনা হইতে অনুগমন করে। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে যে, অসীম

আকাশের অস্তিত্বে যথোচিত বিশ্বাস করিতে গেলে ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞানে বিশ্বাস করা অগ্রে আবশ্যক; পূর্ণ-স্বরূপ পরমাত্মার প্রসাদেই আমরা অসীমের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, নতুবা কেবল যুক্তি মাত্র দ্বারা আমরা কোন কালেই উক্ত ভাব উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতাম না। এই রূপ, আমারদের আত্মা এবং বহির্ব্বস্তু-সকল অনন্ত কাল বর্ত্তিয়া থাকিবে, এ বিশ্বাসটিও অনন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-সাপেক্ষ; এবং আর আর স্বতঃ-সিদ্ধ সত্য-সম্বন্ধেও দেখান যাইতে পারে যে, পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাস ব্যতিরেকে উহাদের বিশ্বসনীয়তা সমূলে নির্ম্মূল হইয়া পড়ে। পুনর্ব্বার এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঈশ্বরের পূর্ণতা আমরা কি প্রকারে অবগত হই? ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতেছে। আমরা যদি আপনার প্রতি পক্ষপাত-শূন্য হইয়া সত্যের প্রতি মনঃ-সমাধান করি, তাহা হইলে আমরা আপনারা যে কত অপূর্ণ, তাহা একেবারেই আমারদের জ্ঞান-গোচর হইবে; কেন? না—পূর্ণতার

ভাব আদর্শ-রূপে আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে স্বতই বিরাজমান রহিয়াছে ; এই মহান্ আদর্শের প্রতি যখন আমারদের দৃষ্টি যায়, তখন কাজেই আমারদের আপনারদিগকে তাহার তুলনায় অতীব অকিঞ্চন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। কেহ বলিলেও বলিতে পারেন যে, পৃথিবীতে এ রূপ ভূরি ভূরি উৎকৃষ্ট সামগ্রী বিদ্যমান আছে, যাহার তুলনায় আপনাকে ঐ রূপ অকিঞ্চন মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ইহার উত্তর এই যে, যখন আমরা নির্জ্জনে উপবেশন-পূর্ব্বক বহির্ব্বিষয়-সকল হইতে মনকে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া, আপন আত্মার প্রতি প্রণিধান করি, তখনই আরও বিশিষ্ট-রূপে আপন প্রগাঢ় অকিঞ্চনতা আমারদের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করে ; এবং যত কেন উৎকৃষ্ট বহুমূল্য সামগ্রী সে অবস্থায় আমাদের অন্তঃকরণের নিকটস্থ হউক না, অমনি তাহার মূল্য একেবারে মৃত্তিকাসাৎ হইয়া পড়ে। অতএব অন্য কোন কারণে নহে, কেবল এক

পূর্ণতার ভাব আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে জাগরূক হওয়াতেই, আমরা, তাহার সমক্ষে নতমস্তক না হইয়া কোন রূপেই নিস্তার পাইতে পারি না। এই পূর্ণতার ভাবকে আমরা আপনারা ভাবিয়া চিন্তিয়া আনয়ন করিতে পারি না, প্রত্যুত উহা আপনা হই তেই স্বীয় গুরু ভার ও স্বর্গীয় মহিমা সহকারে অতীব শুভ ক্ষণে আমারদের আত্মাতে আ-সিয়া উদিত হয়। অতএব আমারদের অপূর্ণ আত্মা হইতে নহে—পূর্ণস্বরূপ পরমাত্মা হই-তেই পূর্ণতার ভাব প্রকাশিত হইতেছে।

এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, পূর্ণতার ভাব আমারদের বুদ্ধি-দ্বারা কোন রূপেই প্রাপ্য নহে, অথচ প্রজ্ঞা উহার প্রতি নিঃসং-শয়-রূপে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে পারে না। এখানে পুনর্ব্বার এই একটি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রজ্ঞা কেমন করিয়া বুদ্ধির অগম্য সত্য-সকলকে উপলব্ধি করে? ইহারও উত্তর দেওয়া যাই-তেছে।—বুদ্ধি-চালনার একটি প্রকরণ-পদ্ধতি

আছে, কিন্তু প্রজ্ঞার সে রূপ কোন প্রকরণ নাই। বাস্তবিক সত্য-সকলের দিকে বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয় বটে কিন্তু কোন কালেই উহা প্রকৃত গম্য স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, উহা কোন সত্যেরই শেষ পর্য্যন্ত পারদর্শী হইতে পারে না। পরন্তু প্রজ্ঞা একেবারেই বাস্তবিক সত্যে গিয়া বিশ্রাম করে। বুদ্ধি এবং বুদ্ধির সিদ্ধান্ত, এ দুয়ের মধ্যে যুক্তি-প্রকরণ-রূপ ব্যবধান অবস্থিতি করে, কিন্তু প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞার সত্য, এ দুয়ের মধ্যে কিছুই ব্যবধান নাই; সুতরাং বুদ্ধি-সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, উহা কি প্রকরণ দ্বারা সত্য উপলব্ধি করে, কিন্তু প্রজ্ঞা-সম্বন্ধে ওরূপ জিজ্ঞাসা নিতান্তই অর্থ-হীন। উদা-হরণ;—বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে জানিতে গেলে সে জানার কখনই শেষ হয় না, সুতরাং আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা সুকঠিন হয়; "নেতি নেতি" ইহা নহে ইহা নহে—এইরূপ অশেষ প্রকরণ দ্বারা বুদ্ধি আত্মাকে ধরিতে যায়, কিন্তু কোন কালেই ধরিতে পারে না।

অসীম আকাশকে বুদ্ধি, যখন ইহা নহে—ইহা হইতেও অধিক, তাহা নহে—তাহা হইতেও অধিক, এই রূপ "নেতি নেতি"-প্রকরণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে যায়, তখনও উহা ঐরূপই পরাভব মানে। কিন্তু প্রজ্ঞা, তর্ক বিতর্ক ও যুক্তি-রূপ প্রকরণ ব্যতিরেকেও, একেবারেই জানিতেছে যে, আমারদের জীবাত্মা আছে, অসীম আকাশ আছে, পূর্ণ-স্বরূপ পরমাত্মা আছেন, ইত্যাদি। অতএব যাঁহারা প্রজ্ঞার প্রকৃতি-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারদেরই মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় যে, কি প্রকরণ দ্বারা প্রজ্ঞা পূর্ণ-স্বরূপকে উপলব্ধি করে? অন্যথা এ প্রশ্ন মূলেই উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধি-প্রকরণ দ্বারা সত্য উপার্জ্জন করাতে আমারদের আপনাদেরই কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়; কিন্তু কোন প্রকরণকে অপেক্ষা না করিয়া সত্যের বলে সত্যে প্রত্যয় করাতে, সত্য-স্বরূপেরই কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। আমারদের আপন কর্তৃত্ব যেমন বুদ্ধির প্রাণ, সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মে বিশ্বাস সেই রূপ প্রজ্ঞার

প্রাণ। এই স্বাভাবিক বিশ্বাস, যাহা কোন প্রকরণ-পরতন্ত্র নহে, তাহাকে আত্ম-প্রত্যয় কহে; এবং বিনা প্রকরণে যে জ্ঞান আমারদের আত্মাতে আপনা আপনি আবির্ভূত হয়, তাহাই সহজজ্ঞান শব্দে উক্ত হইয়াছে। সহজ শব্দের অর্থ সঙ্গে সঙ্গে জাত আত্মা থাকিলেই যে জ্ঞান তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়, তাহাই সেই প্রজ্ঞা-মূলক সহজ জ্ঞান। এই আত্ম-প্রত্যয় এবং সহজ-জ্ঞান সহকারেই প্রজ্ঞা, বুদ্ধির অপ্রাপ্য বাস্তবিক সত্য-সকলকে ঈশ্বর-প্রসাদে উপলব্ধি করিয়া থাকে; এবং প্রজ্ঞা যাহা বলে, তাহাতে বিশ্বাস ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই।

চতুর্থ প্রস্তাব। এই গ্রন্থের প্রথমাবধি যে কয়েকটি মূলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি, অথচ যাহার বিষয়ে প্রমাণাদি প্রদর্শন করিতে আমরা নিতান্তই বিমুখ হইয়াছি, তাহা এই;—কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব, বস্তু-গুণের মূলতত্ত্ব, ঐক্যানৈক্যের মূলতত্ত্ব। এই কয়েকটি মূলতত্ত্ব-বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন

না করাতে, আপাততঃ আমাদের যন্ত্রের ত্রুটি—মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক এই যে, উল্লিখিত তিনটি মূলতত্ত্ব কোন রূপ প্রমাণ-দ্বারা প্রমেয় হইতে পারে না; প্রত্যুত যে কোন প্রমাণ আমাদের জ্ঞানের নিকটে গ্রাহ্য হয়, তাহা ঐ তিনটি মূল-তত্ত্বেরই প্রসাদে হইয়া থাকে। যথা;—কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্বে যদি কোন ব্যক্তির বিশ্বাস না থাকে, তবে তাঁহার নিকটে কোন কিছু প্রমাণ করিবার সময়ে, তদুপলক্ষে আমরা যে কোন কারণ উল্লেখ করিব, সেই কারণেরই কারণত্ব-বিষয়ে তিনি সংশয় করিবেন; এই রূপ যিনি কারণের কারণত্ব-বিষয়ে অবিশ্বাস করিলেন, কোন্ যুক্তিতে তিনি প্রমাণের প্রমাণত্ব-বিষয়ে বিশ্বাস করিবেন? অতএব কার্য্য-কারণাদি মূলতত্ত্ব-সকল, বিশ্বাস ব্যতিরেকে, প্রমাণের গ্রাহ্য হইতে পারে না।

পরন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কার্য্য-কারণাদি মূলতত্ত্ব-সকল লইয়া এক-

নও যে রূপ তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান গ্রন্থে তদ্বিষয়ের আন্দোলনে একেবারে ঔদাসীন্য অবলম্বন করা কোন মতেই বিধেয় নহে; অতএব কার্য্য-কারণের ভাব কি রূপ, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এটি জ্ঞান-কাণ্ড, এই হেতু তৃতীয় অধ্যায়ে কেবল জ্ঞান-সম্বন্ধেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বিষয়ী স্বাধীন ও বিষয় পরাধীন; কিন্তু আনুষঙ্গিক-রূপে ইহাও দর্শাইতে ত্রুটি করা হয় নাই যে, শক্তির সহিত ইচ্ছারই বিশিষ্ট-রূপ সম্বন্ধ; এই জন্য ইচ্ছা-সম্বন্ধে যে রূপ বিষয়ীর স্বাধীনতা ও বিষয়ের পরাধীনতা, তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বর্ত্তমান প্রস্তাবের যথেষ্ট মীমাংসা হইতে পারিবে। ইহা যেমন স্বতঃ-সিদ্ধ যে, জ্ঞান-দ্বারা অন্যকে জানিতে হইলে আপনাকেও সঙ্গে সঙ্গে জানিতে হয়; ইহাও সেই রূপ যে, ইচ্ছা দ্বারা অন্যকে নিয়মিত করিতে হইলে আপনাকেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত করিতে হয়। উদাহরণ;—

পদ-দ্বয়কে পরিব্রজন-কার্য্যে নিয়মিত করিতে হইলে, আপনাকে পরিব্রাজক-রূপে নিয়মিত করা কাযেকাযেই আবশ্যক হয়। এই রূপ, আমরা মস্তিষ্ক চালনা করি, বা জ্ঞানেন্দ্রিয় চালনা করি, অথবা কর্ম্মেন্দ্রিয় চালনা করি,—যে কোন কার্য্য করি, তাহার সঙ্গে আপনারদিগকে সেই সেই কার্য্যের কর্ত্তা রূপে নিয়মিত না করিলে, তাহা কোন রূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে যে, বিষয়ী আপনার উপরে এবং অন্যের উপরে উভয়ত্রই কার্য্য প্রকটন করিয়া থাকে। পরন্তু বিষয়-সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এই রূপ দেখা যায় যে, যদিও আকর্ষণাদি শক্তি-দ্বারা এক বিষয় অন্য বিষয়কে নিয়মিত করে বটে; কিন্তু কোন বিষয়েরই এরূপ সামর্থ্য নাই যে, তাহা আপনি আপনাকে নিয়মিত করে। যথা;—বিষয়-সকল আকর্ষণ-শক্তি দ্বারা আপনি আপনাকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু অন্য বিষয়-সকলকেই আকর্ষণ করে; বাধা-শক্তি

দ্বারা আপনাকে বাধা প্রদান করে না, অন্য-কেই বাধা প্রদান করে; প্রকাশ-শক্তির দ্বারা আপনার নিকট প্রকাশিত হয় না, বিষয়ীর নিকটেই প্রকাশিত হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, বিষয়-সকল আপনাদের শক্তি-দ্বারা আপনারদিগকে নিয়মিত করিতে কোন রূপেই সমর্থ নহে; সুতরাং উহারা যে, অন্যের শক্তি-দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় নাই। অতএব আমরা আপন আত্মাকেই দেখি, আর অন্য কোন বস্তু-কেই দেখি, সর্ব্বত্রই কার্য্য-কারণের ভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে; এবং এ ভাবটিকে ছাড়িয়া চলা জ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অসাধ্য। আমরা যখন ইন্দ্রিয়-দ্বারা একটা তরুকে প্রত্যক্ষ করি, তখন আলস্য, জড়তা, বা অজ্ঞান আসিয়া আমারদের কর্ণে এই রূপ কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে, উহার আবার কারণ কোথায়? দেশ কালে যাহা প্রতি-ভাত হইতেছে, তাহাই যথেষ্ট; কিন্তু বুদ্ধি সেই আলস্যকে পরাজয় করিয়া উক্ত

ইন্দ্রিয়-গোচর বৃক্ষের প্রতিমাকে আবির্ভাব মাত্রমনে করে এবং ভাব-রাজ্যে তাহার কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হয় ; বুদ্ধি উক্ত বৃক্ষের বাহ্য আবির্ভাব ভেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে যে একটি জীবনী শক্তি আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে ব্যগ্র হয়। ইতিপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিষয়ী স্বাধীন ; কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, বিষয়ী আপন ইচ্ছানুসারে স্বাধীন হয় নাই ; ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই উহা স্বাধীন হইয়াছে, এবং নিয়ত কাল স্বাধীন-রূপে বর্ত্তিতেছে, সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছা-সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন। ঈশ্বর চাহেন যে, আমরা স্বাধীন হই, এই জন্যই আমরা স্বাধীন হইয়াছি আমরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষের অধীন বলিয়াই, এমন যে অমূল্য রত্ন স্বাধীনতা, তাহা বিনা-আয়াসে প্রাপ্ত হইয়াছি। যেমন শরীরের অভ্যন্তরে একই আত্মা স্বাধীন রূপে কার্য্য করিতেছে ; সেই রূপ,—কি জড়, কি আত্মা, প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে একমেবা-

দ্বিতীয়ং পরমাত্মা সম্যক্ স্বাধীনতা-সহকারে কার্য্য করিতেছেন। ঈশ্বর যিনি, তিনি সকল কারণের কারণ, সকল অধিপতির অধিপতি।

ইউরোপীয় কোন কোন পণ্ডিত-সম্প্রদায় এই রূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, "কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে" ইহা একটি কথার কথা মাত্র। ইহাঁদের মতে, যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহা কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; কারণ-সত্তা আমাদের জ্ঞানে এক বিন্দুও স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং কার্য্য-বিশেষের কারণ আছে, ইহা কেবল আমাদের মনের কল্পনা মাত্র। ইহাঁরদের প্রতি বক্তব্য এই যে, আমরা যখন আপনারদিগকে কোন কার্য্যের কর্ত্তা-রূপে নিয়মিত করি, তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও মনকে এরূপ প্রবোধ দিতে পারি না যে, উক্ত কার্য্যের আমরা আপনারা কারণ নহি। অতএব স্বাধীন কারণ যে আছে—ইহা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে জাজ্বল্য-রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, আত্মার কারণত্ব আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি ; কিন্তু রূপ-রসাদির কারণ-স্বরূপ কোন বহি-র্বস্তু যে আছে, ইহা আমরা নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি না ; কারণ, আমরা যখন ইচ্ছা-সহকারে পদ-ব্রজে চলিতেছি, তখন সেই ইচ্ছা-রূপ কারণ আমাদের জ্ঞানের অধি-কারের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; কেন না, আমরা ইচ্ছা মাত্রেই সে ইচ্ছাকে নিরোধ করিতে পারি। কিন্তু, কোন একটা বৃক্ষের কারণ-স্বরূপ বীজকে, কেবল-মাত্র আমাদের ইচ্ছা-দ্বারা আমরা কখনই প্রতিরোধ করিতে পারি না ; ইহাতে কাযেই এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৃক্ষের অথবা অন্য কোন বহির্বস্তুর কারণ আমাদের জ্ঞানের অধিকারের অভ্যন্তরে অব-স্থিতি করে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যে কোন কারণ আমাদের জ্ঞানের অধিকা-রের বাহিরে স্থিতি করে, তাহা আমরা কি রূপে অবগত হইব ? ইহার প্রতি আমা-

দের বক্তব্য এই যে. আলোক যখন আমা-
দের দর্শনে প্রতিভাত হয়, তখন আমরা
অবশ্যই এইরূপ প্রত্যয় করি যে, আমাদের
নিজের ইচ্ছা-দ্বারা নহে কিন্তু অন্য কোন
কারণ-দ্বারাই আলোক স্ফুরিত হইতেছে।
পরে আমাদের বুদ্ধি কতকগুলি চিহ্ন অব-
লম্বন করিয়া, সেই কারণ-বিষয়ক আরও
কতকগুলি বিশেষ তথ্যের মীমাংসায় প্রবৃত্ত
হয়। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, কার্য্য-কার-
ণের মূলতত্ত্ব অবধারণ-বিষয়ে, বুদ্ধির কিছু
মাত্র অধিকার নাই, "কার্য্য-মাত্রেরই কারণ
আছে"—ইহা প্রজ্ঞাতে যৎপরোনাস্তি ধ্রুব
রূপে প্রকাশমান আছে;—বুদ্ধির কিসে
অধিকার? না আবশ্যক-মতে প্রজ্ঞা হইতে
সেই কার্য্য-কারণ-ভাবের যথোপযুক্ত মাত্রা
আহরণ করিয়া, ইন্দ্রিয়-গম্য আবির্ভাব-সক-
লেতে তাহাকে প্রয়োগ করে,—এই-রূপ কার্য্যো-
তেই বুদ্ধির যাহা কিছু অধিকার। উদাহ-
রণ;—আলোক দেখিবামাত্র আমরা এইরূপ
অবধারণ করি যে, আলোকের কারণ আমরা

আপনারা নহি—অন্য কোন বস্তুই আলোকের কারণ; পরে যখন এই প্রকার জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় যে, সে কারণ কি প্রকার? তখন বুদ্ধি —প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া—তাহার এই রূপ প্রত্যুত্তর দেয় যে, আমারদের আপন ইচ্ছার সম্বন্ধে আমারদের আত্মা যেরূপ, আলোকের কারণ যাহা—তাহা আলোকের সম্বন্ধে অবিকল সেই রূপ। পুনশ্চ দেশ কাল ঘটিত কতকগুলি চিহ্ন ধরিয়া, বুদ্ধি কারণ-বিষয়ক কতিপয় বিশেষ বিশেষ তথ্য নিরূপণ করিতে পারে; কিন্তু প্রজ্ঞা-নিহিত মূলতত্ত্বের ন্যায়, বুদ্ধির কোন সিদ্ধান্ত একেবারেই অকাট্য হইতে পারে না। যথা, আমরা যখন বৃক্ষ-বিশেষকে উত্তরোত্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থান করিতে দেখি, তখন সেই দেশ-কাল-ঘটিত চিহ্ন অবলম্বন করিয়া এইরূপ স্থির করি যে, বৃক্ষোৎপত্তির কারণ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে রহিয়াছে, কিন্তু বায়ুতে যদি এরূপ কোন কারণ থাকে যে, তাহা মৃত্তিকার পরমাণু-সকলকে উপর-

দিকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে বৃক্ষরূপে সজ্জিত করে, তবে তাহা যে একেবারেই অসম্ভব, ইহাও বলা যাইতে পারে না। অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, প্রথমতঃ কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব-বিষয়ে কাহারও মনে একটুকুও সংশয় স্থান পাইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ আমারদের ইচ্ছার সম্বন্ধে আমারদের আত্মা যেরূপ, আলোকাদি আবির্ভাব সকলের সম্বন্ধে যাহা সেইরূপ—তাহাই ঐ আবির্ভাব-সকলের কারণ, আমরা আপনারা সে-সকলের কারণ নহি;—ইহাও ঐরূপ নিঃসংশয়। এতদ্ভিন্ন, বুদ্ধি পরীক্ষা অবলম্বন দ্বারা যে যে কার্য্যের যে যে কারণ নিরূপণ করিয়া থাকে, তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে, অসত্য হইলেও হইতে পারে প্রত্যুত কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব, যাহা প্রজ্ঞাতে নিহিত আছে, তাহা কোন ক্রমেই অস ত হইতে পারে না।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় নাই —জিজ্ঞাস্য

বিষয় এই যে, বহির্বিষয়ের কারণত্ব আমার-দের জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত হইয়াও, তাহা কিরূপে আমারদের জ্ঞানের গম্য হইতে পারে? ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, বহির্বিষয়ের কারণত্ব আমারদের বুদ্ধির অধিকার-বহির্ভূত হইলেও, তাহা প্রজ্ঞার অধিকার-বহির্ভূত নহে; সুতরাং প্রজ্ঞা-দ্বারা বহির্বিষয়ের কারণত্ব উপলব্ধি করিবার কিছু-মাত্র বাধা নাই। উদাহরণ;— ইহা একটি সু-নিশ্চিত সত্য যে, রেখা-মাত্রেরই দুইটি প্রান্ত-ভাগ থাকা আবশ্যক; এতদুপলক্ষে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র রেখা —যাহা আমারদের চক্ষুর গম্য নহে, তাহা-রও কি দুইটি প্রান্ত-ভাগ আছে? তবে তাহার উত্তর ইহা-ভিন্ন আর কি হইতে পারে যে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র রেখা আমারদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইতে পারে কিন্তু তাহা কদাপি প্রজ্ঞা-বহির্ভূত হইতে পারে না; এই জন্য প্রজ্ঞা যখন বলিতেছে যে, রেখামাত্রেরই দুইটি প্রান্ত-ভাগ থাকা আবশ্যক, তখন রেখা-বিশেষ

যত কেন দৃষ্টি-বহির্ভূত হউক না, তথাপি তাহার দুইটি প্রান্ত-ভাগ থাকিবেই থাকিবে। এই-রূপই বলা যাইতে পারে যে, বহির্বিষয়ের কারণত্ব যত কেন আমারদের বুদ্ধি-বহির্ভূত হউক না, তথাপি "কার্য্য-মাত্রেরই কারণ থাকা আবশ্যক"—প্রজ্ঞার এই মূলতত্ত্বটি যখন আছে, তখন বহির্বিষয়ের কারণত্ব অস্বীকার করা কোন মনুষ্যেরই সাধ্যায়ত্ত নহে। স্বপ্নেতেও যে-সকল রূপ-রসাদি আবির্ভাব আমারদের ইন্দ্রিয়-গোচর হয়, সে-সকলেরও যে বহির্বিষয়ই কারণ, তাহাতেও আমারদের সংশয় হইতে পারে না। কেননা, স্বপ্ন-কালে আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, তাহা আমারদের আপন ইচ্ছাধীন নহে; সুতরাং তাহাও যে বহির্ব্বস্তু-মূলক তাহাতে আর সংশয় নাই। রূপ রস প্রভৃতির বাহন-স্বরূপ আলোকাদি ভৌতিক বস্তু-সকল এত সূক্ষ্ম যে, তাহা ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া আমারদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করত তথায় বিধৃত হইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। এই সকল সূক্ষ্ম

পদার্থ-নিচয়ের মধ্যে জাগ্রৎ-কালে আমরা কল্পনা-দ্বারা যে সকল যোগাযোগ সংস্থা-পন করি, বুদ্ধি তখন অন্যান্য গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, তাহারা সে সময়ে স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পায় না; কিন্তু নিদ্রাকালে যখন আমারদের বুদ্ধি-বৃত্তি শিথিল হইয়া পড়ে, তখন তাহারা শ্রেণী-পরম্পরায় অল্পে অল্পে উদ্বোধিত হইয়া নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে থাকে। পরন্তু স্বপ্ন-গত বিষয়-সমূহে দেশ-কাল-ঘটিত কৃত্রিমতার প্রাদুর্ভাব বলিয়া উহাদিগের বিষয়ত্ব অস্বীকার করা কোন রূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে; কেন না, পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বিষয়-মাত্রেতেই ঐ রূপ কৃত্রি-মতা অবস্থান করে;—অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাতে মস্তিষ্ক-বিলীন বিষয়-সকলকে আমরা যে দূর দূর দেশে প্রত্যক্ষ করি, তাহা সেই রূপ কোন নিয়মানুসারে হইবে—যেমন দূরব-র্ত্তিতা-হেতু বৃহৎ সূর্য্যকে আমরা অল্পায়-তন মনে করি ও দুঃখ-আগমন-হেতু অল্প পরিমাণ সময়কে সুদীর্ঘ মনে করি। অতএব

ইহা সর্ব্ব-প্রকারেই স্থিরতর হইল যে, ইন্দ্রিয়-বোধের কারণ-রূপেই আমরা বিষয়-সকলকে উপলব্ধি করি। ইহাও নিশ্চয় যে, বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়বোধের কারণ—বিশেষ বিশেষ বিষয়; যথা, রূপ-বোধের কারণ আলোক, গন্ধ-বোধের কারণ অন্য কোন বিষয়; তরুর কারণ এক বিষয়, বিশেষ বিশেষ শাখার কারণ আর আর বিশেষ বিশেষ বিষয়, বিশেষ বিশেষ পল্লবের কারণ অপরাপর বিষয়, ইত্যাদি। অবশেষে বক্তব্য এই যে, কার্য্য-কারণ-বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে এই মূল-তত্ত্বটিকে মাত্র স্মরণ করা—যে, পরি-বর্ত্তন মাত্রেরই উপযুক্ত কারণ আছে, তাহা হইলেই সকল সংশয় তিরোহিত হইবে । ।

---

* সম্প্রতি ধর্ম্ম-তত্ত্ব-বিষয়ে এক খানি অতীব সারবান্ গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই নূতন গ্রন্থ খানির সহিত বর্ত্তমান গ্রন্থের এত অনৈক্য হইত না—যদি শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার মহাশয় উপক্রমণিকার এক স্থানে এই-ভাবে একটুকু ইঙ্গিত না করিতেন যে, কার্য্য-কারণ-বিষয়ক মূল-তত্ত্ব-সকল নিতান্ত আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ নহে। ইহার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যখন

কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব-বিষয়ে যেরূপ বলা হইল, ঐক্যানৈক্যের মূলতত্ত্ব-বিষয়েও সেই রূপ বলা যাইতে পারে যে, তাহার কোন প্রমাণ নাই, অথচ তাহার প্রতি আমারদের বিশ্বাস যৎপরোনাস্তি বেগে ধাবিত হয়। ইহার একটি বিশেষ উদাহরণ এই যে, সুষুপ্তি-কালেও, আমাদের আত্মা

তিনি শক্তিকে আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন কার্য্য-কারণকে আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ বলিবার কি আর অবশিষ্ট রহিল ? যেহেতু শক্তি ভাবিতে গেলেই, কার্য্য এবং কারণ উভয়কেই সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে হয় ;—যেমন জ্ঞান ভাবিতে গেলেই, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়কেই সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে হয়। যথা,—শক্তি কাহার ? কারণের ; শক্তি কিসের ? কার্য্যোৎপাদনের ; জ্ঞান কাহার ? জ্ঞাতার ; জ্ঞান কিসের ? জ্ঞাত-বিষয়ের। যদি বলা যায় যে, জ্ঞানই কেবল আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞানের সহিত জ্ঞাত-বিষয়ের যে অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ— যথা জ্ঞাত-বিষয় মাত্রেরই জ্ঞান-ময় জ্ঞাতা থাকিতে চায়— তাহা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ নহে, —ইহা যখন সত্য হইতে পারে না ; তখন ইহা কি রূপে সত্য বলিয়া বিশ্বাস্য হইবে যে, শক্তিই কেবল আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ, কিন্তু শক্তির সহিত কার্য্য-কারণের যে অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ, যথা কার্য্য-মাত্রেরই শক্তি-ময় কারণ থাকিতে চায়, তাহা সেরূপ আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ নহে !

যে এক—ইহার বিপর্য্যয় হয় না। পূর্ব্বে যেমন একটি উদাহরণ-প্রয়োগ দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, রেখা-বিশেষ ক্ষুদ্রতা-বশতঃ যদিও আমারদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হয়, তথাপি তখনও তাহার প্রান্ত-ভাগ দুইটির ন্যূন হইতে পারে না; সেই একই যুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, নিদ্রাকর্ষণবশতঃ আত্মা যদিও আমারদের জ্ঞান-বহির্ভূত হয়, তথাপি তখনও তাহা পূর্ব্ববৎ এক মাত্রই থাকে। বুদ্ধি-ঘটিত মূল-তত্ত্বের অধ্যায়ে যেহেতু এ বিষয়ের যথা-সাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে, এই হেতু এখানে তাহা লইয়া আর অধিক আন্দোলন করিবার আবশ্যকতা নাই।

যাঁহারা বলেন যে, কার্য্য-সকলের কারণ আবশ্যক নাই, তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, গুণ-সকলের আধার-ভূত বস্তু আবশ্যক নাই। পরন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে বুদ্ধি-ঘটিত যে কয়েকটি মূল-তত্ত্ব স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে বস্তু-গুণ-বিষয়ে এই রূপ

পাওয়া যায় যে, প্রথমতঃ লক্ষণ তিন প্রকার—ভাবাত্মক অভাবাত্মক ও সীমাত্মক; দ্বিতীয়তঃ ভাবাত্মক-লক্ষণের আধার—আত্মা, অভাবাত্মক-লক্ষণের আধার—বিষয়, সীমাত্মক-লক্ষণের আধার—বুদ্ধি-বৃত্তি অথবা মন। ভাবাত্মক-লক্ষণ এবং সত্ত্ব-গুণ, অভাবাত্মক লক্ষণ এবং তমো-গুণ, সীমাত্মক লক্ষণ এবং রজো-গুণ, ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ অর্থ-সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে;—যথা; প্রথমতঃ সত্ত্ব-শব্দের অর্থ— সত্তা, ভূধাতু-সমুৎপন্ন ভাব-শব্দের অর্থও সত্তা; অতএব সত্ত্ব-গুণ এবং ভাবাত্মক-লক্ষণ এ দুই বচনের একই প্রকার অর্থ করিবার কিছু মাত্র বাধা নাই; দ্বিতীয়তঃ অভাবাত্মক লক্ষণ এবং তমো-গুণ— এ দুই বচনের ত স্পষ্টই সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে; তৃতীয়তঃ রজঃ শব্দে কলুষ-মিশ্র বুঝায়, এতদনুসারে রজোগুণ শব্দে বুঝায়—সত্ত্ব এবং তমঃ এ দুই গুণের সম্মিশ্র; সীমাত্মক-লক্ষণও ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক এ দুই লক্ষণের সম্মিশ্র; অতএব সীমাত্মক লক্ষণ এবং রজো-

গুণ এ দুই বচনের মধ্যেও সম্যক্ সাদৃশ্য প্রতিভাত হইতেছে। এক্ষণে সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিন প্রকার গুণের সুস্পষ্ট-রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। পুষ্পের একটি গুণ—সুগন্ধ, কিন্তু আমারদের ঘ্রাণ-গুণেই সেই সুগন্ধ-গুণ প্রকাশ পায় ;—পুষ্পের অপ্রকাশ্য গুণ-বিশেষ ঘ্রাণ-গুণের যোগেই সুগন্ধ রূপে পরিণত হয়। বিষয়ি-সন্নিধানে বিষয়েতে যে সকল গুণ প্রকাশ পায়, তাহারা ঐরূপ সংযোগাত্মক—সুতরাং অবিশুদ্ধ—হওয়াতে তাহাদিগকেই রজো-গুণ বলা যাইতে পারে। পরন্তু জ্ঞান-প্রেমাদি আত্মার যে-সকল গুণ, তাহা স্বয়ং আত্মাতেই প্রকাশ পায় ;—পুষ্পের সুগন্ধ-গুণ যেমন স্বয়ং পুষ্পেতে প্রকাশ না পাইয়া বিষয়ীর ঘ্রাণে প্রকাশ পায়, সে রূপ নহে। পুষ্প যত ক্ষণ না ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারস্থ হয়, ততক্ষণ উহা সুগন্ধ-গুণে বঞ্চিত থাকে, কিন্তু আত্মার জ্ঞানাদি গুণ সকল আত্মাতেই প্রকাশ পায়. ইহাদিগকে অন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে

হয় না; সুতরাং এ সকল গুণ কেবল-মাত্র আত্মারই গুণ, ইহারা অন্য কোন বস্তুর গুণ দ্বারা দূষিত নহে। আত্মার জ্ঞানাদি গুণ সকল এই রূপ বিশুদ্ধ বলিয়া ইহাদিগকেই সত্ত্ব গুণ বলা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, পুষ্পের সুগন্ধ-গুণ হইতে বিষয়ীর ঘ্রাণ-গুণকে বিযুক্ত করিয়া লইলে, পূর্ব্বোক্ত সুগন্ধ-গুণ একেবারেই অপ্রকাশ হয়; এই রূপ, বিষয়ীর অগোচরে বিষয়-সকলেতে যে-সকল অপ্রকাশ্য গুণ অবস্থিতি করে, তাহাদিগকেই তমোগুণ বলা যুক্তি-সিদ্ধ। উক্ত ত্রিবিধ গুণের একটি উদাহরণ;—আমরা দূর হইতে একটা বৃক্ষকে যখন শ্যামবর্ণ অবলোকন করিতেছি, তখন তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লবগুলিকে আমরা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু এই অদৃশ্য পৃথক্ পৃথক্ পল্লবগুলি শ্যামবর্ণ হওয়াতেই সমুদায় বৃক্ষটি শ্যামবর্ণ দেখাইতেছে; এবং পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ পৃথক্ পত্রগুলি যদি শ্বেতবর্ণ হইত, তাহা হইলে শেষোক্ত বৃক্ষটিও শ্বেতবর্ণ

রূপে প্রত্যক্ষ হইত। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেকটি পৃথক্ পৃথক্ পল্লবের শ্যাম-বর্ণ গুণ আমাদের দৃষ্টির অগোচর, অথচ সমুদায় বৃক্ষের উক্ত প্রকার গুণ সচ্ছন্দে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে; এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, নেত্রের অগোচর পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র পল্লবের শ্যামবর্ণ-গুণ যাহা অপ্রকাশ রহিয়াছে, তাহাই তমোগুণ; সমুদায় বৃক্ষের উক্ত-প্রকার গুণ যাহা নেত্র-গোচরে প্রকাশ পাইতেছে তাহাই রজোগুণ; এবং যে জ্ঞান-গুণের সন্নিধানে উহা শ্যামবর্ণ-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই সত্ত্ব গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

ইতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সত্ত্ব গুণ এবং ভাবাত্মক-লক্ষণ উভয়েরই অর্থ— সত্তা-বিষয়ক গুণ, অর্থাৎ "হওয়া"-বিষয়ক গুণ। আমরা—জ্ঞাতা ভোক্তা বা কর্ত্তা—যাহা কিছু "হই", জ্ঞানাদি সত্ত্ব-গুণ সহকারেই আমরা তাহা হইয়া থাকি; অতএব "হইবার" গুণ-ই সত্ত্ব গুণ। দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়-

দ্বারা আমারদের কথা বার্ত্তা শ্রুত হইলে এবং আচার ব্যবহার দৃষ্ট হইলে, ভিতরে আমরা যে রূপ "হই", বাহিরে তাহাই প্রকাশিত হয়; এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, রূপ-রসাদি রজো-গুণ সহকারেই আমরা আপনা-দিগকে বাহিরে দেখাইয়া থাকি; অতএব "দেখাইবার" গুণই রজোগুণ। তৃতীয়তঃ জ্ঞানাদির প্রতিবন্ধক-স্বরূপ—মোহ জড়তা ও কুসংস্কারাবহ—যে-সকল অপ্রকাশ্য গুণ জড়-বস্তুতে অবস্থিতি করে,—যদ্দ্বারা আমরা অন্ধভাবে প্রবৃত্তির স্রোতে নীয়মান হই,—তাহাই তমো-গুণ;—জড়-বস্তু-মূলক যে-এক প্রতিবন্ধকতা-গুণ বা বন্ধন-গুণ—তাহাই তমো-গুণ। এতক্ষণ যাহা বলা হইল. তাহাতে এই পাওয়া যাইতেছে যে, বিশুদ্ধ-জ্ঞান, আত্ম-প্রসাদ, স্বাধীনতা,—ইহারা সত্ত্বগুণ; শব্দ, স্পর্শ. রূপ, রস, গন্ধ,—ইহারা রজো-গুণ; এবং কুতর্ক কুসংস্কার ও মোহের মূল যে এক জড়তা, তাহাই তমোগুণ। এক্ষণে স্পষ্ট হইল—সন্দেহ নাই যে, বিশুদ্ধ-

জ্ঞানাদি সত্ত্ব-গুণ-সকল আত্মার স্বকীয় গুণ; জড়তা-প্রভৃতি তমোগুণ-সকল জড়-বস্তুর স্বকীয় গুণ; এবং শব্দ-স্পর্শাদি রজো-গুণ-সকল মনের গুণ।

এখানে জানা আবশ্যক যে, আত্মার সম্যক্ অধীনস্থ যে এক আন্তরিক বিষয়—যদ্দ্বারা আমরা ইচ্ছা মতে নানা সামগ্রী কল্পনা করি—যাহাকে আমরা ইচ্ছা-মতে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যথা তথা নিয়োগ করি,—যাহাকে আমরা কখনও বাহ্য বিষয়েতে আবদ্ধ করি, কখনও বা তাহা হইতে মুক্ত করিয়া যথেষ্ট-রূপে আপনার অধীন করিয়া লই,—জড় এবং আত্মার মধ্যবর্ত্তী এই, যে এক অত্যদ্ভুত সূক্ষ্ম পদার্থ, ইহাকেই বিশিষ্ট-রূপে মন কহা যায়; কিন্তু সামান্যতঃ আত্মা এবং মন উভয়ই একই অর্থে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, জড়-গুণ ও চেতন-গুণ এ দুয়ের মধ্যে অবশ্যই একটি সম্বন্ধ আছে, এবং জ্ঞান-গুণ ও ইচ্ছা-গুণ এ দুয়ের মধ্যেও একটি সম্বন্ধ আছে; এক্ষণে

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ এবং শেষোক্ত সম্বন্ধের মধ্যে প্রভেদ কি? তাহা হইলে অগত্যাই তাহার এই রূপ প্রত্যুত্তর দিতে হয় যে, জড়-গুণ ও চেতন-গুণ—ইহারদের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা ভিন্নাধার-মূলক; এবং জ্ঞান-গুণ ও ইচ্ছা-গুণ—ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা একাধার-মূলক; অতএব গুণ-মাত্রেরই যে উপযুক্ত আধার থাকা আবশ্যক, ইহা কোন প্রকারেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিষয় হইতে বিষয়ীতে অথবা বিষয়ী হইতে বিষয়ে, উত্তীর্ণ হইতে হইলে, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী বুদ্ধি-রূপ সোপান আশ্রয় করিয়া চলিতে হয়। এবং জগৎ হইতে ঈশ্বরেতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে, প্রজ্ঞার শরণাপন্ন হইতে হয়। এইরূপ, বুদ্ধি-মার্গ দিয়া বিষয় হইতে ক্রমে ক্রমে যে বিষয়ীর দিকে অগ্রসর হইতে হয়, এবং প্রজ্ঞা-মার্গ দিয়া জগৎ হইতে ক্রমে ক্রমে যে পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হইতে হয়,

এই যে একটি ক্রমান্বয়ের নিয়ম,—ইহা আমাদের প্রাচীন উপনিষদ্‌গ্রন্থে অতীব সুন্দর রূপে আখ্যাত হইয়াছে, যথা ;—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ আত্মনঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ইহার অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ, আত্মা হইতে (ঈশ্বরের শক্তি—যথা প্রজ্ঞা-শক্তি—যাহা আত্মার অভ্যন্তরে এবং সমুদায় জগতের অভ্যন্তরে অব্যক্ত-ভাবে কার্য্য করিতেছে। সেই অব্যক্ত শক্তি শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত ঐশী-শক্তি হইতে পুরুষ (অর্থাৎ পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বর) শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনিই পরাকাষ্ঠা, তিনিই পরা গতি। বর্ত্তমান গ্রন্থের মর্ম্মানুসারে উল্লিখিত শ্লোকের এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে, যথা ;—ইন্দ্রিয়বোধ আমাদের জ্ঞানে পরিপাক পাইলে পর, তবে

বিষয়ের উপলব্ধি হয়, এই জন্য ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ ; মনোযোগ-ক্রিয়া বুদ্ধির প্রথমাবস্থা, এবং বুদ্ধি বিষয়-অপেক্ষা আত্মার নিকটবর্ত্তী, এই জন্য বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা যে শ্রেষ্ঠ—ইহা অতি স্পষ্ট, কেননা বুদ্ধি আত্মার বৃত্তি-বিশেষ ; আত্মা অপেক্ষা প্রজ্ঞা-রূপ ঐশী-শক্তি শ্রেষ্ঠ, কেননা প্রজ্ঞা আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যবর্ত্তী ; প্রজ্ঞা অপেক্ষা পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ, তিনিই পরা-কাষ্ঠা, তিনিই পরা গতি। এখানে এই যে একটি ক্রমান্বয়-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইল, ইহার প্রতিকৃতি সমুদায় জগতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; কোন ঘটনা নাই, কোন কার্য্য নাই, যাহার মধ্য হইতে কোন না কোন প্রকার ক্রমান্বয়ের পদ্ধতি অন্বেষণ করিয়া পাওয়া না যায়।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। কেবল বুদ্ধির পরিচালনা করা তত্ত্ববিদ্যার উদ্দেশ্য নহে ; মুক্তি-সাধনই তত্ত্ববিদ্যার এক মাত্র লক্ষ্য। এই হেতু যে-সকল জ্ঞান এই মুক্তি-সাধনের সহায়তা

করিতে পারে, বর্ত্তমান জ্ঞান-কাণ্ডে কেবল তাহাদিগকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। "কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই"। যাঁহারা বলেন যে, তর্ক বিতর্ক অভ্যাস ও বাগ্বল উপার্জ্জন করাই তত্ত্ববিদ্যার এক মাত্র ফল, তাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই ওরূপ কথা উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে। প্রথমে যখন গণিত শাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন তাহা কি পর্য্যন্ত না অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়? "সংকলন ব্যবকলন" "গুণন হরণ" এ সকল কার্য্য কি পর্য্যন্ত না পণ্ড-শ্রম মনে হয় ? কিন্তু সেই গণিত-বিদ্যা অবলম্বন করিয়া যখন গৃহ-নির্ম্মাণ, ভূমি-পরিমাপন, ও আর আর নানাবিধ আবশ্যক কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করা যায়, এবং ভৌতিক বিদ্যা সম্বন্ধীয় নানাবিধ আশ্চর্য্য তথ্য-সকলকে পরীক্ষার অধীনে আনয়ন করা যায়; তখন আর তাহার মহিমা কাহারও নিকটে গোপন থাকিতে পারে না। কিন্তু গণিত-বিদ্যার এই যে মাহাত্ম্য, ইহা দুই বা

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে লোক-সমাজে এতা-ধিক পরিমাণে কি বিদিত ছিল ? না। কেন বিদিত ছিল না ? যেহেতু তখন গণিত-বিদ্যা-কে কার্য্যে এত দূর প্রয়োগ করা হয় নাই। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গণিত-বিদ্যার যে রূপ অবস্থা ছিল, তত্ত্ববিদ্যার এখনও সে অবস্থা যায় নাই। তত্ত্ববিদ্যা-ঘটিত অনেক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার-দিগকে রীতি-মত কার্য্যে প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি এখনও উত্তমরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। এতাবৎ-কাল তত্ত্ব-গ্রন্থ-সকলের প্রায়ই এই রূপ পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে যে, জ্ঞান-কাণ্ড কেবল অতিরিক্ত তর্ক বিতর্কেই ক্ষেপিত হয়, এবং কর্ম্ম-কাণ্ডকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আর এক স্বতন্ত্র পত্তন-ভূমিতে সংস্থাপিত করা হয়। আধুনিক জন সমাজে তত্ত্ববিদ্যার নামে যে একটি অপবাদ আছে যে, উহাতে তর্ক বিতর্ক অভ্যাস ব্যতিরেকে আর কোন ফলই দর্শে না, ইহার কারণ এক্ষণে স্পষ্ট-রূপে বুঝা যাইতেছে। সে কারণ এই ;—

এত দিন পর্য্যন্ত তত্ত্ববিদ্যা কেবল এই রূপে আলোচিত হইয়া আসিতেছে যে, কার্য্যের সহিত তাহার যে, কোন সম্পর্ক আছে, ইহা সুস্পষ্ট বোধ হয় না। উদাহরণ; কুজান, হামিল্‌টন, এবং অন্যান্য যে সকল তত্ত্ববিৎ ইউরোপ-দেশে অধুনা সর্ব্বাগ্রগণ্যরূপে বিখ্যাত, সকলেই জর্ম্মন্-দেশীয় মহাত্মা কাণ্টকে ভক্তি-ভাজন গুরু-রূপে মান্য করিয়াছেন। এই বিখ্যাত মহাত্মা তত্ত্ববিদ্যা-সম্বন্ধে যে এক প্রকৃষ্ট প্রণালী সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ও যে সকল নিগূঢ় সত্যের আভাস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া তত্ত্ব-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে কেহই সমর্থ নহেন। তাঁহার সময়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব ক্রমশঃ লোপ পাইয়া জড়-নিষ্ঠতার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এই রূপ আসুরিক ভাবের প্রতিবিধান-মানসে তিনি তাহার বিপরীত ভাবের এক খানি মূল-গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি প্রথমে যে এক

খানি অনুপম গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার তিনি নাম দিয়াছিলেন "বিশুদ্ধ জ্ঞানের দোষ-গুণ-বিচার"। ইহাতে তিনি এই সত্যটি বিশেষ-রূপে স্থাপন করেন যে, বহির্ব্বস্তু হইতে আমরা জ্ঞানের উপকরণ বা সামগ্রী-সকল প্রাপ্ত হই; কিন্তু যে প্রণালী অনুসারে উক্ত উপকরণ-সকলকে জ্ঞান আপনার আয়ত্তা-ধীন করিয়া গড়িয়া লয়, জ্ঞানের সেই যে গঠন-প্রণালী, তাহা আমরা বহির্ব্বস্তু হইতে পাই না,—প্রত্যুত আপনারদের অন্তর হই-তেই যোগাইয়া থাকি। যথা,—রূপ রস প্র-ভৃতি উপকরণ-সকলকে আমরা বাহির হইতে প্রাপ্ত হই; কিন্তু দেশ-কাল, একত্ব-অনে-কত্ব, বস্তু-গুণ, কার্য্য-কারণ, ইত্যাদি যে-সকল প্রণালী অনুসারে আমরা উহাদিগকে জ্ঞানে আয়ত্ত করি, এই প্রণালীগুলি আমরা আপন অন্তর হইতে প্রাপ্ত হইয়া রূপরসাদি উক্ত উপকরণ-সকলের উপর তাহারদিগকে আ-রোপিত করি। এই রূপ মহাত্মা কান্ট—একাকী ও অসহায়—কেবল আপনার মাত্র

অনুসন্ধানদ্বারা ইহা যৎপরোনাস্তি অবিতথ-রূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন যে, সকল সত্যই আমরা কেবল বাহির হইতে প্রাপ্ত হই না,—এক প্রকার সত্য আমরা বাহির হইতে প্রাপ্ত হই, আর এক প্রকার সত্য আমরা অন্তর হইতে প্রাপ্ত হই ; এবং এই দুই প্রকার সত্যের মধ্যে তিনি যথোচিত প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে ক্রুটি করেন নাই। সে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানের প্রণালী সকল যাহা আমরা অন্তর হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক ; এবং জ্ঞানের উপকরণ-সকল যাহা আমরা বাহির হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা আনুষঙ্গিক ও বিশেষ বি-শেষ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানের প্রণালী-সকল জ্ঞান হইতে তিলার্দ্ধও অন্তর থাকিতে পারে না ; সুতরাং আমরা যে কোন বিষয়কে জানি, ঐ সকল প্রণালী অনুসারেই তাহাকে জানিতে হয়। ঐ প্রণালী-সকল জ্ঞানের সহিত অবশ্যই বর্ত্তমান থাকে বলিয়া উহারা অবশ্যম্ভাবী ; এবং যাবতীয় জ্ঞানের

সঙ্গে—জ্ঞান মাত্রেরই সঙ্গে—বর্ত্তমান থাকে বলিয়া উহারা সার্ব্ব-ভৌমিক শব্দে আখ্যাত হইয়াছে। অতঃপর কাণ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানের উক্তরূপ প্রণালী-সকলের দোষ গুণ বিচার করিতে গিয়া অতলস্পর্শ সংশয়-সাগরে নিপতিত হইলেন। সংশয় তাঁহার এই,— আমারদের জ্ঞান-প্রণালী অনুসারেই যখন সত্য-বিশেষ প্রকাশ পায়, তখন সে সত্য যে উক্ত প্রণালীদ্বারা বিকৃত ও রূপান্তরিত না হইবে, তাহার প্রমাণ কি? অতএব আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে. আমারই জ্ঞানের প্রণালী অনুসারে এটি সত্য; কিন্তু তাহা যে বাস্তবিক সত্য কি না, এ বিষয়ে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। এই রূপ মহাত্মা কাণ্ট বাস্তবিক সত্যে সংশয়াপন্ন হইয়া আপন প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন, ও কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় তর্ক বিতর্কে জড়িত হইয়া পথিমধ্যে পড়িয়া রহিলেন; এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা ঐ সকল তর্ক-বিতর্কেরই বাহুল্য-রূপ আন্দোলনে তাঁহারদের বিদ্যা

বুদ্ধি সমুদায় সমর্পণ করিলেন। এইরূপ করা-
তেই শাক্তদিগের কর্তৃক তত্ত্ব-বিদ্যার নামে যে
এক মিথ্যা অপবাদ ইউরোপ প্রদেশে বদ্ধমূল
হইয়াছিল, তাহা হ্রাস না হইয়া ক্রমশই বৃদ্ধি
পাইতে লাগিল। কিন্তু বাস্তবিক-সত্য
সম্বন্ধে কান্টের এতাধিক সংশয়-জনক তর্ক
বিতর্ক কেন? যদি মূলে বাস্তবিক সত্য
কিছুই না থাকে, তবে জ্ঞানের প্রকরণ
প্রণালী বা কি? জ্ঞানের উপকরণ-সামগ্রীই
বা কি? "বাস্তবিক সত্য অবশ্যই আছে"
ইহা যদি তিনি প্রথমে স্বীকার না করেন,
তবে তিনি জ্ঞানকেই বা কিরূপে সত্য বলি-
বেন? জ্ঞানের প্রণালী-সকলকেই বা কিরূপে
সত্য বলিবেন? জ্ঞানের উপকরণ-সকলকেই
বা কিরূপে সত্য বলিবেন? এবং একমাত্র
অগাধ সংশয়ের স্বপক্ষে, এবং আর তাবতে-
রই বিপক্ষে, তিনি স্বয়ং যে সকল সিদ্ধান্ত
করিতেছেন, তাহাই বা তিনি কি রূপে সত্য
বলিয়া স্বীকার করিবেন? এইরূপ দেখা
যাইতেছে যে, কোন প্রণালী ব্যতিরেকেও

ইহা তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিতে হই-য়াছে যে, বাস্তবিক সত্য অবশ্যই আছে। অতএব তিনি যে বলেন যে, আমরা কেবল আমারদের নিজের জ্ঞান-প্রণালী অনুসারেই সত্য জানিয়া থাকি, একথা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। দেশ-কাল, একত্ব-অনেকত্ব, বস্তু-গুণ, কার্য্য-কারণ,—সত্য জানিবার এই যে সকল প্রণালী—ইহারা কি আমাদের নিজের মনঃকল্পিত প্রণালী? কথনই না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহা যথোচিত-রূপে স্থাপিত হইয়াছে যে, সকল হইতে বাস্তবিক সত্য যিনি পরমাত্মা—উক্ত প্রণালী-সকল তাঁহারই প্রতি-ষ্ঠিত। উহারা যদি আমারদের মনঃকল্পিত হইত, তাহা হইলে আমার জ্ঞান-প্রণালী এক রূপ হইত, অন্যের জ্ঞান-প্রণালী আর এক রূপ হইত; কিন্তু সকল আত্মা-সম্বন্ধে যখন উহারা অবশ্যই একই প্রকার হইতে চায়, তখন উহারা যে আমারদের নিজের নিজের প্রণালী নহে, প্রত্যুত পরাৎপর সত্য স্বরূপের প্রতিষ্ঠিত অনতিক্রমণীয় প্রণালী

—ইহা বলা বাহুল্য। অতএব "সত্যের সত্য পরমাত্মাই মূল-প্রণালী-সকলের প্রবর্ত্তক ও সমুদায় জগৎ তাঁহারই নিয়মের অধীন" ইহাতে অগ্রে বিশ্বাস না করিলে, জ্ঞানের উক্ত প্রণালী-সকলের বাস্তবিকতা ও বলবত্তা কোন মতেই আমারদের বিশ্বাস-গম্য হইতে পারে না। অতএব আমরা আপনারা নহি পরন্তু সেই পরমাত্মাই উক্ত বিশ্বাসের মূল ও সর্ব্বস্ব; এবং এই পরমাত্ম-জ্যোতির নিকটে কোন সংশয়ই স্থান পাইতে পারে না। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হইয়া দেখান যাইতেছে যে, তত্ত্ববিদ্যা এরূপ কোন অলীক সামগ্রী নহে যে, তর্ক-বিতর্কেরই সময় তাহার রসনাতে স্ফূর্ত্তি হয়, পরন্তু কার্য্যের সময় উহা হইতে কোন উপকারই পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য মুক্তি-সাধন; অনর্থক তর্ক বিতর্কের আবর্ত্তে নিয়ত কাল পরিভ্রমণ করা উদ্দেশ্য নহে। এই জন্য, দেশ-কাল, বিষয়-বিষয়ী, ঈশ্বর-জগৎ, এই

সকল সত্য আমারদের সহজজ্ঞানে যেরূপ উপ লব্ধি হয়, তাহা বিনা সংশয়ে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করা হইয়াছে। গণিত-বিদ্যার গ্রন্থ-কর্ত্তারা গণিতের বীজ-সত্য-সকল লইয়া যে কারণে বৃথা তর্ক বিতর্ক উত্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ, সেই কারণেই আমরা তত্ত্ববিদ্যার বীজ-সত্য সকল লইয়া বৃথা বাক্য ব্যয় করিতে সর্ব্বদাই সাবধান হইয়াছি। কান্ট কেবল জ্ঞানের স্বতঃ-সিদ্ধ প্রণালীগুলি আবিষ্কার করিতে সবিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক সত্তার সহিত যে তাহাদের পদে পদে যোগ আছে— তাহারা যে কেবল শূন্য প্রণালী মাত্র নহে— ইহার মীমাংসা-স্থলে তিনি বিষম সংশয়-চক্রে পড়িয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে ঐ অভাবটির পূরণ উদ্দেশে ইহা স্পষ্ট রূপে দেখান হইয়াছে যে, ব্যাপ্তি, লক্ষণ, ও শক্তি ঘটিত প্রণালী-সকল পূর্ণ-রূপে পরমাত্মা ও জগতের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে; সুতরাং বাস্তবিক সত্তাই উহাদের মূল। আমরা সাধ্য মতে ইহাই প্রদর্শন

করিতে নিয়ত যত্ন পাইয়াছি যে, প্রথমতঃ পরমাত্মা জীবাত্মা ও বহির্ব্বিষয়, তিনেরই বাস্তবিক সত্তা আমারদের আত্ম-প্রত্যয়ে স্বতঃ-সিদ্ধ রূপে প্রকাশিত আছে। দ্বিতীয়তঃ বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ কি রূপ ও পরমাত্মার সহিত জগতের সম্বন্ধ কি রূপ, ইহা তত্ত্ববিদ্যা আলোচনা দ্বারা যথোচিত-রূপে জানা যাইতে পারে। বাস্তবিক-সত্তা-বিষয়ক এই যে প্রত্যয় এবং উহারদের সম্বন্ধ-বিষয়ক এই যে জ্ঞান,—ইহা যে মুক্তি-সাধনের পক্ষে কি রূপ উপযোগী, তাহাই এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

লোকেরা যখন সুখাশ্বাসে আমোদ-কোলাহলের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাহাতে তাহাদের মস্তক ভ্রাম্যমাণ হইলেও তাহারা মনে করে যে, এক্ষণকার এই অবস্থাই স্থায়ী অবস্থা; কিন্তু তাহা হইতে দূরে থাকিয়া যাঁহারা দিব্য-ধামের শান্তি উপভোগ করিতে-ছেন, তাঁহারাই দেখিতে পান যে, সে অবস্থা বিভ্রান্তি-কোলাহলের সমুদ্র-বিশেষ। কল্য

এক রূপ, অদ্য এক রূপ, পর দিন আর এক রূপ, সুখ দুঃখ, হর্ষ শোক, কতই পরিবর্ত্তন; ইহার মধ্যে লোকেরা প্রাণ-পণে অর্থ সঞ্চয় করিতেছে, গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে, খ্যাতি বিস্তার করিতেছে; কেন? না তাহাতে স্থায়ী সুখ লাভ হইবে। বিষয়-সকল পরাধীন, আমরা স্বাধীন,—বিষয়-সকল যে আমারদের উপর প্রভুত্ব করিবে ইহা আমারদের কখনই সহ্য হইতে পারে না; প্রত্যুত বিষয়ের উপর আমরা প্রভুত্ব করিব, ইহাই আমাদের মনোগত অভিপ্রায়;—যাঁহারা স্থায়ী সুখ উপার্জ্জনে ব্রতী হইয়াছেন, এই অভিপ্রায়টি চরিতার্থ করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তথাপি আমরা পথি-মধ্যে মোহাচ্ছন্ন হইয়া বিলাপ করি যে, "আমি নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত, নানা বিষয়াভাবে পরিতপ্ত, নানা বিষয়ের অধীন; কাল-স্রোত চলিতেছে, আমিও তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইতেছি, ইহা ব্যতীত আমা-কর্ত্তৃক আর কি হইতে পারে?" এই সময়ে তত্ত্ববিদ্যা আসিয়া ভৎর্সনা করিয়া

কহেন যে, “বিষয়ের সম্বন্ধে তুমি এক, তোমার কোন অভাব নাই, তুমি স্বাধীন”। যাঁহারা বলেন যে, বাহিরে এই যে সকল পদার্থ আছে, ইহাই আমরা জানি, আত্মাকে আমরা জানি না; পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাঁহারদের ভ্রম-দূরীকরণ জন্য একটি অতি সুনিপুণ উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা;—“কোন স্থানে দশ জন পুরুষ একত্র হইয়া এক নদীর পর-পারে গমন পূর্ব্বক আপনারদিগের সংখ্যা নির্ণয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য যিনিই গণনা করেন, তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতর নয় জনকে দেখেন, এবং নয় জনকে দেখিলেও নয় সংখ্যাতে বিভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া স্বয়ং যে দশম, ইহা জানিতে পারেন না। তখন তাঁহারা ভ্রান্তি-বশতঃ বলিলেন যে, দশম পুরুষ দেখিতেছি না, অতএব তিনি নাই। পশ্চাৎ নদীজলে দশম পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া শোক ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই কালে কোন অভ্রান্ত পুরুষ আসিয়া

বলিলেন যে, তোমারদিগের দশম পুরুষ মরে নাই—আছে। পরে গণনা করিয়া তুমিই দশম পুরুষ, এই রূপ উপদিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ-রূপে দশম পুরুষকে দেখিয়া রোদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারা হর্ষযুক্ত হইলেন।" এই রূপ, আমরা আপন আত্মাকে প্রতি-ক্ষণেই জানিতেছি;—যে কোন বিষয় জানিতেছি, তাহারই সঙ্গে আত্মাকে সেই বিষয়ের জ্ঞাতা রূপে জানিতেছি;—অথচ গণনা কালে শরীরাদি বিষয় পর্য্যন্ত গণনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকি, আত্মাকে আর গণনা করি না। পরে তত্ত্ববিদ্যা আসিয়া আমারদিগকে বলেন যে, "তুমি এ বিষয় জানিতেছ, ও বিষয় জানিতেছ; কিন্তু তুমিই যে উক্ত বিষয়-সকলের জ্ঞাতা—ইহা কি তুমি জানিতেছ না? তুমি কি কেবল পরকেই জানিতেছ, কিন্তু আপনাকে কি তুমি কিছুমাত্র জান না? তুমি যদি আপনাকেই না জান, তবে তুমি পরকে কি রূপে জানিবে?" তত্ত্ববিদ্যার মুখে এই রূপ কথা-সকল শুনিয়া তবে যখন আমা-

রদের চেতন হয়, পরে দেখি যে হারা-
সামগ্রী আমারদের এই আত্মাকে পাইয়াও
আমারদের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইতেছে না। পুন-
র্ব্বার আমরা মোহে মুগ্ধ হইয়া বিলাপ করি
যে, আমারদের আত্মা সে দিনকার বই নয়—
ইহা কত দিনই বা থাকিবে! কোথা হইতে
আসিয়াছে, কোথায় বা গমন করিবে! ইহার
মধ্যে এমন কি আছে যে, ইহা এত বহু-
মূল্য? এই পৃথিবীতে কিছু দিন যেন বিষ-
য়ের উপর ইহার প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইল.
কিন্তু পরে সে প্রভুত্ব কোথায় যাইবে?
তত্ত্ব-বিদ্যা পুনর্ব্বার স্বর্গ হইতে আগমন
করেন এবং এই রূপ উপদেশ দেন;—
"তুমি এক্ষণে ভব-নদীর মধ্য-স্থানে আসিয়া
সংশয়-তরঙ্গের আন্দোলনে অতিশয় অধীর
হইয়াছ; যদি তুমি ফিরিয়া যাও, তবে
তোমার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে—ইহা
তুমি জানিতেছ; তথাপি অগ্রসর হইতে
তুমি ভীত হইতেছ; যে হেতু কোথায় যে
কূল, তাহা তোমার নয়ন-গোচর হইতেছে

না ; এই ভয়ানক মধ্য গঙ্গাতে থাকিয়া তুমি কি বিনাশ পাইবে ? অতএব প্রাণ-পণে অগ্রসর হও, শান্তির কূল অবশ্যই তোমার নয়নে দেখা দিবে। তুমি তোমার অপূর্ণ আত্মাকে জানিয়াছ, এক্ষণে পূর্ণ-স্বরূপ পরমাত্মা যিনি তোমার সেই আত্মার পরা-কাষ্ঠা—যিনি সংসার-সাগরের পর-পার—তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই পরম শান্তির অন্বেষণ পাইবে। তুমি কেবল আপনাকেই "আমি" বলিতেছ, কিন্তু ইহা দেখিতেছ না যে, প্রত্যেক ব্যক্তিতেই ঐরূপ এক একটি "আমি' বিদ্যমান রহিয়াছে—এমন কি তোমার মত কোটি কোটি আত্মা হইবার কিছু মাত্র বাধা নাই। তোমার সম্বন্ধেই তুমি বলিতে পার যে, "আমি এক", কিন্তু সত্যের সম্বন্ধে তোমার সদৃশ অনেক "আমি" সংসারে বিচরণ করিতেছে ; পরন্তু সকল আত্মার যিনি অন্তরাত্মা, আত্মা হইতেও যিনি আত্মা, "আমি" হইতেও যিনি "আমি", যিনি তাবতের অভ্যন্তর-স্থিত মূল

সত্য ; তিনিই কেবল সকলেরই সম্বন্ধে সর্ব্ব-
তোভাবে একমাত্র, তাঁহার সদৃশ একেবারেই
অসম্ভব। তুমি এক, পরমাত্মা একমেবাদ্বি-
তীয়ং ; তুমি ভাবাত্মক, পরমাত্মা পূর্ণ ; তুমি
স্বাধীন, পরমাত্মা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন—
কি না মুক্ত ; তোমাতে যে কোন সদাত্মক
লক্ষণ পাওয়া যায়, পরামাত্মাতে তাহাই
পরাকাষ্ঠা রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তো-
মার মনের সদ্ভাব তুমি যদি আর এক
জনেতে দেখিতে পাও, তবে তুমি তাহার
সহিত বন্ধুতা করিতে ব্যগ্র হও ; কিন্তু পর-
মাত্মাতে তোমার মনের সকল সদ্ভাব পরা-
কাষ্ঠা-রূপে অবস্থিতি করিতেছে—কি জন্য
তুমি তাঁহার বিরোধী হও ? তিনি সর্ব্বতো-
ভাবে স্বাধীন, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তবে
পাপ-তাপ দুঃখ শোক হইতে মুক্তি পাইয়া
পরম আনন্দে অভিষিক্ত হইবে—ইহার আর
অন্যথা নাই”। তত্ত্ববিদ্যার এই উপদেশানু-
সারে আমরা যখন অনাদি অনন্ত, সর্ব্বতো-
ভাবে স্বাধীন, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, মঙ্গলময় এক-

মাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ পুরুষের শরণাপন্ন হই; তখন আমরা নিশ্চয় জানিতে পাই যে, ঈশ্বর যিনি—তিনি আমারদের অনন্ত কালের ঈশ্বর; যখন আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তখন তিনি আমাদিগকে কোন কালেই পরিত্যাগ করিবেন না। যদি এরূপ কুমন্ত্রণা-বাক্য কখনও আমারদের কর্ণগোচর হয় যে, তোমার যিনি হৃদয়-বন্ধু, তিনি তোমাকে গোপনে বিনাশ করিতে সংকল্প করিয়াছেন; তবে সেই প্রাণ-স্বরূপের অকৃত্রিম প্রেম-মুখের প্রতি এক বার নিরীক্ষণ করিয়া আমরা হাস্য-মুখে ব্যক্ত করিতে পারি যে, "ইঁহার হস্তে যদি আমারদের মৃত্যু হয়, তবে মৃত্যুই আমারদের জীবন।"

বর্ত্তমান খণ্ডের নানা অধ্যায়ে নানা প্রকার সত্য বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু সে সমুদায়ের সার মর্ম্ম এক্ষণে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত হইতে পারে। সার মর্ম্ম এই;—আমরা বিষয়ের সম্বন্ধে এক, ভাবাত্মক, ও স্বাধীন; এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে দ্বৈত-সাপেক্ষ অপূর্ণ ও

পরাধীন। পুনশ্চ "আমরা বিষয়ের অধীন" এই মিথ্যা-জ্ঞান হইতে আমরা যে পরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করি, সেই পরিমাণে আমরা এই অবিতথ সত্য-জ্ঞানটি উপার্জ্জন করি যে, আমরা ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ অধীন ;—বিষয়-শৃঙ্খল হইতে যত আমরা মুক্ত হই, ঈশ্বরের সহিত তত আমরা যুক্ত হই। পুনশ্চ জ্ঞান-ময় প্রেমময় ঈশ্বরের অধীন-রূপে যত আমরা আপনারদিগকে উপলব্ধি করি, ততই আমরা অচেতন জড়-বিষয়-সকলের সম্বন্ধে আপনাদিগের স্বাধীনতা হৃদয়ঙ্গম করি ;—আমরা যত ঈশ্বরের অধীন হই, বিষয়-সকল ততই আমারদের অধীন হয়।

বিষয় হইতে আত্মার পৃথক্ সত্তা সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় এই যে, শরীর মন যাহা কতক অংশে আমারদের আপনাদের কর্ত্তৃক নিয়মিত, তাহাদিগকে ঈশ্বরের নিয়মিত প্রাকৃতিক কার্য্য-কারণে সমর্পণ করা হয়; এবং অল্প পরিমাণে নিয়ন্তা যে আমারদের আত্মা, তাহাকে সর্ব্ব-

নিয়ন্তা ঈশ্বরেতে সমর্পণ করা হয় ;—তাহা হইলেই নিয়মিত-স্বভাব বিষয়-সকল হইতে নিয়ন্তৃ-স্বভাব আত্মার পৃথক্ত্ব স্পষ্ট-রূপে অনুভূত হইতে পারিবে। এখানে বিশেষ-রূপে জানা আবশ্যক যে, প্রথমতঃ ;—যিনি একমেবাদ্বিতীয়ং অর্থাৎ সমুদায়েরই সম্বন্ধে একমাত্র, যিনি পূর্ণ অর্থাৎ শূন্যের অবিকল বিপরীত, যিনি একেবারেই মুক্ত অর্থাৎ অন্য কাহারও নিয়মের বশবর্ত্তী নহেন, তিনিই পরমাত্মা। দ্বিতীয়তঃ,—জ্ঞাত বিষয়েতে নহে, কিন্তু জ্ঞাতা বিষয়ীতেই, জ্ঞান অবস্থিতি করে ; অজ্ঞান দেহাদিতে নহে, কিন্তু জ্ঞানবান্ আত্মাতেই, জ্ঞান অবস্থিতি করে ; দেহাদি বিষয়—জ্ঞান-শূন্য, আত্মা—জ্ঞান-পূর্ণ ; এই রূপ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, দেহাদি বিষয় অপেক্ষা আত্মা পূর্ণতার পথে অধিক অগ্রবর্ত্তী—ঈশ্বরের অধিক সমীপবর্ত্তী। তৃতীয়তঃ,—এক যাহা, তাহাই আত্মা ; অনেক যাহা, তাহা আত্মা নহে। জ্ঞান—যাহার, তাহাই আত্মা ; যাহার জ্ঞান নাই—যাহা

অজ্ঞান জড়পিণ্ড বই নহে, তাহা আত্মা নহে। যে আপনাকে আপনি জানে সেই আত্মা, যাহার আত্মজ্ঞান নাই তাহা আত্মা নহে। এই রূপে যখন আমরা, বিষয়ের প্রতিকূলে ও পূর্ণ সত্য-স্বরূপ পরমাত্মার অনুকূলে, আপন আত্মাকে এক, ভাবাত্মক, ও স্বাধীন বলিয়া উপলব্ধি করি ; তখনই আমরা প্রকৃত সত্যের পথে উপনীত হই।

আমরা যে পূর্ব্বে কহিয়াছি যে,—জ্ঞানের সহিত ঐক্যানৈক্য-তত্ত্বের সবিশেষ সম্বন্ধ, ভাবের সহিত বস্তু-গুণ-তত্ত্বের সবিশেষ সম্বন্ধ, এবং ইচ্ছার সহিত কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের সবিশেষ সম্বন্ধ,—এক্ষণে জীবাত্মা-সম্বন্ধে তাহার সার্থকতা প্রদর্শন করা যাইতেছে। প্রথমতঃ ;—কেবল জ্ঞান-মাত্রের সম্বন্ধে আত্মাকে দেখিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মা উদাসীন-বৎ নির্লিপ্ত থাকিয়া, বিচিত্র বিষয়-ক্ষেত্র দর্শন করিতেছে। আমরা যদি আত্মার এই ক্ষেত্রজ্ঞ-ভাব টুকু উপলব্ধি করিয়াই ক্ষান্ত থাকি, তাহা হইলে সাংখ্য-দর্শন জীবাত্মাকে

যেরূপ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে (যথা, আত্মা উদাসীন দর্শক-মাত্র, আত্মা নির্গুণ, আত্মা অকর্ত্তা) আমাদিগকে সেই মতেরই সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হইতে হয়। সাংখ্যের ঐ মতটি যে নিতান্তই অলীক, ইহা কখনই কেহ বলিতে পারিবেন না; কেন না আত্মার কেবল চেতনা-ভাবটির প্রতি লক্ষ্য করিলে, আত্মার কেবলত্ব এবং নির্গুণত্ব যথার্থই অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু সাংখ্য দর্শনের ন্যায় আমরা এরূপ বলি না যে, চেতনা-লক্ষণ ব্যতিরেকে আত্মার আর কোন লক্ষণ নাই। আমরা বলি যে, আত্মা আপনাকে এক বলিয়া জানিতেছে—সত্য, কিন্তু এরূপ কদাপি নহে যে, আত্মা আপনাকে উদাসীন-ভাবে জানিতেছে; প্রত্যুত ইহাই সত্য যে, আত্মা আপনাকে প্রীতি ও সদ্ভাবের সহিত জানিতেছে। আত্মা যে, কেবল আপনাকে দর্শন-মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত আছে, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে আত্মা আপনাকে ভাল বাসিতেছে, আপনার যে কিছু সদ্‌গুণ তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে। আত্মা

আপনাকে আপনি যেরূপ প্রীতি-কটাক্ষে নিরীক্ষণ করে, তাহা সহস্র সদুপদেশ অপেক্ষা গুরুতর। আত্মা যখন আপনার সেই প্রেম-দৃষ্টির গুণে সমুদায় মনোবৃত্তিকে আপন সন্নিধানে আকর্ষণ করে, সেই আকর্ষণ-প্রভাবে যখন সেই সমস্ত মনোবৃত্তি জড় এবং অজ্ঞানের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মা এবং চেতনার অধীনতায় প্রবেশ করে, তখন আবার আত্মা হইতে তৃতীয় প্রকার আর এক ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে; সে ভাব কি? না স্বাধীনতা এবং বিষয়ের উপরে কর্ত্তৃত্ব। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্য-দর্শন যেখানে আত্মার দ্রষ্টৃত্ব-রূপ কেবল একটি মাত্র লক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন, আমরা সেখানে—দ্রষ্টৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, এবং কর্ত্তৃত্ব—এই ত্রিবিধ লক্ষণ স্বীকার করি। আত্মা আপন চেতনার গুণে আপনাকে দর্শন করত জানিতেছে যে, আমি এক; আপন প্রেমের গুণে আপনার প্রতি সদ্ভাবের সহিত নিরীক্ষণ করত জানিতেছে যে, আমি সদ্ভাব-

সম্পন্ন অথবা ভাবাত্মক; এবং আপন ইচ্ছার প্রভাবে আপনার অধীন হইয়া জানিতেছে যে, আমি স্বাধীন। এইরূপ, দ্রষ্টা ভোক্তা এবং কর্ত্তা, তিনই উপাধি আত্মার সহিত অবিচ্ছেদে সংলগ্ন রহিয়াছে। দ্রষ্টৃত্ব-গুণে আত্মা এক, ভোক্তৃত্ব-গুণে আত্মা ভাবাত্মক, এবং কর্ত্তৃত্ব-গুণে আত্মা স্বাধীন। অতএব এতন্মধ্যস্থিত কেবল একটি-মাত্র কিংবা দুইটি-মাত্র উপাধির প্রতি দৃষ্টি করিলে, ভ্রম হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

কিন্তু কাহার বলে আমারদের আত্মা জ্ঞানেতে ভাবেতে স্বাধীনতাতে ওরূপ সুসম্পন্ন হইয়াছে? যাঁহার বলে সমুদায় জগৎ স্ব স্ব স্বভাব পরিগ্রহ করিয়াছে—তাঁহারি বলে। আমরা অনেকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া একনিষ্ঠ হই, অভাবে ক্লিষ্ট না হইয়া স্পৃহা-শূন্য হই, পরাধীনতায় ম্রিয়মাণ না হইয়া স্বাধীন হই,—ঈশ্বরের এই পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল-ইচ্ছা সকল মনুষ্যেরই আত্মাতে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। "একনিষ্ঠ হইয়া, স্পৃহা-শূন্য হইয়া,

স্বাধীন হইয়া, ঈশ্বরের রাজ্যে বিচরণ কর; যথেচ্ছা মঙ্গল-কার্য্য অনুষ্ঠান কর, এবং ঈশ্বরকে মনের সহিত ধন্যবাদ কর",—এ কথাতে যেমন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সায়দিতে পারি, এত আর কিছুতেই নহে। পুনশ্চ যে কারণে আমাদের স্ব স্ব পরিমিত আত্মাকে যথোচিত প্রীতি করা আবশ্যক হয়, সেই একই কারণে পরমাত্মাকে পরম-প্রীতি করা আবশ্যক হয়; যে কারণে আপন পরিমিত আত্মার যথোচিত অধীন হওয়া আবশ্যক, সেই একই কারণে পরমাত্মার পরম-অধীন হওয়া আবশ্যক; এইরূপে যাহাতে আমরা জীবাত্মা-রূপ চিহ্ন অবলম্বন করিয়া পরমাত্মা-রূপ লক্ষ্যের প্রতি প্রণিধান করিতে পারি, তাহাই এই জ্ঞান-কাণ্ডের উদ্দেশ্য; পশ্চাৎ যে যে পথের মধ্য দিয়া আমরা উত্তরোত্তর তাঁহার সন্নিধানে অগ্রসর হইব, তাহা তৃতীয় খণ্ড কর্ম্ম-কাণ্ডে সাবধানে অন্বেষণ করা যাইবে।

ইতি জ্ঞান-কাণ্ড সমাপ্ত।

ভোগকাণ্ড।

উপক্রমণিকা।

আমরা জ্ঞানেতে যে সকল সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকি, ভাবেতে সেই গুলি উপভোগ করিয়া পরিপাক করিতে পারিলে, তবে আমাদের ইচ্ছাতে কর্ম্ম করিবার বল জন্মে; এই রূপ, জ্ঞানকাণ্ডের পরে ভোগ কাণ্ড আপনা-হইতেই উপস্থিত হইতেছে।

পূর্ব্ব খণ্ডে সংশয় হইতে প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হইবার সেতু সন্নিবেশিত হইয়াছে; এক্ষণে সেই সুরম্য প্রদেশে উপনীত হইয়া তথাকার ফল ভোগ করিবার যে রূপ পদ্ধতি, তাহা-রই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

তত্ত্ব-সকল উপলব্ধি করা জ্ঞানের কার্য্য; ভাবের কার্য্য কি?—না, সেই গুলিকে আদর্শ রূপে বরণ করত তাহাতে অনুরাগ

সমর্পণ করা,—ইহারই নাম উপভোগ। এক্ষণে জ্ঞানের উপলব্ধি-ব্যাপারকে আ-লোচনা-ক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি দিয়া, তাহার স্থলে ভাবের উপভোগ-ব্যাপারকে অভিষেক করা যাইতেছে। পূর্ব্বে জ্ঞানের মূল-তত্ত্ব-সকল লইয়া আন্দোলন করা হইয়াছে, এক্ষণে ভাবের মূল-আদর্শ-সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান বিষয় দুই রূপে অনুশীলিত হইতে পারে ;—এক, ভাবকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র রূপে বিবেচনা করা, অপর, জ্ঞানের সহিত ভাবের পদে পদে যোগ রক্ষা করিয়া চলা। আমরা শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতেই ব্রতী হইলাম। কারণ, যদি আমরা এরূপ জানিতাম যে জ্ঞা-নের সহিত ভাবের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইলে অবশিষ্ট কেবল কুতূহল-নিবৃত্তি-রূপ প্রলোভন কখনই আমাদিগকে সেই কঠোর জ্ঞানালোচনাতে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না ; প্রত্যুত, ইহার পরে ভাব-ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ

হইব, এই ভাবিয়াই আমরা সমুদায় জ্ঞান-পথ মনের সন্তোষে অতিবাহন করিয়াছি।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্ব খণ্ডের প্রথমেই ইন্দ্রিয়-বোধ, বুদ্ধি, এবং প্রজ্ঞার মধ্যে এই রূপ ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-বোধ অনুসরণ করিয়া আমরা বিষয় উপলব্ধি করি, বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া আমরা বিষয়ীকে উপলব্ধি করি, এবং প্রজ্ঞা অনুসরণ করিয়া আমরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করি। অতএব প্রজ্ঞা যে কেবল ইন্দ্রিয়-বোধ হইতেই পৃথক্-স্বভাব এমন নহে, উহা বুদ্ধি হইতেও পৃথক্-স্বভাব তাহার প্রমাণ এই যে মূল-তত্ত্ব-সকল কোন রূপেই আমাদের বুদ্ধিতে আইসে না, কিন্তু প্রজ্ঞাতে সে সকল নিশ্চয় রূপে উপলব্ধি

হইয়া থাকে। প্রজ্ঞার আদি এবং অন্ত সেই মূল সত্য, যাঁহার সুন্দর মঙ্গল-ছটাতে আধ্যাত্মিক ভৌতিক সমুদায় জগৎ বাস্তবিক সত্য হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। বাস্তবিক সত্যের এই যে ভাব, ইহা কি আমাদের বুদ্ধির সিদ্ধান্ত? আমরা কি আপনারা স্বকীয় বুদ্ধি-প্রভাবে সত্য হইয়াছি—না বহির্জ্জগৎকে বুদ্ধি-প্রয়োগ দ্বারা সত্য করিয়াছি? অতএব আর সকলই যদি বুদ্ধি দ্বারা স্থির করা সাধ্য হয়, তথাপি আমি বাস্তবিক কি না, জগৎ বাস্তবিক কি না, ইহা স্থির করিতে গিয়া বুদ্ধির সমুদায় আড়ম্বর নিষ্ফল হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। অতএব মূল সত্যকে যিনি যত টুকু লাভ করেন, তাহা তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে কেবল মাত্র আত্ম-চেষ্টা দ্বারা কথনই না। অপিচ মূল সত্যকে যথনই যিনি বুদ্ধির বশে আনয়ন করিতে গিয়াছেন, তথনই তিনি তাহার এই ফল পাইয়াছেন যে, জাগ্রৎ জীবন্ত বাস্তবিক সত্যের পরিবর্ত্তে কোথাকার এক স্বপ্নবৎ নির্জীব কাল্পনিক সত্য সম্মুখীন

দেখিয়া সত্যের নামে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। কিন্তু সত্য-স্বরূপ যিনি, তিনি দূরে যান নাই, তিনি নিকটেই আছেন; আমরাই আপন বুদ্ধিমত্তায় অন্ধ হইয়া মনে করিতেছি যে আমরা তাঁহা হইতে দূরে আছি, আমাদের উপর তাঁহার চক্ষু নাই—তাঁহার হস্ত নাই। পরমাত্মাকে জানা না জানা মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে, সকল মনুষ্যেরই অগত্যা তাঁহাকে জানিতে হয়, এমন কি তাঁহাকে জানাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব; কিন্তু তাঁহাকে আমরা অতি অল্প পরিমাণেই জানি, সুতরাং তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক করিয়া জানিতে আমাদের স্বভাবতই ইচ্ছা হয়; এই প্রকার ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে হইলে, তন্নিমিত্তে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই নিকট গমন করা আবশ্যক; কেন না ইহা যেমন নিশ্চয় যে, এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নির সংযোগে বিস্তীর্ণ অরণ্যও ক্রমে ক্রমে অগ্নিময় হইয়া যায়, ইহাও সেইরূপ নিশ্চয় যে, আমরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া ঈশ্বরের দর্শন পাইতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে

আমাদের সমুদায় আত্মা ব্রহ্মাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

এক্ষণকার জিজ্ঞাস্য এই যে, মূল-সত্য পরমাত্মা যখন আমাদের প্রজ্ঞাতে দেখা দেন, তখন আমাদের হৃদয়ে কি রূপ ভাবের উদ্রেক হয়? তখন একান্ত নির্ভরের ভাব আসিয়া আমাদের সমুদায় আত্মাকে অভিভূত করে; আমরা অপূর্ণ, এবং পরমাত্মা পূর্ণ, তখন ইহা উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। এ নির্ভরের ভাব কি প্রকার? ভৃত্যেরা যেমন উপজীবিকার্থে প্রভুর আশ্রয়ে নির্ভর করে, সেইরূপ? না অন্য কোন রূপ? যথার্থ যিনি ঈশ্বরের অনুরক্ত ও ভক্ত, তিনিই এ প্রশ্নের সাক্ষাৎ প্রত্যুত্তর; তিনি ইচ্ছার সহিত, অনুরাগের সহিত, ঈশ্বরেতে আত্ম-সমর্পণ করেন, কোন প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ওরূপ করেন না; তিনি ইহা স্পষ্টরূপে জানেন যে, জড় বস্তুর অধীনতাই পরাধীনতা এবং ঈশ্বরের অধীনতাই স্বাধীনতা;—কারণ, ঈশ্বর তাঁহার পর নহেন প্রত্যুত তিনি তাঁহার

আত্মারও আত্মা। পূজ্য ব্যক্তির প্রতি এই রূপ নিষ্কাম অনুরাগকে ভক্তি কহা যায়। প্রজ্ঞার অবিদ্যমানে যেমন সকলই স্বপ্নবৎ অর্থশূন্য ভাবে পরিণত হয়, ভক্তির অভাবে সেই রূপ সকলই শ্রী-হীন রূপে প্রতিভাত হয়। নিজে স্বপ্নবৎ হইলে সকলই স্বপ্নবৎ দেখায়, নিজে শ্রী-হীন হইলে সকলই শ্রী-হীন দেখায়;—সুতরাং আমরা যদি প্রজ্ঞা হইতে পারমার্থিক সত্য এবং ভক্তি হইতে পারমার্থিক শ্রী লইয়া আত্মসাৎ করিতে অবহেলা করি, তাহা হইলে আমরা নিজে অপদার্থ ও শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া সকলকেই যে সেই রূপ দেখিব ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

আমাদের প্রজ্ঞা ও ভক্তি যখন পরমাত্মাতে সংযুক্ত হয়, তখন সেই যে যোগ-ক্রিয়া, তাহা অন্তর্মুখীন প্রশান্ত-ভাবে স্ফূর্তি পাইতে থাকে, হস্ত পদ পরিচালনার ন্যায়, বা বিষয়-চিন্তার ন্যায়, বহির্মুখীন চঞ্চল-ভাবে নহে। পূজার্হ মনুষ্য-বিশেষকে আমরা যোড়-করে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি, কিন্তু আত্মা

মস্তকও নত করে না, করদ্বয়ও সম্মিলিত করে না, অথচ যার পর নাই অকৃত্রিম ভক্তি ভাবে পরমাত্মাকে প্রণাম করিয়া থাকে; আত্মার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমাদের শরীরও নত হয়, হস্তও কৃতাঞ্জলিপুটে আবদ্ধ হয়, নেত্রও সজল হয়, এ সকলই হয় বটে, কিন্তু এ সকল বিনা-আয়াসে আপনা আপনি হয়, আত্মাকে এ সকল লইয়া ব্যস্ত হইতে হয় না; কেন না আত্মা বিনা-নেত্রে পরমাত্মাকে দর্শন করিতেছে, বিনা-শ্রবণে তাঁহার আদেশ শুনিতেছে, বিনা-বাক্যে তাঁহার স্তুতি গান করিতেছে, বিনা-শরীরে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিতেছে; আত্মা কোন সহায় সম্পত্তি ও আড়ম্বর ব্যতিরেকেও পরমাত্মার সহবাসে নিমগ্ন হইয়া, পরম আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া, অনন্ত জীবনের মত কৃতার্থ হইতেছে। পরমাত্মার সেই বিষয়াতীত অপরিমিত সৌন্দর্য্য, যাহা আমারদের সমুদায় আত্মাকে একেবারেই চরিতার্থ করে, তাহার জ্যোতিতে যখন আমরা জগৎ সংসার নিরীক্ষণ করি, তখন

সর্ব্বত্রই তাহার কিছু না কিছু প্রতিরূপ নেত্র-গোচর হওয়াতে আমাদের অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় প্রেমরস আবির্ভূত হয়। পরমাত্মা হইতে প্রাপ্ত তাঁহার প্রসাদ-চিহ্ন-স্বরূপ—আমাদের আত্মাতে আমরা যতটুকু সৌন্দর্য্য ধারণ করি, তাহাই আমাদের নিকট—বাহি-রের যাবতীয় পদার্থের সৌন্দর্য্য-পরিমাপনের আদর্শ-স্বরূপ হয়; এবং এই আদর্শকে আমরা যে পরিমাণে বাহিরে প্রয়োগ করিতে পারি, সেই পরিমাণে আমাদের প্রেম চরিতার্থ হয়। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখন আমরা জগৎকে নিরী-ক্ষণ করি, তখন তাহা ভক্তির দেবালয় তুল্য দিব্য শোভা ধারণ করে; কিন্তু যখন উহা-কে আমরা আমাদের নিজের সম্বন্ধে নিরী-ক্ষণ করি, তখন তাহা প্রেমের ক্রীড়া-কানন রূপে পরিণত হয়; কেন না, জগৎকে যত আমরা আমাদের নিজের মনের মত করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি, ততই আ-মাদের প্রেম চরিতার্থ হয়; কিন্তু সেরূপ করিতে গিয়া আমরা যখন দেখি যে, জগতের

সৌন্দর্য্য কেবল আমাদের নিজের মনোনু-রূপ নহে—পরন্তু আর এক অচিন্ত্য প্রকার; যখন দেখি যে, আমাদের স্বল্প প্রেম তাহার নিকট পরাভব পাইয়া ফিরিয়া আইসে; যখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহার মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সং-ভুক্ত রহিয়াছে, অথচ তাহা ধরিতে গিয়া আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে; তখন, সেই যে এক ভূমা ভাব, তাহাতে আমাদের প্রেম আপাততঃ ক্ষুব্ধ হইলেও আমাদের ভক্তি তাহার দিকে প্রসারিত হইয়া অনুপম আনন্দ উপভোগে কৃতার্থ হইতে পারে।

প্রজ্ঞা হইতে এক পদবী নিম্নে বুদ্ধি, এবং তাহা হইতে আর এক পদবী নিম্নে ইন্দ্রিয়বোধ অবস্থিতি করে। বুদ্ধি কি? না আত্ম-জ্ঞানের মধ্য দিয়া বিষয় সকলকে জানা, সাধারণ জ্ঞান-শক্তিকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানে পরিণত করা, ইহাকেই বুদ্ধি কহে। ইন্দ্রিয়-বোধ কি? না, যে অন্ধশক্তি দ্বারা বিষয়

আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি বা জ্ঞান-শক্তিকে প্রতি-রোধ করে, তাহাই ইন্দ্রিয়বোধ শব্দে আ-খ্যাত হয়। বুদ্ধি জ্ঞানবান্ আত্মা হইতে অজ্ঞান বিষয়ের দিকে, ইন্দ্রিয়-বোধ অজ্ঞান বিষয় হইতে জ্ঞানবান্ আত্মার দিকে, প্রত্য-ভিমুখী হয় ;—ইন্দ্রিয়বোধ এবং বুদ্ধি, শরীর এবং আত্মা, পরস্পরের মধ্যে এই রূপ প্রতি-দ্বন্দিতা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আত্মজ্ঞান অনুসারে অন্যকে জানাতে যেমন বুদ্ধি প্রকাশ পায়, সেই রূপ আত্ম-ভাব অনুসারে অন্যের ভাব উপভোগ করাতে প্রীতি প্রকাশ পায় ; কারণ, বাহিরের সামগ্রী-বিশেষে যতক্ষণ না আমরা আমাদের মনের অনুরূপ কোন একটি আদর্শ আরোপ করিতে পারি, তত ক্ষণ আমরা তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণে বঞ্চিত থাকি। আমরা যখন একটি পুষ্প দর্শনে প্রীতি লাভ করি, তখন, আমা-দের মনোমধ্যে যে এক সামঞ্জস্য ও পারিপাট্য ভাবের আদর্শ আছে, তদনুসারে আমরা সেই পুষ্পের অবয়ব গুলিকে অগ্রে কল্পনা

করি; পরে, সেগুলিকে ঐ সাধারণ আদর্শের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত রূপে অনুভব করিয়া, এই রূপে আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মূর্ত্তিমান্ করিয়া, সৌন্দর্য্য সংভোগে রত হই। বিশেষতঃ মনুষ্যের শরীরে, মনুষ্যের কথা বার্ত্তাতে, মনুষ্যের ভাব ভঙ্গিতে, আমাদের নিজের মনের ঐ প্রকার অনেক গুলি আদর্শ আমরা সহজে ফলাইতে পারি বলিয়া, মনুষ্যকে আমরা যেমন প্রীতি করি, জগতের মধ্যে এমন আর কাহাকেও নহে।

ইন্দ্রিয়বোধ উপলক্ষে পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, দেশে অবস্থান ও কালে পরিবর্ত্তন, অবস্থা ও পরিবর্ত্তন, এই দুয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ স্ফূর্ত্তি পায়। বুদ্ধি কি করে?—না, সেই অবস্থা পরিবর্ত্তনের মধ্যে কতকটা বহির্ব্বিষয়ের শক্তি এবং কতকটা আমাদের আপনাদের শক্তি উপলব্ধি করিয়া আত্মানাত্ম-জ্ঞানের কলিকা উন্মোচিত করে। মনে কর, আমরা একান্ত অনন্যমনা হইয়া কোন একটা গুরুতর বিষয়

ভাবিতেছি, ইতি-মধ্যে সহসা একটা উন্মুক্ত লিপি আমাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে নিপতিত হইল; ইহাতে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল মাত্র, কিন্তু সে ঘটনার প্রতি আমাদের বুদ্ধির একটুকুও মনোযোগ হইল না; সুতরাং সেই লিপি কিংবা তাহার অন্তর্গত লিখন-ছটা, কিংবা অক্ষরাবলির ভেদাভেদ, তখন ইহার কিছুই আমাদের জ্ঞান-গোচর হইল না। ইতিপূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টি হয় ত ধূসর বর্ণ মৃত্তিকার উপরে নিহিত ছিল, এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরাবলি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল;—এই প্রকারে, অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র ইন্দ্রিয়-বোধে প্রথমে সমানীত হয়। পরিশেষে বুদ্ধি আপন অন্তর-স্থিত আদর্শ অনুসারে তাহার অর্থ আবিষ্কার করিয়া তাহাকে জ্ঞানে পরিণত করে,—যেমন, শিক্ষিত আদর্শ অনুসারে আমরা ঐ লিপিটির অক্ষর সকলের, পদ সকলের ও পরিচ্ছেদ সকলের ভেদাভেদ নিরূপণ করিয়া,

তবে আমরা তাহাকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই।

আমাদের দেহাদির যেরূপ অবস্থা যেরূপ পরিবর্ত্তনের দিকে উন্মুখ থাকে, সেইটি সংঘটিত হইলেই ইন্দ্রিয়-সুখ আবির্ভূত হয়;—যেমন, আমাদের প্রজ্বলিত জঠরানল যখন অন্ন ভোজনের দিকে উন্মুখ থাকে, তখন অন্ন ভোজন করিলেই আমরা সুখী হই। যে সুরের পর যে সুর, বা নিস্তব্ধতার পর যে সুর, শ্রবণে ভাল লাগে; যে বর্ণের পর যে বর্ণ, বা অন্ধকারের পর যে বর্ণ, নয়নে ভাল লাগে; যে রসের পর যে রস রসনাতে ভাল লাগে; সেই রূপে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেই ইন্দ্রিয়-সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। ভিতরে যে আমাদের প্রাণক্রিয়া সকল চলিতেছে, তাহাও, যার পর যেটি সেই ভাবে চলিলে, তবেই আমরা শারীরিক ভাল থাকি, তাহার ব্যাঘাত হইলেই রোগে আক্রান্ত হই। এই প্রকারে আমরা যখন ইন্দ্রিয় সুখে সুখী হই, তখন তাহা আমাদের আপ-

নার নিয়মে হই না, ভৌতিক নিয়মেই হইয়া থাকি ;—বাহিরে কোথায় কি পরিবর্ত্তন হইতেছে, তদ্দ্বারা আমরা সুখে দুঃখে নিয়মিত হই। যতক্ষণ না আমাদের অন্তরে প্রকৃষ্ট রূপে জ্ঞানের উদ্রেক হয়, তত ক্ষণ অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমরাও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকি ;—না আমাদের আপনার উপর, না সেই পরিবর্ত্তনের উপর, আমাদের কোন হস্ত থাকে। অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করিয়া আমরা যে সুখ লাভ করি, সে এক প্রকার সুখ, এবং সেই পরিবর্ত্তনের দিকে হালি ছাড়িয়া দিয়া যে এক সুখ লাভ করি, সে এক প্রকার সুখ ; পূর্ব্বোক্ত সুখ আমাদের সঙ্গের সঙ্গী, শেষোক্ত সুখ পথের সম্বল মাত্র—আনুষঙ্গিক উপকরণ মাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উদগ্র সৌন্দর্য্যের মূল আদর্শ।

ইত্যগ্রে আমরা বলিয়াছি যে, জ্ঞানের সহিত ভাবের যোগ রক্ষা করিয়া চলাই আমাদের সঙ্কল্প; এই হেতু পূর্ব্বকার মুল তত্ত্ব-সকল অবলম্বন করিয়াই মূল আদর্শ সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাই-তেছে। প্রথমে, প্রজ্ঞা-ঘটিত মূল-তত্ত্ব-সকলের সহিত আমাদের অন্তঃকরণের ভক্তি কি রূপ সায় দেয়, তাহাই প্রদর্শিত হই-তেছে।

প্রজ্ঞা হইতে আমরা এই পাইতেছি যে, পরমাত্মা একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ ও মুলাধার, এবং জগৎ দ্বৈতময়, অপূর্ণ ও আশ্রিত। ঈশ্বরের সহিত যখন আমরা মুখ্যত আমার-দের আত্মার যোগ হৃদয়ঙ্গম করি, তখন

পাকত সমুদায় জগতের সঙ্গেও সেই যোগ প্রতীয়মান হইতে থাকে।

এই রূপে যখন পরমাত্মার সহিত আমাদের আত্মার এবং সমুদায় জগতের সম্বন্ধ অনুভূত হয়, তখন কি রূপ আদর্শ আমাদের ভাবে অভ্যুদিত হয়—তাহাই এক্ষণে অনুধাবন করিয়া দেখা যাইতেছে।

পরমাত্মার সহিত আমাদের আত্মার সংযোগ হইলে, অতীব উদগ্র সৌন্দর্য্যের যে এক আদর্শ আছে, তাহাই অন্তঃকরণ মধ্যে পরিস্ফুট হয়।

প্রথম আদর্শ এই রূপ যে, যত প্রকার বিচিত্রতা আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে, ভক্তি-যোগে তাবতের মধ্যে সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া, এক অদ্বিতীয় স্বরূপ পরমাত্মাতে গিয়া পর্য্যাপ্ত হইতেছে। তাল-ভঙ্গ হইলে যেমন সঙ্গীতের ব্যাঘাত হয়, একত্ব এবং বিচিত্রতা উভয়ের মধ্যস্থলে কুত্রাপি যোগ-ভঙ্গ হইলে সেই রূপ সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত হয়। অন্তরে একত্ব,

বাহিরে বিচিত্রতা, এবং উভয়ের মধ্যে যোগ-শৃঙ্খলা ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত, দেখিলেই আমাদের অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, অন্তরে একতা নাই, বাহিরে বিচিত্রতা নাই, এবং অন্তর বাহিরের মধ্যে কোন যোগ নাই,—এ রূপ নির্জীব ভাব দেখিলে আমাদের বড়ই বিরক্তি বোধ হয়। সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ,—বহির্দৃষ্টি-সমক্ষে ইহারা কেমন অনির্ব্বচনীয় বিচিত্রতা প্রচার করিতেছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখ, দেখিবে যে, উহাদের আকার অবয়ব গতিবিধি এবং আর আর তাবৎ ব্যাপার, একই সার্ব্ব-লৌকিক নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। তরু, শাখা, প্রশাখা, বৃন্ত, পত্রের শিরা, উপশিরা,—বহির্দৃষ্টিতে ইহা কেমন বিচিত্র ব্যাপার; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত সমুদায় অবয়ব গুলি একই আদর্শে বিরচিত। এই রূপ, হস্ত পদ ও শরীরের সমুদায় বিচিত্র অবয়ব সকলের মধ্যে, কাঙ্কালিক পণ্ডিতেরা এই এক প্রকার আশ্চর্য্য

ঐক্যভাব অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছেন যে, মেরুদণ্ডের অস্থিখণ্ড গুলির যেরূপ গঠন, সেই আদর্শ অনুসারে শরীরের সমুদায় অস্থি বিরচিত হইয়াছে। এই প্রকার আরও ভূরি ভূরি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এখানে জানা আবশ্যক যে, জগতের মধ্যে যে সকল প্রজ্ঞা-মূলক ভেদ অবস্থিতি করে, তাহা প্রজ্ঞার স্বগত ভেদ ; বুদ্ধি-গম্য বিষয় সকলের মধ্যে যেরূপ বিজাতীয় ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা সেরূপ নহে। অর্থাৎ বুদ্ধিগম্য বিষয় সকল যেমন জীবাত্মা-কর্ত্তৃক বাহির হইতে সংগৃহীত হয়, প্রজ্ঞা-মূলক জগৎ ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সেরূপে বাহির হইতে উপার্জ্জিত হয় না, পরন্তু অন্তর হইতে উদ্ভাবিত হয়, সুতরাং জগৎ পরমাত্মার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে অবস্থিতি করে।

অতএব ভক্তির প্রথম মূল-আদর্শ এই যে, অন্তরতম পরমেশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়, আমরা প্রত্যেকেই তাঁহার আপনার জন, এবং

আমারদের সকলেরই ভক্তি স্তুতি সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার দিকে অজস্র উত্থিত হইয়া, তাঁহার প্রেম-প্রবাহে জগতের শ্রী নব-তর কল্যাণ-তর রূপে দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।"

দ্বিতীয়তঃ ;—অন্তরে পূর্ণতা, বাহিরে অপূর্ণতা, এবং উভয়ের মধ্যে যত আমরা ঘনিষ্ঠ যোগের সঞ্চার দেখিতে পাই, ততই আমাদের ভাব পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, অন্তরে সর্ব্বাঙ্গীন ভাব নাই, বাহিরে অভাবান্বিত আবির্ভাব নাই, এবং উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, ইহা ভাবের চক্ষে অতীব পীড়াজনক। বৃক্ষের অভ্যন্তরে যে একটি জীবনের ভাব আছে, তাহাই বাহিরে শাখা পত্র ফল ফুলে আশ্চর্য্য রূপে পরিকীর্ণ হয়। বৃক্ষের সহিত জীবন-ভাবের এই রূপ সংযোগ থাকাতেই উহাতে আমরা একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকি। কবির অন্তঃকরণ

মধ্যে যে কোন একটি ভাব সর্ব্বাঙ্গীন-রূপে অবস্থিতি করে, তাহারই ছায়াভাস বাহিরে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া একখানি মনোহর কাব্যে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু যদি এ রূপ হয় যে, কবির মনের ভাবটি সর্ব্বাঙ্গসমেত বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইলে তাহাতে ইহাই সূচিত হয় যে. সে ভাব অতীব যৎসামান্য ; কারণ, তাহা যদি তেমন গভীর হইত, তবে কখনই তাহাকে অন্তর হইতে একেবারে উন্মূলিত করিয়া আনা সাধ্য হইত না। উত্তম কাব্য, উত্তম চিত্র-লেখা, উত্তম সঙ্গীত, ইহারদের এক আশ্চর্য্য রীতি ;—ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে এই রূপ এক ক্ষোভ নিশ্বসিত হইতে থাকে যে, ভিতরের ভাব ইঙ্গিতেই বুঝিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য ; নতুবা "তাবৎই ব্যক্ত করা হইয়াছে, কিছুই অবশিষ্ট নাই" ইহাতে শফরীর ঔদ্ধত্য ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, ভিতরে ভাবের জ্যোতিঃ থাকা সৌন্দ

র্য্যের পক্ষে যেমন আবশ্যক, বাহিরে অভাবের ছায়া থাকা, এবং সেই জ্যোতিঃ ও ছায়া উভয়ের মধ্যে সংযোগ থাকা, তেমনিই আবশ্যক। মনুষ্যের দেখ যে, পশুর তুলনায় তাহার অভাবের আয়তন কেমন সুবিস্তৃত; তাহার আন্তরিক তৃপ্তিও সেই অনুসারে সুগভীর। পরমাত্মার গভীরতম ভাব আমাদের জীবাত্মাতে কখনই সর্ব্বাঙ্গ-সমেত আবির্ভূত হইতে পারে না। তিনি যতই কেন আমারদিগকে জ্ঞানে প্রেমে স্বাধীনতাতে পরিপূর্ণ করুন না, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যে অপূর্ণ, সেই অপূর্ণই থাকিব; আমরা চিরকালই তাঁহার নিকট হইতে অধিকতর সহবাসানন্দ প্রার্থনা করিব, এবং চিরকালই তিনি আমারদের সেই প্রার্থনা পূরণ করিবেন, তাঁহার সহিত আমারদের এই রূপ নিত্য সম্বন্ধ। অতএব ভক্তির দ্বিতীয় আদর্শ এই যে, একমাত্র পরমেশ্বরই কেবল পূর্ণ, আমরা প্রতিজনেই অপূর্ণ, এবং ভক্তি-যোগে আমাদের সমুদায়

অভাবের ক্রন্দন তাঁহার সন্নিধানে উত্থিত হইয়া ক্রমশই সে সকল অভাবের পরিসমাপ্তি হইতেছে।

তৃতীয় আদর্শ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আমারদের অভাব জন্য যেমন প্রার্থনা উদিত হয়,—সেইরূপ ঈশ্বরের ভাব-দ্বারা সেই অভাবের যত পূরণ হয়, ততই আমরা স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পাদন করিতে সামর্থ্য লাভ করি। যে পরিমাণে আমারদের অভাব, সেই পরিমাণে সেই অভাবের প্রতিবিধান জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হয় এবং যে পরিমাণে ঈশ্বর-প্রসাদে আমারদের অভাবের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, সেই পরিমাণে আমরা বিবেচনা-পূর্ব্বক নিয়ম-পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হই। অতএব তৃতীয় আদর্শ এইরূপ যে, আমাদের জ্ঞানে যতপ্রকার নিয়ম-শৃঙ্খল স্থান পাইতে পারে, সকলই ভক্তি-যোগে স্বতন্ত্র স্বরূপ পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া, তাঁহার ইচ্ছাতে আমারদের প্রতিজনের আত্মাতে

স্বাধীনতা প্রবাহিত হইতেছে। অন্তরে স্বাধীনতা, বাহিরে পরাধীনতা, এবং উভয়ের মধ্যে যত ঘনিষ্ঠ যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, ততই আমাদের ভাব পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, অন্তরে স্বাধীনতা নাই, বাহিরে নিয়ম-বদ্ধতা নাই, এবং উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা ভাবের চক্ষে অতীব নিন্দনীয়। আমরা ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া আপনার নিয়মে বর্ত্তিয়া আছি—এইটি আমাদের ভিতরের ভাব; নানা বিষয়ের অনুরোধে নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি—এইটি আমাদের বাহিরের ভাব; এবং বাহিরের নানা নিয়মসংকুল পরাধীনতা-ক্ষেত্রে আমাদের অন্তরের স্বাধীনতা অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া, সেখানেও উহা স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান পুর্ব্বক মঙ্গল সাধনে কৃতকার্য্য হইতেছে—এইটি উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ঘনিষ্ট সম্বন্ধ-সূত্রের পরিচয় দিতেছে। এইরূপে আমাদের অন্তরের স্বাধীনতাকে আমরা যে পরিমাণে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বলবৎ করিতে পারি, সেই পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতি-

কর্ত্তৃত্ব বিষয়ের আভাস পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি। অতএব ভক্তির তৃতীয় আদর্শ এই যে, পরমাত্মা একান্ত স্বাধীন রূপে সকলের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, জগৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলায় পরিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এবং সকলে ভক্তি সহকারে তাঁহার কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া স্বাধীনতা লাভে দিন দিন কৃতকৃত্য হইতেছে।

এই যে কএকটি মূল আদর্শের সন্ধান পাওয়া গেল, সকলের মধ্যে সার কথা— ঈশ্বরের ভজনা, কি না ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা। ঈশ্বরের প্রতি যখন আমাদের আত্মা তদ্গত-ভাবে আকৃষ্ট হয়, তখন তাঁহার সমীপে আমরা গণনার অযোগ্য, অকিঞ্চন, এবং একান্ত আশ্রিত, এই রূপ ভাব আমাদের মনো-মধ্যে কাযেই প্রবল হয়; এবং সেই সঙ্গে আমরা ঈশ্বরকে সমুদায় জগতের স্রষ্টা পাতা রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হই,—তখনই আমরা ইহা জানিয়া কৃতার্থ হই যে, যিনি পূর্ণজ্ঞান,

পূর্ণশক্তি, পূর্ণমঙ্গল, তিনিই সমুদায় জগতের স্রষ্টা পাতা। ঈশ্বরের উপাসনা, রোগ শোক পাপ তাপ, সকলেরই মহৌষধ; ঈশ্বরের উপাসনাই আমারদের শান্তি-নিকেতন। যদি রোগ হইয়া থাকে, সেখানে যাও, আরোগ্য পাইবে; শোক হইয়া থাকে, সেখানে যাও, সান্ত্বনা পাইবে; ভয় হইয়া থাকে, সেখানে যাও, অভয় পাইবে; পাপ হইয়া থাকে, সেখানে যাও, নিস্তার পাইবে; রোগ শোক ভয় পাপ, সেখানে ইহার কিছুই রহিবে না, সকল দুঃখই চলিয়া যাইবে। ঈশ্বরের উপাসনা, পরম পিতা পরম মাতা ও পরম বন্ধুর উপাসনা—অজ্ঞাত অপরিচিত উদাসীনের উপাসনা নহে। অতএব ইহা কি না সৌভাগ্যের বিষয় যে, এমন ঈশ্বরোপাসনায় সকলেই আমরা অধিকারী।

তৃতীয় অধ্যায়।

সমগ্র সৌন্দর্য্যের মূল আদর্শ।

সৌন্দর্য্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে,—উদগ্র সৌন্দর্য্য এবং সমগ্র সৌন্দর্য্য। যে সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব-প্রধান তাহারই নাম উদগ্র সৌন্দর্য্য, এবং যে সৌন্দর্য্য পারিপাট্য-প্রধান তাহারই নাম সমগ্র সৌন্দর্য্য। প্রজ্ঞা-মূলক উদগ্র সৌন্দর্য্যের কয়টি আদর্শ যাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার জ্যোতিঃ আমাদের আত্মাতে প্রকাশ পাইলে, আত্মা এক আশ্চর্য্য পারমার্থিক ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া মহান্ পরমেশ্বরকেই সর্ব্বস্বরূপে বরণ করে।

জ্ঞানই হউক, ভাবই হউক, ইচ্ছাই হউক, আমাদের আত্মার সম্বন্ধে ইহারদের প্রত্যেকেরই প্রকার-ভেদে পদবী-ভেদ অনায়াসে লক্ষিত হইতে পারে যথা ;—এমন জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছা আছে, যাহা আমার-

দের আত্মার গুণ, যাহা আমাদের আত্মার অধীন; আবার এমনও জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছা আছে, যাহা আমাদের আত্মার অধীন হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহারই অধীন আমারদের আত্মা। যে জ্ঞান আমাদের আত্মার অধীন তাহা—বুদ্ধি. এবং আমাদের আত্মা যে জ্ঞানের অধীন তাহা—প্রজ্ঞা। জ্ঞানের যেমন এই দুইটি প্রকার-ভেদ দেখা গেল, সৌন্দর্য্যেরও সেইরূপ দৃষ্ট হয়। কোন সৌন্দর্য্য এরূপ যে, আত্মা তাহাকে সমগ্ররূপে আয়ত্ত করিয়া সুখী হয়; কোন সৌন্দর্য্য এরূপ যে, আত্মার তাহাকে আয়ত্ত করা দূরে থাকুক, তাহাই আত্মাকে আয়ত্ত করিয়া তাহাকে অপার আনন্দে অভিষিক্ত করে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল আদর্শ বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা শেষোক্ত প্রকার উদগ্র সৌন্দর্য্যের মূলে অধিষ্ঠান করে; অতঃপর পূর্ব্বোক্তপ্রকার সমগ্র সৌন্দর্য্যের আদর্শ কিরূপ, তাহাই এক্ষণে অন্বেষণ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বকার প্রতিজ্ঞাত প্রণালী অনুসারে

চলিতে হইলে, বর্ত্তমান স্থলে বুদ্ধির মূল-তত্ত্ব-গুলির প্রতি সর্ব্বাগ্রে মনোনিবেশ করা আবশ্যক।

বুদ্ধির মূল-তত্ত্ব কি? না আত্মা এক, ভাবাত্মক ও স্বাধীন; বিষয় অনেক, অভাবাত্মক ও পরাধীন; জ্ঞান সমষ্টি-বদ্ধ, সীমা-বদ্ধ ও পরস্পরাধীন।

প্রজ্ঞার মূল-তত্ত্ব এবং বুদ্ধির মূল-তত্ত্ব উভয়ের মধ্যে কি বাস্তবিকই প্রভেদ আছে? না কেবল একটা প্রভেদ কল্পিত হইয়াছে? এই একটি আপত্তি মধ্যে মধ্যে আমাদের গতি রোধ করিবার জন্য উপস্থিত হইতে পারে। সংক্ষেপতঃ, প্রজ্ঞার অদ্বিতীয়ত্ব এবং বুদ্ধির একত্ব, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে কি না প্রণিধান করিয়া দেখিলেই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যথোচিত মীমাংসা হইতে পারিবে।

মনে কর, আমার এক খণ্ড ভূমি মাপিবার প্রয়োজন হইয়াছে; তজ্জন্য এক হস্তই হউক, এক কাঠাই হউক, এক বিঘাই হউক, কতক পরিমাণ স্থানকে এক বলিয়া ধারণা

করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এক হস্তকে এক গণ্য করিলে আমার পক্ষে হয়ত সুবিধা হয়, এক কাঠাকে এক গণ্য করিলে অন্যের পক্ষে হয়ত সুবিধা হয়,—কেন না বুদ্ধিবৃত্তির ধারণা-শক্তি কাহারও বা অধিক কাহা-রও বা অল্প, কাহারও বা গ্রহ-চন্দ্রা-দির মধ্য-গত ব্যবধান মাপা অভ্যাস, কাহারও বা ক্ষেত্রাদি মাপা অভ্যাস, সুতরাং যে পরিমাণ-দণ্ড আমার মনোবৃত্তির ধারণো-পযোগী, অন্যের পক্ষে তাহা সেরূপ না হইয়া ন্যূনাতিরেক হইতে পারে। অতএব খণ্ড আকাশ বিশেষকে, আমরা চাই এক বলি, অন্যে চাই দুই বলুন, যাঁহার যে রূপ ধারণা-শক্তি তিনি সেই অনুসারে গণনা করুন, তাহাতে কিছুমাত্র বাধা নাই। কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে, তিনি অসীম আকাশকে এক ভিন্ন দুই বলিতে পারেন। অসীম আকাশ সম্বন্ধে আমার ধারণা-শক্তি যেরূপ, অন্যে-রও সেইরূপ, সমূলে ব্যর্থ হয়। খণ্ড আকা-শের একত্ব আমাদের নিজের নিজের তার-

তম্য-বিশিষ্ট ধারণা-শক্তিকে অপেক্ষা করে, অতএব ইহা আপেক্ষিক; কিন্তু অসীম আকাশের যে একত্ব তাহা নিরপেক্ষ, সুতরাং নির্ব্বিকল্প। অসীম আকাশ যদিও আমাদের ধারণা-শক্তির অতীত, তথাপি তাহার সেই অদ্বিতীয় একত্ব-মূলে, অপ্রতিহত থাকাতেই খণ্ড আকাশ-সকলের সদ্বিতীয় একত্ব সিদ্ধ হইতে পারিতেছে। পূর্ব্ব হইতেই প্রজ্ঞাতে অসীমের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, বুদ্ধি সেখানে পৌঁছিতে পারে না। বুদ্ধি যদি অসীমের দিকে হস্ত প্রসারণ করে, তবে সে কেবল হাস্যাস্পদ হয়, এই মাত্র। আমারদের স্ব স্ব পরীক্ষিত বিষয়-সমূহের মধ্যে বুদ্ধি যে কোন একত্ব উপলব্ধি করে, তাহাতে জীবাত্মার পরিমিত একত্বেরই পরিচয় দেওয়া হয়; কিন্তু সকল একত্বের মূল-একত্ব যাহা পূর্ব্ব হইতে আমাদের প্রজ্ঞাতে স্থির-নিশ্চয় রহিয়াছে, তাহাতে পরমাত্মার অদ্বিতীয় একত্ব প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইতেছে।

আমাদের স্ব স্ব জীবাত্মার একত্ব, ভাবাত্মকতা, স্বাধীনতা, তদীয় বিষয়ের অনেকত্ব, অভাবাত্মকতা, পরাধীনতা, এবং উভয়ের মধ্যগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; এই আদর্শানুযায়ী যে কোন দৃশ্য আমাদের সম্মুখে আইসে, তাহাতেই আমাদের প্রেম আকৃষ্ট হয়। কেন না, সকল হইতে মুখ্যতম রূপে আমরা আপনা আপনাকে প্রীতি করিয়া থাকি এবং আমাদের নিজের ভাব আমরা অন্যেতে যে পরিমাণে মূর্ত্তিমান্ দেখি, সেই পরিমাণে তাহার প্রতি আমাদের প্রীতি বর্ত্তে।

প্রথমতঃ ;—আমরা আপনারা যে পরিমাণে বিচিত্র বিষয়-সকলকে একের অন্তর্গত করিয়া ধারণ করিতে পারি, অন্যেতে তদনুরূপ ভাব দেখিলে তাহাকে আমরা আপনার মত করিয়া হৃদয়ে স্থান দিই। এতদ্ভিন্ন, যাহার ধারণা-শক্তির ব্যাপ্তি আমাদের অপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ যিনি আমাদের অপেক্ষা বহুদর্শী ও দূরদর্শী, তাঁহাকে আমরা ভক্তি

করি; এবং যাঁহার ধারণা-শক্তির ব্যাপ্তি আমাদের অপেক্ষা অল্প, তাঁহাকে আমরা স্নেহ করি। বিদ্যা অর্থ, মান সম্ভ্রম, আচার ব্যবহার, ভাব ভক্তি, কোন না কোন বিষয়ে দুই জনের ব্যাপিত্ব পরস্পর-সন্নিধানে সমান বলিয়া পরিচিত হইলেই উভয়ের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে। অপিচ, দুই জনের মধ্যে বাহিরে বিস্তর অনৈক্য থাকিলেও ভিতরে ঐক্য থাকিবার কিছু-মাত্র বাধা নাই। এক জন হয়ত বণিক্, অন্য জন হয় ত কৃষক; অথচ দুই জনেরই অর্থের প্রতি সমান রূপ মমতা থাকিতে পারে। এক জন হয়ত স্ত্রী, অন্য জন হয়ত পুরুষ; অথচ তাহাদের মধ্যে পতি-পত্নী সম্বন্ধ থাকিলে, গৃহকার্য্য সুনির্ব্বাহ, সন্তান প্রতিপালন, এ সকল বিষয়ে উভয়েরই সমান রূপ যত্ন থাকিতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা বাহিরে দুই কিন্তু ভিতরে এক; এ স্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে,

বাহ্য বিভিন্নতা আন্তরিক একত্বের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাই আরও তাহার সমধিক উপযোগী।

দ্বিতীয়তঃ ;—আমরা আপনারা যে পরিমাণে অভাবাত্মক আবির্ভাব-সকলের মধ্যে ভাবের আস্বাদ পাই, অন্যেতে সেই পরিমাণে ভাবুকতার নিদর্শন পাইলে তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতি সংক্রমিত হয়। এতদ্ভিন্ন, যিনি আমাদের অপেক্ষা অধিক-পরিমাণ ভাবুক, তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ; যিনি তদপেক্ষা অল্প-পরিমাণে ভাবুক, তিনি আমাদের স্নেহের পাত্র। এই জন্য, প্রীতির নিগড় সমবয়স্কদিগের মধ্যে যেমন সহজে সংলগ্ন হইতে দেখা যায়, বিভিন্নবয়স্কদিগের মধ্যে সে রূপ কখনই সম্ভবে না।

তৃতীয়তঃ ;—আমরা আপনারা যে পরিমাণে নিয়ম-শৃঙ্খল সকলের মধ্যে স্বাধীনতা উপভোগ করি, তদনুরূপ ভাব অন্যেতে দেখিলে তাহার প্রতি আমাদের প্রীতি নিবদ্ধ হয় ; এবং সে ভাবের ন্যূনাতিরেক দেখিলে

তৎপরিবর্ত্তে স্নেহ-ভক্তির উদ্দীপন হয়। এই প্রকার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উচ্চের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, সমানে সমানে প্রেম, এবং নীচের প্রতি স্নেহ মমতা, ভাবের স্রোত এই রূপ ত্রিপথ-গামী।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহার মধ্য হইতে সার সংকলন করিলে এবং তদীয় আনুষঙ্গিক দুই একটি শাখা প্রশাখা বর্দ্ধিত করিলে, নিম্নলিখিত কতিপয় সিদ্ধান্তে উপ-নীত হওয়া যায়; যথা—

প্রথমতঃ; প্রকৃত প্রেম যাহা, তাহা পৃথিবী-লোকে মনুষ্যে মনুষ্যেই সম্ভবে। বৃক্ষ-লতা পশু-পক্ষী, ইহারা আমাদের ক্রীড়ার বস্তু হইতে পারে, প্রেমের বস্তু হইতে পারে না। মনুষ্যে মনুষ্যে প্রেম বলাতে আত্মায় আত্মায় প্রেম বুঝায়—এই প্রেমই যথার্থ প্রেম নামের যোগ্য। আত্মায় আত্মায় যে কেমন প্রেম, তাহা আমরা স্ব স্ব অন্তরেই উপভোগ করিতে পারি; যে হেতু, সকলেই আমরা আপনা আপনাকে প্রীতি করিয়া

থাকি। আপনাকে প্রীতি করা আত্মারই ধর্ম্ম; এই হেতু আমাদের আত্মা যত উন্নত হয়, ততই আমরা অধিক পরিমাণে আপনাকে প্রীতি করিতে সমর্থ হই;—যে পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের ভক্ত, সেই পরিমাণে আমাদের আত্মা উন্নত, সেই পরিমাণে আমরা আপনাতে এবং অন্যেতে প্রীতি-রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হই।

দ্বিতীয়তঃ; আমরা আপনার ভাব অনুসারেই অন্যের সহিত প্রেমে আবদ্ধ হইয়া থাকি। এক জন বিদ্যার্থী পণ্ডিত, এবং এক জন ধনার্থী বণিক্, উভয়ের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইতে না পারে এমন নয় কিন্তু তাহা হইলে ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে যে, বিদ্যা ও অর্থ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথোচিত ঐক্য আছে, নতুবা কিসের উপরে স্থাপিত হইয়া উহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম সজীব থাকিবে। এক বার কোন বিষয়ে দুই জনের মধ্যে প্রেমের সূত্রপাত হইলে, পরে যত তাহাদের

মধ্যে সে বিষয়ের আলোচনা হয়, এবং তজ্জন্য উভয়ই সে বিষয়ে একত্র উন্নতি লাভ করে, ততই তাহাদের মধ্যে প্রেমসম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা হয়; এবং উভয়ের যদি ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সে প্রেম কোন কালেই জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত হয় না, প্রত্যুত ক্রমশই বিকশিত হইয়া আনন্দামৃতে পূর্ণ হইতে থাকে।

তৃতীয়তঃ; উচ্চতর ব্যক্তির সহবাসে আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি চরিতার্থ হয়, এবং তাহাতে আমরা উন্নতির দিকে আকৃষ্ট হই। কখন কখন এ রূপ হয় যে, অরোগী হৃষ্ট পুষ্ট বলবান্ চিকিৎসক-বিশেষ অভ্যাগত হইবামাত্র রোগীর রোগ দূরে পলায়ন করে;—ভক্তি শ্রদ্ধাই এ রূপ আরোগ্যের মূল। রোগী ব্যক্তি যেমন চিকিৎসকের হস্তে আপনাকে শ্রদ্ধার সহিত সমর্পণ করে, সেই রূপ আমরা যদি ঈশ্বরের উপরে সম্পূর্ণ ভরসা স্থাপন করত সাংসারিক দুঃখ বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকি, এবং

তাঁহার আদিষ্ট সদুপায়ে তৎপর হই, তাহা হইলে তিনিই আমারদের আত্মার উন্নতি করিয়া দেন ; কিন্তু দুর্দ্দান্ত রোগীর ন্যায় আমরা যদি অধৈর্য্য হইয়া ঈশ্বরের সাহায্য বিনা আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা পদে পদে আরও রোগ সঞ্চয় করিতে থাকি।

সমানের সহবাসে প্রীতি চরিতার্থ হয়, এবং তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যেই আমাদের সন্তোষ নিমগ্ন থাকে। ভক্তি উন্নতির দিকে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া থাকে, প্রীতি বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে দ্রব্যাদি গুছাইয়া সন্তোষ উপভোগে রত হয় ; পরন্তু এই প্রীতির যদি ভক্তির সহিত সংস্রব না থাকে, তাহা হইলে সে সন্তোষ, দেবতার বর্ষণ অভাবে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায় ; কেন না ঈশ্বরের কল্যাণ আশীর্ব্বাদ আমাদের শরীর মন আত্মাতে যথাপরিমাণে বর্ষিত না হইলে, আপন আত্মাও আমাদের নিকটে অসার ও হেয় বোধ হয়, তবে আর কে

আমাদিগকে প্রীতি দানে পরিতুষ্ট করিবে? সম্পূর্ণ দাতার নিকটে, সম্পূর্ণ গৃহীতার যে-রূপ ভাব হওয়া উচিত, সেই রূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব আত্মাকে অভিষিক্ত করিলে, তবেই ঈশ্বরের দান আমাদের নিকটে বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের বলে আমরা বিষয় উপভোগ করি, সমুদায় আত্মার বলে আমরা আপনাকে প্রীতি করি, কিন্তু সমুদায় আত্মার বলেও আমরা পরমাত্মাকে ভক্তি করিয়া উঠিতে পারি না; তবে কি? না তাঁহার সাহায্যে বিশ্বাস পুর্ব্বক যে পরিমাণে আমরা তাঁহাতে ভক্তি সমর্পণ করি, সেই পরিমাণেই আমার-দের আত্মায় আত্মায় বিশুদ্ধ প্রীতির সঞ্চার হইতে থাকে।

সর্ব্বশেষে ব্যক্তব্য এই যে, যদিচ মুখ্য রূপে ধরিতে গেলে মনুষ্যই কেবল আমাদের প্রীতির আস্পদ হইতে পারে, তথাপি বহির্ব্বিষয়-সকলেতে মনুষ্যত্বের ভাব কৃত্রিম রূপে আরোপ করিতে পারা যায় বলিয়া

উঁহাদিগকেও আমরা এক প্রকার প্রীতি করিতে পারি। সূর্য্যকে আমরা বলি—চক্ষুষ্মান আলোককে—সানন্দ, রজনীকে—প্রশান্ত; কিন্তু বাস্তবিক, সূর্য্যেতে চক্ষু নাই, আলোকে আনন্দ নাই, রজনীতে শান্তি নাই,—সকলই আমাদের মনে। অন্ধকার আমাদের সম্মুখ হইতে বিষয়-সকল কাড়িয়া লয়, আলোক পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আমাদের নিকট প্রত্যানয়ন করিয়া আমাদের মনে আনন্দ বিধান করে—এই পর্য্যন্ত; কিন্তু সে আনন্দ আমাদের মনেরই সম্পত্তি, আলোকের তাহাতে স্বত্ব নাই। অতএব আলোককে কেবল আমরা কৃত্রিম রূপেই আনন্দরূপ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি;—শিশুকে যেমন নানা রূপ উচ্চপদসেব্য উপাধি সংযোগে আদর করা যায়—সেই রূপ। প্রকৃতিকে ঈশ্বরপদোচিত উপাধি প্রয়োগ দ্বারা ব্যাখ্যা করাও এই রূপ অবাস্তবিক স্নেহ-সম্ভাষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আমরা আত্মাকে যে ভাবে প্রীতি করি,

বিষয়কে কদাপি সে ভাবে প্রীতি করিতে পারি না। আপন আত্মাতে যে প্রীতি প্রগাঢ় ভাবে পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে, বিষয়-ক্ষেত্রে তাহা বহুধা-বিক্ষিপ্ত ভাবে পরিণত হয়। এইজন্য, যদি একটা কোন সামগ্রীতে রত হওয়া কর্ত্তব্য হয়. তবে তাহা বিষয় নহে, কিন্তু আত্মা; এবং যদি হেলাক্রমে নানাবিধ বিচিত্র সামগ্রীতে বিচরণ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা আত্মা নহে কিন্তু বিষয়-সমূহ। সুতরাং গাঢ় প্রেমাসক্তি আত্মার সঙ্গেই বিধেয়, বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে তরল বাল্য-ক্রীড়াই বিধেয়, এ ভিন্ন বিষয়-বিশেষের সহিত অকাট্য গ্রন্থিতে অনুস্যূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

চতুর্থ অধ্যায়।

~~~~~~~~~~~

সৌন্দর্য্যের বাহ্যালঙ্কার বিষয়ক মূল আদর্শ।

প্রেমের আদর্শের পর ইন্দ্রিয়-সুখের আদর্শ অন্বেষণ করা যাইতেছে। কিন্তু অগ্রে আবশ্যক যে, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-বোধ উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ কি রূপ, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা। বুদ্ধির কার্য্য—সাধারণ ও বিশেষ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপন করা, ইন্দ্রিয়-বোধের কার্য্য—সে সম্বন্ধের প্রতি উদাসীন থাকিয়া বিষয়ের শক্তি দ্বারা অনুরঞ্জিত হওয়া। সাধারণ পশুভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যখন আমরা কোন একটা বিশেষ পশুর প্রতি—যথা হরিণের প্রতি—মনোযোগ করি, তখন সেই হরিণের সহিত আর আর পশুর সম্বন্ধের বিষয় আমাদের মনে আন্দোলিত হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটি তত্ত্ব মূলে স্ফূর্তি পায় যে,
~~~~~~~~~~~

সাধারণ পশু—এক, বিশেষ পশু—অনেক, এবং সেই অনেক পশুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু পশু-ভাব কি কোন ভাবের প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই, ইতি-মধ্যে একটা হরিণ যদি আমাদের দৃক্‌-পথে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই হরিণের সহিত আর আর পশু প্রভৃতির ভেদাভেদ কিছুই আর মনে হয় না, কেবল আমাদের দৃষ্টি উহাতে সমর্পিত হইয়া, একটা অবস্থা পরিবর্ত্তন মাত্র যাহা কিছু অনুভূত হয়।

বুদ্ধির ক্রিয়া ও বুদ্ধির লক্ষ্য দুয়ের মধ্যে যেমন একটি প্রভেদ উপলব্ধি হয়,—ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য এ দুয়ের মধ্যে সে রূপ হয় না। "এই যাহা দেখিতেছি এটা হরিণ কি রূপে জানিলাম? না শাখায়মান শৃঙ্গ, দ্বিখণ্ডিত খুর, কোমল অঙ্গ, ইত্যাদি লক্ষণ-সকল দ্বারা।" বুদ্ধির লক্ষ্য এ স্থলে প্রত্যক্ষ হরিণ, বুদ্ধির ক্রিয়া এ স্থলে—শৃঙ্গাদি অবয়বগুলির বিবেচনা দ্বারা হরিণত্ব সিদ্ধি করা; সুতরাং উভয়ের মধ্যে অনায়াসেই ভেদ নির্দ্দিষ্ট

হইতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-বোধ উপ-লক্ষে কদাপি এরূপ বলিতে পারা যায় না যে, শ্রবণ-ক্রিয়া এইটি—এবং তাহার লক্ষ্য ধ্বনি এইটি, ঘ্রাণ-ক্রিয়া এইটি এবং তাহার লক্ষ্য গন্ধ এইটি, ইত্যাদি,—ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য, দুইকে কদাপি পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধরিতে পারা যায় না।

ঐক্যানৈক্য প্রভৃতি বিবেচনা যাহা বুদ্ধির প্রাণ-স্বরূপ, ইন্দ্রিয়-বোধ তাহার বিরোধী। অবিবেচনাই ইন্দ্রিয়-বোধের উপজীবিকা। যেখানে বিবেচনার প্রাদুর্ভাব সেখানে ইন্দ্রিয়-বোধ শাসনে থাকে, যেখানে ইন্দ্রিয়-বোধের প্রাদুর্ভাব সেখানে বিবেচনা কারাবদ্ধ থাকে। আমাদের শরীরের কোন অঙ্গ যখন আঘাত পাইয়া ব্যথিত হইয়াছে, তখন যদি আমাদের এ রূপ বিবেচনার অবকাশ হয় যে, আমি স্বতন্ত্র ও আমার শরীর স্বতন্ত্র, তাহা হইলে সে ব্যথার তখনি অন্ত হয়; কিন্তু কঠোর পরীক্ষাতে ইহাই দেখা গিয়া থাকে যে, ইন্দ্রিয়-বোধ ওরূপ প্রবল হইয়াছে

কি অমনি আমাদের আত্মানাত্ম-বিবেচনা খর্ব্ব হইয়া যায়।

যখন এরূপ হয় যে, আমরা আমাদের জ্ঞানকে যথেচ্ছাক্রমে নানা বিষয়ে নিয়োগ করিতে পারিতেছি, তখন সেই জ্ঞান-কার্য্যে আমাদের আত্মারই শক্তি প্রকাশ পায়; কিন্তু যখন দেখি যে, আমরা অবস্থার দাস হইয়া সে রূপ করিতে পারিতেছি না, তখন আমাদের সেই অশক্তিতে বিষয়েরই শক্তি প্রকাশ পায়।

যত ক্ষণ আমরা বিষয় হইতে নির্লিপ্ত থাকি, তত ক্ষণই বিষয় আমাদের কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইতে পারে; কিন্তু আমরা যদি বিষয়ের সহিত এরূপ লিপ্ত হইয়া যাই যে, আপনাতে তাহাতে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাই না, তাহা হইলে উহা আমাদের জ্ঞানের অবিষয় হইয়া পড়ে।

নিদ্রাকর্ষণ-বশে যখন আমাদের চেতনা অবসন্ন হইয়া পড়ে, যখন আমাদের অন্তঃকরণ শরীরসাৎ হইয়া প্রসুপ্তিরূপ এক অবস্থা-

বোধ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তখন আর শরীরাদিকে বিষয় বলিয়া বোধ থাকে না। নিদ্রাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থা, জাগ্রদবস্থা হইতে নিদ্রাবস্থা, এই রূপ অবস্থা-পরিবর্ত্তন লইয়াই ইন্দ্রিয়-বোধ বর্ত্তিয়া থাকে;—ফলতঃ আমাদের জ্ঞান যেমন অবস্থাপ্রবাহের মূলস্থিত দর্পণ-স্বরূপ, ইন্দ্রিয়-বোধ সেরূপ নহে।

প্রেম ও ইন্দ্রিয়-সুখ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিতে হইলে, এক দিকে গীত-রচয়িতা চিত্রকর, কবি, এবং এক দিকে সুখাসক্ত বিলাসী, দুয়ের ইতর বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে। কবি এক জন—আপন রচণার ভাবটির প্রতি যেমন অনুরক্ত, তাহার শব্দ-লালিত্যের প্রতি তেমন নহে; কিন্তু বিলাসী এক জন—সেই রচনার শব্দ-মাধুরী মাত্রে এরূপ বাঁধা পড়িয়া থাকেন যে, তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে তাঁহার আর অবকাশ হয় না। কবির দৃষ্টান্তানুযায়ী মনের ভাব অনুসারে বাহিরের সামগ্রী-সকলকে অধিকার করা—প্রেমের

পদ্ধতি ; এবং বিলাসীর দৃষ্টান্তানুযায়ী অজ্ঞাতসারে বাহিরের সামগ্রী-সকল কর্ত্তৃক মনকে অধিকৃত হইতে দেওয়া—ইন্দ্রিয়-সুখের পদ্ধতি। এখানে এই যেমন দুইটি ভাব দেখা গেল—কবির মনের ভাব এবং বিলাসীর মনের ভাব ; এই রূপ প্রতিমনুষ্যের মনোমধ্যে দুই প্রকার ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায় ;—কি ? না প্রবৃত্ত ভাব আর প্রবর্ত্তক ভাব, স্বপ্ন ভাব ও জাগ্রৎ ভাব, তাচ্ছীল্যের ভাব ও ব্যবস্থার ভাব, ইত্যাদি ; প্রথমটি প্রাকৃতিক ভাব, দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক ভাব ; প্রথমটি পশুভাব, দ্বিতীয়টি মনুষ্য-ভাব। দেশকালে কেবল প্রবৃত্ত ভাবই দৃষ্টি-গোচর হইতে পারে, কিন্তু প্রবর্ত্তক ভাব আত্মা ভিন্ন আর কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। আত্মা যাহা আদেশ করে, কাল তাহাই মস্তকে বহন করে ; আমরা যদি একটা গোলাকে দ্রুত-বেগে চালনা করি, তবে কোন প্রতিবন্ধক অবিদ্যমানে কাল ক্রমাগত তাহাই করিবে ; আমরা যদি গোলা-

টাকে মন্দ-বেগে চালনা করি, কালও তাহাই ক্রমাগত করিতে থাকিবে। কালেতে নূতন কিছুই হয় না; আত্মা কর্ত্তৃক যাহা আরব্ধ হয়, কালেতে তাহাই কেবল বহমান হয়। নূতন আরম্ভ—আত্মা ভিন্ন আর কাহারও কর্ত্তৃক সংঘটনীয় নহে, পুরাতন অভ্যাসই কেবল কালের অধিকারে স্থান পায়। কিন্তু আত্মার প্রারব্ধ কার্য্য-সকলকে কাল যে এই রূপ যথাজ্ঞাক্রমে বহন করে, তাহাও আত্মার মূলবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে উহা আপন ক্ষমতায় করিতে পারে না। সময়-বিশেষে যদি আমাদের পদ-চালনা করা বা নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস হয়, তবে সেই অভ্যাসের প্রবর্ত্তক—আত্মা মূলে অধিষ্ঠিত থাকাতেই সে অভ্যাস জীবন ধারণে সমর্থ হয়। এ স্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, আত্মা যখন এই রূপে আপন কার্য্যের ভার, প্রকৃতির স্কন্ধে বা কালের স্কন্ধে সমর্পণ করে, তখন তাহাতে আত্মার কেবল অধ্যক্ষতা মাত্র থাকিলেই হইল, আত্মাকে স্বহস্তে সে কার্য্য লইয়া পুনর্ব্বার বিব্রত হইতে হয়

না। বীণাযন্ত্রে যে ব্যক্তির নিপুণতা জন্মি-
য়াছে, তিনি এদিকে বীণা বাদ্য করিতে-
ছেন, ওদিকে কোন এক ব্যক্তির সহিত কথা
কহিতেছেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; এ-
খানে ইহা স্পষ্ট যে, আত্মার অধিষ্ঠান
মাত্র থাকাতে প্রকৃতি তাহার আদেশ পালনে
তৎপর হইতেছে, এই হেতু সে সময়ে আত্মা
অন্য কার্য্যে মন দিতে অবকাশ পাইতেছে।

এক্ষণে বলিবা মাত্রই বুঝিতে পারা
যাইবে যে, আত্মা স্বাধীন ভাবে যাহা চায়
তাহাই প্রেমের আদর্শ, এবং প্রকৃতি যাহা
চায় তাহাই ইন্দ্রিয়-সুখের আদর্শ; অথবা
আমরা আত্মার বলে যাহা চাই তাহাই প্রেমের
আদর্শ এবং প্রবৃত্তির বলে যাহা চাই তাহাই
ইন্দ্রিয়-সুখের আদর্শ।

প্রকৃতির আকিঞ্চন তিন রূপ হইতে
পারে, যথা,—পূর্ব্ব অভ্যাসের অনুযায়ী,
বর্ত্তমান উত্তেজনার অনুযায়ী, ও ভবিষ্যৎ
চরিতার্থতার অনুযায়ী; এতদনুসারে ইন্দ্রিয়-
সুখের আদর্শকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা

গেল,—আনুপূর্ব্বিক আনুষঙ্গিক, এবং আনু-শেষিক।

উদাহরণ ;—আমাদের চক্ষুতে জ্যোতিঃ নিপতিত হইলে প্রথমতঃ এক প্রকার গতির অবস্থা অনুভূত হয়। ধ্বনিতে এবং জ্যোতিতে এ বিষয়ে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই,—কেবল ধ্বনিতে উক্ত গতির ভাবটি আরও কিছু স্পষ্ট-তররূপে প্রকাশ পায়। এই প্রকার গতির অবস্থা আনুপূর্ব্বিক হইলে, অর্থাৎ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের পূর্ব্বাভ্যাসের অনুযায়ী হইলে, আমাদের পক্ষে তাহা সুখ-জনক হয় ; তদ-পেক্ষা অতিরিক্ত হইলে অসহ্য হইয়া উঠে ; তদপেক্ষা ন্যূন হইলে অতৃপ্তি-জনক হইয়া পড়ে।

গতির আনুপূর্ব্বিকতা হেতু আমাদের অন্তঃকরণে যে সুখানুভব হয়, কবিতাচ্ছন্দঃ ও গীত-প্রবাহ উভয়ই তাহার প্রমাণ দিতেছে। ছন্দের হ্রস্ব দীর্ঘ এবং গীতের তাল মান আনুপূর্ব্বিকরূপে চলিতে থাকিলে, তাহা কেমন শ্রুতি-সুখের আস্পদ হয় ; এবং

অকস্মাৎ ছন্দঃ-পতন বা তাল-ভঙ্গ হইলে তৎক্ষণাৎ শ্রবণে কেমন আঘাত লাগে ; এমন কি, এরূপ ঘটনা বিচিত্র নহে যে, সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, ইতি মধ্যে তাল-ভঙ্গ হওয়াতে নিদ্রা অমনি সচকিত হইয়া প্রস্থান করিল। যদি কেবল একটি মাত্রও সুস্বর আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে—যেমন কোকিলের পঞ্চম স্বর, তাহাও আনুপূর্ব্বিক তরঙ্গমালাচ্ছন্দে নাচিতে নাচিতে তথায় প্রবেশ করে, তাহার মধ্যেও ছন্দঃ ও যমক রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ;—আলোক যখন আমাদের চক্ষুর প্রতিমুখে ধাবিত হয়, তখন দৃশ্য বস্তু সকলের বিস্তৃতি আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। এই দৃশ্য-বিস্তৃতি বর্ত্তমানের আনুষঙ্গিক হইলে, অর্থাৎ বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত সম্বন্ধে উহার এদিক্ এবং ওদিক্ পরস্পরের অনুযায়ী হইলে, উহা সুখজনক হয়। বিস্তৃতির আনুষঙ্গিকতাতে যেরূপ সুখানুভব হয়, জীব-দেহের অবয়ব-বিন্যাসের প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা প্রকাশ পাইবে;

যথা, শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব ও বাম পার্শ্ব পরস্পরের অনুযায়ী হওয়াতে তাহা হইতে যেমন এক যুগল-শোভা বিনির্গত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলে সেরূপ কখনই সম্ভবে না। পুনশ্চ কোন সভামন্দিরের স্তম্ভ-শ্রেণী আনুষঙ্গিকরূপে সন্নিবেশিত থাকিলে তাহা দেখিতে কেমন মনোহর হয়; কবিতাচ্ছন্দে যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ ব্যবহৃত হয়, এখানেও তেমনি প্রতি স্তম্ভের প্রস্থায়তন হ্রস্ব এবং স্তম্ভ গুলির মধ্যগত ব্যবধানের আয়তন দীর্ঘ, এই রূপ হ্রস্ব-দীর্ঘ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রথিত দেখিতে পাওয়া যায়। আনুষঙ্গিক অবস্থা সকলের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেই যে, উহাদিগকে পরস্পরের অনুযায়ী বলিতে পারা যায়, এমন নহে; কেশজালের কৃষ্ণ বর্ণ—মুখমণ্ডলের গৌর বর্ণের অনুযায়ী হইতে পারে, চন্দ্রের জ্যোৎস্না নিশান্ধকারের অনুযায়ী হইতে পারে, এই রূপ যাহার সঙ্গে যাহা সাজে তাহাতেই তাহার আনুষঙ্গিক অনুযায়িত্ব সিদ্ধ হয়। এতদুপলক্ষে কতিপয়

মনোহর সংস্কৃত শ্লোক আছে, যথা "পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ। মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি র্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।" ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, জল দ্বারা কমল, কমল দ্বারা জল, এবং জল ও কমল উভয় দ্বারা সরোবর শোভা পায়। মণি দ্বারা বলয়, বলয়ের দ্বারা মণি, ও মণি এবং বলয় উভয় দ্বারা করদেশ শোভা পায়; ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ;—কোন সুন্দর দৃশ্য যখন আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত-রূপে বর্ত্তমান হয়, তখন তাহার ভবিষ্যৎ পরিণাম কিরূপ—তাহা দেখিবার জন্য আমাদের মনে স্বভাবতঃ কৌতূহল জন্মে। যথা;—কোন মনোহর উদ্যানে প্রবেশ করিলে, কেবল যে সম্মুখ-বর্ত্তী বর্ত্তমান দৃশ্যেতেই আমাদের মন নিযুক্ত থাকে তাহা নহে, ভবিষ্যৎ দৃশ্যটি কিরূপ হইলে ভাল হয়—তাহারও কল্পনা সঙ্গে সঙ্গে মনোমধ্যে চলিতে থাকে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান দৃশ্য যদি সেই

ভবিষ্যৎকল্পনার উপযোগী হয়, তবে তাহা যেমন সুখ-জনক হয়, তাহার বিপরীত হইলে সেইরূপ অসুখ-জনক হয়। দ্বিতীয় উদাহরণ ;—নদীর মধ্য দিয়া অর্ণব-পোত যখন সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিতেছে, তখন তদুপরিস্থ কোন অভিনব আরোহীর মন সমুদ্র দর্শনের জন্য স্বভাবতই কৌতূহলী হইতে পারে ; এতদবস্থায়, অর্ণব-পোত যত অগ্রসর হইতেছে—ততই যদি নদীর আয়তন দুই দিকে ক্রমশঃ-প্রসারিত হইতে থাকে, তাহা হইলে, সেই নদীর ভাবি পরিণাম-স্থলে যে সমুদ্র মুখ-ব্যাদান করিয়া আছে, তাহা দর্শকের মনে সহজেই কল্পিত হইতে পারে ; এখানে বর্ত্তমান-দৃষ্ট নদীর আয়তন—ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টব্য সমুদ্রের আয়তনের উপযোগী হওয়াতে, এক কথায় এই যে—নদীর আয়তন আনুশেষিক হওয়াতে, দর্শকের মনোমধ্যে কাযে কাযেই সুখানুভব হয় ; কিন্তু তাহার বিপরীতে—পুরোবর্ত্তী নদীর আয়তন যদি উত্তরোত্তর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তবে

তাহা দর্শকের মনোগত সমুদ্র-কল্পনার অনু-
কূল না হইয়া প্রতিকূল হওয়াতে, দর্শকের
মনে অবশ্যই কিছু না কিছু অসুখ বোধ হয়।

এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, ঘটনা-
সকল—ভূত-পূর্ব্ব অভ্যাস, বর্ত্তমান উত্তে-
জনা, এবং ভবিষ্যৎ চরিতার্থতার উপযোগী
হইলেই, আনুপূর্ব্বিক আনুষঙ্গিক এবং আনু-
শেষিক হইলেই, তাহা ইন্দ্রিয়-সুখের কারণ
হয়।

ইন্দ্রিয়-সুখের মোহন-শক্তি অতিশয় বি-
স্ময়-জনক;—সুরূপ, সুরস, সুগন্ধ, সুস্বর,
ইহারা বাহির হইতে আসিয়া ইন্দ্রিয়-গণকে
কেমন আশ্চর্য্য রূপে বিমুগ্ধ করে, এবং
মনোদুর্গের গুপ্ত কপাট-সকল কৌশলে উদ্ঘা-
টন করিয়া কেমন অবিবাদে তথাকার সমুদায়
প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। বাহিরের
সামগ্রী-সকল কোথা হইতে আসিয়া আমা-
দের মনের সঙ্গে এমনি আশ্চর্য্য-রূপে
মিসিয়া যায় যে, তাহাদিগকে আর পর বলিয়া
বোধ থাকে না। এই রূপ ইন্দ্রিয়-সুখ

অতীব উপাদেয় বটে তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা যে পর্য্যন্ত না আর এক উচ্চতর সুখে গিয়া পর্য্যাপ্ত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার মর্ম্মনিহিত একটি গূঢ় দোষের কিছুতেই নিরাকরণ হয় না। ইন্দ্রিয়-সুখের একটি প্রধান দোষ এই যে, তাহার উপর আমাদের কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব চলে না; বিষয়-সকল যদি অনুকূল হইল তবেই ভাল, নতুবা আমরা আপন ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়-সুখ উৎপন্ন করিতে পারি না; স্বাধীন ইচ্ছাকে অপদস্থ করিয়াই ইন্দ্রিয়-সুখ মানস-ক্ষেত্রে পদার্পণ করে; ইন্দ্রিয়-সুখে বিষয়েরই গুণ প্রকাশ পায়, আমাদের আপনাদের গুণ কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। এই হেতু আমাদের মনের বেগ ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে আরও এক উচ্চ প্রদেশে উঠিতে সর্ব্বদাই আস্ফালিত হইয়া থাকে। যখন কোন একটি মধুর গীতধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হয়, তখন কি—কেবল সেই ধ্বনি-মাত্রের প্রতি আমাদের মন বদ্ধ থাকে? কখনই না; সুশ্রাব্য ধ্বনিটি উপলক্ষ মাত্র, পরন্তু

আমাদের লক্ষ—ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার কোন কালে কোন সম্পর্ক নাই—সেই সকল অন্তর্নিহিত ভাবের দিকেই বিশেষ অনুরাগের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হয়; সেই মধুরনিনাদ কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিবামাত্র, হয় ত মনঃ-শয্যা-শায়ী কত শত ভূত-পূর্ব্ব ঘটনা শোভন-বেশে উদ্বোধিত হয়, এবং আমাদের মানস-ভৃঙ্গ সকলের মধ্য হইতে মর্ম্ম-রস চয়ন করত প্রেম-সিন্ধুতে নিমগ্ন হয়। অবশেষে ইহা বলা বাহুল্য যে, যেমন তান্ত্রিকেরা কল্পনাকে সহায় করিয়া মন্ত্র পাঠ দ্বারা পেয় সুরা শোধন করে, সেই রূপ প্রেম দ্বারা ইন্দ্রিয়-সুখ শোধিত হইলেই তাহার অন্তর্গত দোষ-সকলের খণ্ডন হইয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

উপসংহার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা এক্ষণে একত্র করিয়া সকলের সার মর্ম্মের প্রতি প্রণিধান করা যাইতেছে। আমরা বর্ত্তমান কাণ্ডের প্রথমাবধি মূল-তত্ত্ব সকল অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহার কারণ এই যে, পারমার্থিক ভক্তি-বৃত্তিকে উপযুক্ত রূপে চরিতার্থ করিতে হইলে অগ্রে তত্ত্ব-জ্ঞান আবশ্যক। তত্ত্ব-জ্ঞান যদি জন-সমাজ হইতে কোন কালে তিরোহিত হয়, তাহা হইলে ভক্তদিগের পৌত্তলিকতা এবং জ্ঞানীদিগের উপহাস, দুয়ের মধ্যে পড়িয়া ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি অচিরাৎ অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু অগ্রে যদি জ্ঞান-ক্ষেত্র যথোচিত রূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে ভক্তি-বীজ বপন করা যায়; তাহা হইলে আপাততঃ কিঞ্চিৎ কাল-বিলম্ব হইলেও, যথাকালে যখন তাহা

হইতে ধর্ম্ম-তরু উদ্ভূত হয়, তখন তাহা অতীব সতেজ হইয়া আলোকে উত্থান করে। তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রণালী অতীব সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার অনুশীলন প্রতি জনের যত্ন ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। দেকর্ত্তা নামক ফরাশিশ দেশীয় এক জন প্রধানতম পণ্ডিত, তত্ত্ব-জ্ঞানের এই একটি সঙ্কেতবচন ইউরোপ দেশে প্রচলিত করিয়া যান যে, "আমি চিন্তা করি, এই হেতু আমি আছি"। এ বচনটির বাহ্য বেশ কিঞ্চিৎ অদ্ভুত বটে; কিন্তু ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এই রূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহাতে জীবাত্মার কেবল নয়, কিন্তু পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ বিষয়েরও পথ-সন্ধান বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সংক্ষিপ্ত বচনটিকে এই রূপে বিস্তার করা যাইতে পারে, যথা,—স্বকীয় গুণ-দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, চিন্তা আত্মার স্বকীয় গুণ, এই হেতু চিন্তা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি কখন আমার মনোমধ্যে এ

রূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, আমার এই জীবাত্মা আছে কি না, তবে আমি কাহার নিকটে তাহার সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করিব ? কেহ বলেন জীবাত্মা আছে, কেহ বলেন নাই। "অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।" যিনি বলেন "জীবাত্মা আছে" তাঁহার এই কথা মাত্রে আমি যদি সায় দিয়া যাই, তবে তদ্বিষয়ে আমি নিজে কি আর জানিলাম ? যিনি বলেন "জীবাত্মা নাই" তাঁহারও কথা-মাত্রে যদি আমি সায় দিয়া যাই, তাহা হইলেও ঐ রূপ। এই রূপ করিয়া অবশেষে পাওয়া যাইবে যে, বস্তুর ও অবস্তুর ভাব কাহারও মুখের কথাতে উদ্ভূত হয় না, উহা আমাদের আপন আপন অন্তরেই রহিয়াছে; সুতরাং সংশয়-কর্ত্তার কর্ত্তব্য যে, সেই বস্তু-ভাবের সহিত আপনাকে মিলাইয়া দেখা— যে, আমি বস্তু -কি অবস্তু—আমি আছি কি নাই ? এ ভিন্ন বর্ত্তমান প্রশ্ন মীমাংসার আর উপায়ান্তর নাই। অন্যের সহিত আলাপ করিতে হইলে বাক্য ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু

আপনার সহিত আলাপ করিতে হইলে—বাক্যের অর্থ-স্বরূপ পদার্থ-সকলের—আন্তরিক তত্ত্ব-সকলের—শরণাপন্ন হইতে হয়, এখানে আর বাক্য-ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। ভাব-সাগরে সন্তরণ দিতে হইলেই বাক্যাদির অবলম্বন আবশ্যক হয়, কিন্তু ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইতে হইলে ও-সকলেতে তেমন আর প্রয়োজন থাকে না। অপিচ, সর্ব্বদাই আমরা চিন্তা করি; আমরা মনে মনে নাও যদি বাক্য উচ্চারণ করি, তথাপিও আমাদের চিন্তার বিরাম হয় না। অতএব বাক্যাদি কোন কাল্পনিক আবির্ভাবের অবলম্বন দ্বারা নহে, কিন্তু অন্তরের বাস্তবিক ভাব বা সত্তা অবলম্বন করিয়াই নিগূঢ় চিন্তা প্রবৃত্ত হয়। এই হেতু "আমি চিন্তা করিতেছি" ইহা মানিতে হইলে "আমি আছি" এই রূপ আপন সত্তাকেও সঙ্গে সঙ্গে মানিতে হয়। আবির্ভাব যেমন ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, গুণ যেমন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই রূপ চিন্তা আত্মাকেই অবলম্বন

করিয়া থাকে। পুনশ্চ, আপন সত্তাকে মানিতে হইলে, পরম সত্তা পূর্ণ-সত্তা ও মূল-সত্তা পরমেশ্বরকে মূলাধার বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। কারণ,—সামান্য-বিশেষ, বস্তুগুণ, কার্য্য-কারণ, এই যে তিনটি ভাব, ইহারা, একমেবাদ্বিতীয়ং পরম-বস্তু ও মূল-কারণ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক, আমাদের আত্মাতে ভাব-রূপে এবং জড় জগতে অন্ধ প্রকৃতি রূপে বিতরিত হওয়াতেই, আমরা আপন আপন সত্তা উপলব্ধি করিতেছি এবং জড় বস্তু-সকল অচেতন হইয়াও সচেতনের ন্যায় যথা-নিয়মে কার্য্য করিতেছে। অতএব "আমি আছি কি না" এ প্রশ্ন মনুষ্য-বিশেষকে বা গ্রন্থ-বিশেষকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা, কেবল—অন্তরতম পরমাত্মার মুখ-জ্যোতিতেই এ প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা হইতে পারে, অন্য কোন রূপেই নহে।

মনুষ্যের ভোগ্য সামগ্রী তিন প্রকার—বিষয়-সুখ আত্মপ্রসাদ এবং ব্রহ্মানন্দ; ইহার মধ্যে বিষয়-সুখের সঙ্গে দুঃখ রহিয়াছে,

আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বিষাদ রহিয়াছে, কেবল ব্রহ্মানন্দই কণ্টক-শূন্য। বিষয়-সুখ—সমুদায় আত্মাতে নহে—কেবল আত্মার বৃত্তি-বিশেষেই অধিকার পায়; যে সময়ে এক বৃত্তির উত্তেজনা, সে সময়ে অপরাপর বৃত্তি-সকলের অবমাননা,—বিষয়-সুখ দ্বারা আত্মার মধ্যে এই রূপ গৃহ-বিচ্ছেদের সূত্র-সকল সমানীত হয়। বিষয়ের দুর্নিবার উত্তেজনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যত আমরা স্ববশ হই, ইন্দ্রিয়-সুখ অতিক্রম করিয়া যত আমরা বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে অগ্রসর হই, ততই আত্মপ্রসাদ আসিয়া আমাদের অন্তরাকাশে শুভ্র জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে। কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি যে-হেতু কোন কালেই আমাদের হস্তগত হইতে পারে না, এই হেতু বৈরাগ্য-জনিত বিষাদ আত্ম-প্রসাদকেও সময়ে সময়ে রাহু-গ্রস্ত করিতে সুযোগ পায়। ইন্দ্রিয়-সুখের যে কিছু গূঢ় অভাব, প্রেম দ্বারা তাহা আপূরিত হইতে পারে,—সত্য; ইহা সত্য যে, আমরা প্রেমে অত্যন্ত মগ্ন হইলে ইন্দ্রিয়-

জনিত দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়া থাকিতে পারি—এমন কি প্রেমের জন্য আবশ্যক হইলে মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত না হইতে পারি। কিন্তু এই মনুষ্য জীবনে এরূপ আন্তরিক প্রেম কি কখন সুলভ হইতে পারে? অপিচ সৃষ্ট জীবের পক্ষে কোন কালেই কি এরূপ সম্ভবে যে, প্রেমের যৎপরোনাস্তি পরাকাষ্ঠা অভ্যুদিত হইয়া তাহার সমুদায় অভাবকে একেবারে গ্রাস করিয়া বিলুপ্ত করিয়াছে? কখনই না। পূর্ণ প্রেমের প্রস্রবণ কেবল একমাত্র পরব্রহ্মেতেই সংগোপিত রহিয়াছে, আর কাহারও তথায় উত্তীর্ণ হইবার সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সুখের আনুষঙ্গিক অভাব-সকল প্রেম দ্বারা কথঞ্চিৎ পূরিত হইতে পারে—সত্য; কিন্তু আমাদের প্রেমের এই যে অভাব—যে, উহা পরিমিত, এ অভাব কি প্রকারে পূর্ণ হইবে? ইহার এক মাত্র উপায়—ঈশ্বরোপাসনা; আমরা আপনার ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া যদি সেই অক্ষয় আনন্দ-স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য

নিবিষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের নিত্য শান্তি হয়—অন্য কোন প্রকারেই নহে। ঈশ্বরের প্রসন্নমুখ-সন্নিধানেই,—ছল নাই, চাতুরী নাই, কপটতা নাই, ঠিক আমরা যে রূপ সেই রূপ হইয়া অনুপম আনন্দ ও শান্তি লাভে কৃতার্থ হইতে পারি।

উপরের পরিচ্ছেদে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, বিষয়-সুখ এরূপ পরিমিত সামগ্রী যে, তাহা দ্বারা আত্মার ক্ষণোত্তেজিত বৃত্তিবিশেষ ভিন্ন আমাদের সমুদায় আত্মা কখনই চরিতার্থ হইতে পারে না। বিষয়-সুখের এই রূপ লক্ষণ করা যাইতে পারে যে, কতকমাত্রায় সুখ—যাহার চারি দিক্ দুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত; যথা, ভোজন করিবার যে সুখ তাহা অতি অল্প ক্ষণেই অবসান হইয়া যায়, সুতরাং ভোজন সুখই যাহার সর্ব্বস্ব, তাহার পদে পদে দুঃখ গ্রথিত রহিয়াছে। বিষয়-সুখের চারি দিকের এই যে অভাব, ইহা কেবল বিশুদ্ধ প্রেম ও আত্ম-প্রসাদ-দ্বারাই অপহৃত হইতে পারে, বার-

ম্মার বিষয় ভোগ দ্বারা নহে ; "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণ-বর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" মনুষ্য-সমাজের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র কটাক্ষপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যেরা অধিকাংশ কাল সাংসারিক কিম্বা সামাজিক আলাপ ও অনুষ্ঠান লইয়াই ব্যাপৃত থাকে,—ভোজনাদির সুখ ভোগে অতি অল্প ক্ষণই নিমগ্ন থাকে ; এই রূপ আলাপ এবং অনুষ্ঠানকে প্রকৃত রূপে নির্ব্বাহ করা, অন্ধ প্রবৃত্তির কার্য্য নহে, ইহাতে ধর্ম্ম-বুদ্ধির আবশ্যকতা হয় : এবং প্রবৃত্তির প্রতিকূলে আমরা ধর্ম্ম-পথে যত অগ্রসর হই, তত আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচালনা হয় ও আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হয় : এবং এই বিশুদ্ধ প্রেম ও আত্মপ্রসাদ হৃদয়াভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকিলে বিষয়-সুখের অস্ত-গমন-সময়েও দুঃখান্ধকার তথায় অধিকার পায় না। কিন্তু ইহারও উপরে আরও এই দেখা যায় যে, নিগূঢ় অধ্যাত্ম-যোগে আমাদের প্রেম যেমন প্রকৃত

রূপে চরিতার্থ হয়, সামাজিক আলাপাদিতে উহা সে রূপ হইতে না পারিয়া অচিরাৎ খিন্ন হইয়া পড়ে। সীমা-বিশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা শীঘ্রই পুরাতন হইয়া যায়; কিন্তু অসীম প্রত্যহই নূতন। কেহ যাহা চক্ষে দেখে নাই, কর্ণে শুনে নাই,—অসীমের মধ্যে সেই সকল প্রেমের ব্যাপার গূঢ় ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। একটি সুমধুর গীত আমাদের কর্ণে সুধা ঢালিয়া চলিয়া যায়, আর—আমাদের মন অমনি অসীমের দিকে চক্ষু ফিরায়। একটি কোন নূতন আনন্দ উপস্থিত হয়; অমনি, অসীম কোথায়—তাহার তত্ত্ব জানিতে মনশ্চক্ষু চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়। এই রূপ, যাহা কিছু নূতন, যাহা কিছু আশ্চর্য্য, যাহা কিছু অসাধ্য-সাধন, সকলই আমাদিগকে অসীমের দিকে লইয়া যাইতে—প্রস্তুত বিমানের ন্যায়—উদ্যত রহিয়াছে। সীমা-বিশিষ্ট বস্তু-সকল আমাদের প্রেম-ক্ষুধার উদ্দীপন করিতে পারে বটে; কিন্তু অসীম ব্যতীত আর কেহই সে ক্ষুধার শান্তি

করিতে পারে না। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব। অধ্যাত্ম-যোগ তিন প্রকার,—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, এবং কর্ম্ম-যোগ। জ্ঞান-যোগ—যোগের প্রথম সোপান, এই জন্য ইহাতে যোগের ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে বর্ত্তে। পরমাত্মা, জীবাত্মা, জড় বিষয়,—এ সকল তত্ত্ব জ্ঞান-চক্ষুর গোচরে পরস্পর হইতে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। ভক্তি-যোগ—যোগের দ্বিতীয় সোপান; ইহাতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ, এবং জীবাত্মার সহিত বিষয়ের যোগ, সুন্দর-রূপে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু এখানেও যোগ সম্পূর্ণ হয় না। ভক্তি-যোগের প্রণালী এই যে, যখন ঈশ্বরকে ভজনা করিতেছি, তখনকার সে ভাব স্বতন্ত্র; এবং যখন সংসারে লিপ্ত হইতেছি, তখনকার ভাব স্বতন্ত্র; সুতরাং অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ এবং সংসার-সম্বন্ধ, এ দুই সম্বন্ধ ভক্তি-যোগেও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। জ্ঞান-

কাণ্ডে তত্ত্ব-সকল বিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল, ভক্তি-কাণ্ডে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল ; কিন্তু ইহাতেও আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক এই দুই প্রকার সম্বন্ধের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পরন্তু আমরা যদি অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ অনুসারে সংসার-সম্বন্ধ-সকলকে নিয়মিত করিতে পারি, তাহা হইলে যোগের কথিত অভাবটি আর থাকিতে পায় না, তাহা হইলে অধ্যাত্ম-যোগ ও সংসার-যোগ উভয়ই একতানে মিলিত হইয়া মুক্তির পথকে অতীব পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। অবশিষ্ট কর্ম্ম-কাণ্ডে অধুনোক্ত বিষয় আরও সুস্পষ্ট হইবে। এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহা এই রূপে সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যথা—

জ্ঞাতব্য বিষয়...পরমাত্মা জীবাত্মা বাহ্যবস্তু

ভোক্তব্য বিষয়...আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বৈষয়িক সম্বন্ধ

কর্ত্তব্য বিষয়.........উভয়ের মধ্যে যোগ-সংস্থাপন

ইহার মধ্যে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের মূল-তত্ত্ব জ্ঞান-কাণ্ডে সমালোচিত হইয়াছে, ভোক্তব্য

বিষয়ের মূল আদর্শ অধুনা সমালোচিত হইল. কর্ত্তব্য বিষয়ের মূল নিয়ম কর্ম্মকাণ্ডে সমালোচিত হইবে।

ইতি ভোগ-কাণ্ড সমাপ্ত।

কর্ম্মকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনা কেবল এই জন্য উপ-কারী যে, তাহাতে আমাদের তর্ক-শক্তি বিশেষ-রূপে মার্জ্জিত ও পরিস্ফুট হয়; কিন্তু, তাহাতে যে আমাদের জীবনের প্রতি কোন ফল দর্শে, ইহা কেহই স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, যাঁহারা তর্ক শিক্ষা করিতে অভিলাষী হন, তাঁহারা ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন, তাহা হইলেই তাঁহা-দের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে; কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা তাঁহাদের সে পথে কিছুই সাহায্য দিতে পারিবে না, বরং নানা রূপ বাধা আনিয়া ফেলিবে। তত্ত্ব-বিদ্যার প্রণালী এই যে, ঈশ্বর-প্রসাদাৎ আমরা যাহা কিছু জানি, তাহার

প্রতি যেন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি; এবং আমাদের যাহা বিশ্বাস, তদনুযায়ী যেন কার্য্য করি। পরন্তু তর্ক-শিক্ষার প্রণালী এই যে, মূল-তত্ত্ব-বিষয়ে আমরা যাহা কিছু জানি তাহাতে যেন সংশয় করি; সংশয় অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য চলিতে পারে না, সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের কার্য্য, ভগ্ন-কর্ণ তরীর ন্যায় অতীব অনিয়মে চলিতে থাকে। অতএব তত্ত্ববিদ্যা এবং তর্কশাস্ত্র উভয়কে এক দৃষ্টিতে দেখা অতীব ভ্রম, তাহার আর সন্দেহ নাই। উদাহরণ;—তত্ত্ব-বিদ্যা বলেন, "আমি আছি"—ইহা আমরা, তর্ক দ্বারা নহে কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদাৎ, জানিতেছি; এসো ইহাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি, অতঃপর এসো আমরা সেই বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করি,—অর্থাৎ জড়পদার্থের নিয়মানুসারে নহে কিন্তু আত্মার নিয়মানুসারে কার্য্য করি—পশুবৎ নহে কিন্তু মনুষ্যোচিত কার্য্য করি। তর্ক-বুদ্ধি বলেন, "আমি আছি"—এই এক তথ্য যাহা আমরা জানিতেছি, এসো ইহার প্রতি আমরা সংশয়

করি, কার্য্যের জন্য ভাবিতে হইবে না, কার্য্য—দেহাদির অবস্থানুসারে আপনা আপনি চলিতে থাকিবে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, তর্ক বিতর্কেরই কার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন যোগ নাই, প্রত্যুত তত্ত্ব-বিদ্যার—কার্য্যের সহিত অব্যবহিত যোগ রহিয়াছে। পুনশ্চ তত্ত্ব-বিদ্যার সিদ্ধান্ত-সকলের সত্যতার ইহা একটি সামান্য প্রমাণ নহে যে, সে-সকলেতে আমরা অন্তঃকরণের সহিত বিশ্বাস করিতে পারি ও সেই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া আমরা বলের সহিত কার্য্য করিতে পারি। পরন্তু শুদ্ধ কেবল তর্ক বিতর্কের সিদ্ধান্ত সকলেতে আমরা কখনই অন্তঃকরণের সহিত সায় দিতে পারি না, এবং তদনুসারে স্থির-ভাবে কার্য্য করিতেও সমর্থ হই না। ইহার উদাহরণ ;—আত্মা এক, ভাবাত্মক, স্বাধীন,—এই এক জ্ঞান যাহা আমাদের অন্তরে রহিয়াছে, ইহাতে আমরা অক্ষুব্ধ-চিত্তে বিশ্বাস করিতে পারি, এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে যত্ন করিলে অবশ্যই আমরা

মঙ্গলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হই। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে, আত্মা এক নহে, ভাবাত্মক নহে, স্বাধীন নহে, এরূপ সহস্র সহস্র তর্ক উত্থাপিত হইলেও তাহাতে আমাদের অন্তঃকরণের বিশ্বাস কখনই সায় দিবে না, এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে গেলেই তাহার অকিঞ্চিৎকরতা তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইবে।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানের মূলতত্ত্ব-সকল অবধারিত হইয়াছে, ভোগকাণ্ডে ভাবের মূল-আদর্শ-সকল নিরূপিত হইয়াছে, এক্ষণে কার্য্যের মূল নিয়ম কি কি তাহারই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নিয়মান্বেষণের প্রণালী।

নিয়ম-সকল অনুধাবন করিবার প্রণালী দুই রূপ, এবং তদনুসারে দুইটি নাম দ্বারা

তাহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক্ রূপে চিহ্নিত করা যাইতে পারে, যথা,—একের নাম আরোহিকা, অন্যের নাম অবরোহিকা। বিশেষ বিশেষ নিয়মিত ঘটনা-সকল অবলম্বন-পূর্ব্বক উত্তরোত্তর সাধারণ নিয়ম-রাজ্যে আরোহণ করিবার যে প্রণালী—আরোহিকা নাম তাহারই প্রতি বর্ত্তিতে পারে; এবং সাধারণ নিয়ম হইতে নিয়মিত ঘটনা-সকলে অবতরণ করিবার যে প্রণালী, তাহাই অবরোহিকা নামের অভিধেয়। ইহার মধ্যে আরোহিকা-প্রণালী—ভৌতিক নিয়ম-সকলের অনুসন্ধান-কালেই বিশিষ্ট রূপে উপকারে আইসে, এবং অবরোহিকা-প্রণালী আধ্যাত্মিক নিয়ম-সকলেতেই বিশিষ্ট রূপে সংলগ্ন হয়। আমরা দেখি যে, ইষ্টক প্রস্তর ও আর আর সামগ্রী স্ব স্ব অবলম্বন হইতে বিচ্যুত হইলে ধরাভিমুখে নিপতিত হয়, ইহা হইতে আমরা এই এক নিয়ম আহরণ করিয়া লই যে, পৃথিবীর উপরে যত কিছু সামগ্রী আছে—সকলকেই পৃথিবী আপনার দিকে আকর্ষণ

করে। এস্থলে কেবল ইষ্টক প্রস্তর প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তুরই অধঃপতন দৃষ্টি করা হইল, কিন্তু নিয়ম যে-টি নির্দ্ধারিত হইল তাহা নির্ব্বিশেষে তাবৎ বস্তুরই অধঃ-পতনের কারণোপযোগী। এই রূপ বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরীক্ষা হইতে সাধারণ নিয়ম-সকলে উত্থান করিবার যে প্রণালী, যাহার নাম আরোহিকা রাখা গেল, তাহা ভৌতিক কার্য্য সম্বন্ধেই বিশেষ-রূপে ফলদায়ক হয়। অপর, নিয়মিত বিষয়-সকল হইতে নিয়মে আরোহণ না করিয়া, আমরা যখন নিয়ন্তা বিষয়ী হইতে নিয়মে অবরোহণ করি, তখনকার এই যে অবরোহিকা-প্রণালী, ইহা আধ্যাত্মিক নিয়মান্বেষণের পক্ষেই বিশেষ রূপে ফল-দায়ক হয়। আধ্যাত্মিক নিয়ম দুই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, মিশ্র এবং বিশুদ্ধ; যথা,—যদি এ রূপ একটি নিয়ম করা যায় যে, আমি অমুক সময়ে আহার করিব, তবে তাহাতে বুঝায় যে,—প্রথমতঃ আমি আরো-হিকা-প্রণালী দ্বারা এই নিয়মটি অবধারণ করি-

য়াছি যে, ঐ সময়ে আহার করিলে শরীর ভাল থাকে, দ্বিতীয়তঃ অবরোহিকা-প্রণালী দ্বারা এই নিয়মটি ধার্য্য করিয়াছি যে, যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য; এই উভয় নিয়মের সাম্মিশ্র হইতেই এই নিয়মটি উৎপন্ন হইতে পারে যে, " আমি অমুক সময়ে আহার করিব", এই জন্য এ নিয়মটির প্রীতি মিশ্র উপাধি সম্যক্ রূপে সংলগ্ন হয়। পরন্তু, আমার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য, এ নিয়মটি কোন ভৌতিক ব্যাপার হইতে নহে কিন্তু কেবল-মাত্র আত্মা হইতেই উদ্ভাবিত হইয়া থাকে; অমুক সময়ে আহার করিব, এ নিয়ম কিছু সকলের পক্ষে সকল অবস্থাতে সংলগ্ন হয় না; কিন্তু " আমার যাহাতে মঙ্গম হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য" এ নিয়মটি সকল আত্মা হইতে সকল অবস্থাতেই নিরন্তর উদীরিত হইতেছে; পূর্ব্বের ঐ নিয়মটির কিয়-দংশ ভৌতিক পরীক্ষা হইতে সংকলিত হই-য়াছে, কিন্তু শেষের এ নিয়টিকে আত্মা স্বয়ং

উৎপাদন করিয়া কার্য্য-সকলেতে বহমান করিতেছে। আরোহিকা এবং অবরোহিকা প্রণালীর আর এক যোগ্যতর নাম রাখা যাইতে পারে, যথা,—সংকলন-প্রণালী এবং ব্যবকলন-প্রণালী; অনেক বিশেষ বিশেষ দৃষ্ট ঘটনা হইতে এক এক সাধারণ নিয়ম সংকলন করিবার যে প্রণালী, সংকলন-প্রণালী বলাতে তাহা স্পষ্ট রূপে বোধগম্য হইতে পারে; এবং নিয়ন্তা হইতে নিয়ম দোহন করিবার যে প্রণালী, ব্যবকলন-প্রণালী বলাতে তাহা স্পষ্ট রূপে অভিজ্ঞাত হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়।

মঙ্গলের কর্ত্তব্যতা।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, ব্যব কলন-প্রণালী অনুসারেই মূল নিয়ম-সকলের

সন্ধান করিতে হইবে ; বাহিরের ঘটনা-সকল হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আত্মার প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে।

আত্মা যে নিয়মটি প্রকাশ করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক, তাহা এই,—যে যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই কর্ত্তব্য। এ নিয়মটি সর্ব্ববাদি-সম্মত ; কিন্তু ইহার মধ্যেও বিবাদের এই এক সূত্র সংগোপিত রহিয়াছে যে, মঙ্গল যে কি—এ বিষয়ে নানা ব্যক্তির নানা মত হইবার কিছুই বাধা নাই। এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সত্য কি? তাহা হইলে আপাততঃ তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ্‌ জীব, জন্তু, এ সকলই সত্য ; কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে পরম সত্য কি? তবে তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, পরমাত্মাই কেবল এক মাত্র পরম সত্য। এই রূপই বলা যাইতে পারে যে, নিয়মিত আহার, নিদ্রা, আচার, ব্যবহার, এ সকলই মঙ্গল ; কিন্তু ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে, যাহার গুণে

আমরা তাঁহার প্রেমময় সন্নিধানে ক্রমশ আকৃষ্ট হইতেছি, তাহাই প্রধানতম মঙ্গল, ও পরম মঙ্গল; এবং এই মঙ্গলের সহিত যাহার যে পরিমাণে যোগ, তাহা সেই পরিমাণেই মঙ্গল। আপনার যাহাতে মঙ্গল হয়, সকল আত্মাই এই রূপ নিয়মে কার্য্য করে; সুতরাং একমাত্র যাঁহার নিয়মের অধীন হইয়া সকল আত্মা ঐ রূপ মঙ্গল-নিয়মে কার্য্য করিতেছে, তিনি অবশ্য সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-স্বরূপ। মঙ্গল-নিয়ম—পরমাত্মা কর্ত্তৃক আমাদের আত্মাতে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, এবং তাহারই গুণে আমরা আবার স্বীয় স্বীয় বিষয়-কার্য্য-সকল মঙ্গল-নিয়মে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছি। আমাদের আত্মাকে বিষয়-পিঞ্জর হইতে নির্মুক্ত করত তাহাকে একবার স্বাধীনতা দিয়া দেখা উচিত যে, সে আপন নিয়মে কিরূপ কার্য্য করে; ধৃত পক্ষী যেমন পিঞ্জর হইতে নিষ্কৃতি পাইলে প্রথমে সে অগম অরণ্য-নিকেতনের মধ্যে গিয়া নিমগ্ন হয়, পরে তাহার

যথার্থ গীতধ্বনি সেখান হইতে নিজ মূর্ত্তিতে নিঃসারিত হইতে থাকে,—সেই রূপ আত্মা স্বাধীনতা পাইলে প্রথমে সে অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মাতে গভীর নিমগ্ন হয়, তাহার পরে তাহা হইতে প্রকৃত মঙ্গল কার্য্য-সকল সংসার-ক্ষেত্রে অনর্গল নিঃসারিত হইতে থাকে।

অতএব মঙ্গল কি—জানিতে হইলে, প্রথমে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের মধ্যে তাহার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ জীবাত্মা স্বীয় বিষয়-কার্য্যেতে সেই মঙ্গলের ভাব কিরূপে প্রয়োগ করে তাহার প্রতি দৃষ্টি করা বিধেয়; অবশেষে অজ্ঞান প্রকৃতি মঙ্গলের পক্ষে কিরূপ উপযোগী তাহা নিরূপণ করিবার সদুপায় হইতে পারিবে। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ-স্থলে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে পারমার্থিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে; জীবাত্মার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ-স্থলে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে, তাহাকে স্বার্থিক মঙ্গল

বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে ; এবং অজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে প্রাকৃতিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

পারমার্থিক মঙ্গল এবং তদনুযায়ী

মূল-নিয়ম।

আমাদের মধ্যে যাহার যে কিছু মঙ্গল ভাব রহিয়াছে তাবতেরই মূল পরমাত্মা, ইহা আমরা জ্ঞানে জানিতেছি এবং জ্ঞানের এ বাক্যটিতে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাও স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইতেছে ; এই জন্য আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, আমরা আপনা আপনাকে ঈশ্বরের সেই মঙ্গল ইচ্ছাতে অসংকোচে সমর্পণ করি,—এই রূপ মনে করিয়া যে, তাঁহার যাহা ইচ্ছা সেই অনু-

সারে তিনি আমাদিগকে নিয়মিত করুন।
এই রূপ, জ্ঞানের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত,
ইচ্ছার সহিত, ঈশ্বর কর্ত্তৃক মঙ্গল নিয়মে
নিয়মিত হওয়া---জ্ঞানবান্ আত্মা মাত্রেরই
প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের এরূপ যোগ
রহিয়াছে যে, আমরা যত স্বাধীন হইব তত
তাঁহাকে চাহিব; কেননা, আমরা যদি স্বাধীন
হইলাম, তবে যিনি সর্ব্বতোভাবে আমাদের
মঙ্গল চাহেন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা আর
কাহাকে চাহিব? পুনশ্চ যাহা বিশুদ্ধ-রূপে
আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা—ঈশ্বরের ইচ্ছাই
তাহার মূল; যথা, "আমার মঙ্গল হউক" এ
ইচ্ছাটি আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা (কেন না আত্মা
স্ববশ হইলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল চাহে না),
সর্ব্বমঙ্গলাকর পরমেশ্বরই আমাদের প্রত্যে-
কের এই স্বাধীন ইচ্ছাটিকে নিয়ত উদ্দীপন
করিতেছেন, তাই আমাদের এ ইচ্ছা রাশি
রাশি বিপদের তরঙ্গ-মধ্যেও নির্ব্বাপিত হয়
না;—সহস্র দুর্ব্বিপাকের মধ্যে পড়িলেও

কোন মনুষ্যই ভিতরে ভিতরে মঙ্গল চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হয় না।

প্রতি আত্মাতেই যে ঈশ্বর-প্রদত্ত মঙ্গল ভাব নিগূঢ় আছে. ইহা সত্য কি মিথ্যা জানিতে হইলে কোন পুস্তকে বলিয়াছে কি না বলিয়াছে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া—একেবারেই আমাদের স্ব স্ব আত্মাতে দৃষ্টি করা বিধেয়। কেন না আত্মা হইতে ব্যবকলন করিয়া আমরা যে কোন সত্য প্রাপ্ত হই তাহারই প্রতি আমরা নিরুদ্বেগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি; পরন্তু এখান-ওখান হইতে সংকলন করিয়া আমরা যে সকল মতামত ধার্য্য করি, তাহা যেমন সত্য হইতে পারে তেমনি অসত্যও হইতে পারে, সুতরাং তাহা কখনই সম্যক্ রূপে বিশ্বাস্য হইতে পারে না। মঙ্গল-ভাব যদিও আমাদের আপন আপন আত্মাতেই রহিয়াছে, তথাপি যে আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না—ইহার অবশ্য কারণ আছে, যথা;—

আমাদের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে

দুই রূপ মঙ্গল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এক রূপ মঙ্গল ভাব এই যে, তাহার পদে পদে বাধা বিঘ্ন, চতুর্দ্দিকে প্রতিবন্ধক,—কোথাও প্রলোভন কুহক-জাল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, কোথাও বিভীষিকা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, কোথাও জটিল হৃদয়-গ্রন্থি পথ-রোধ করিয়া রহিয়াছে। এই প্রকার মঙ্গল ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই সচরাচর বলা গিয়া থাকে যে, শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি ; রাশি রাশি বাধা বিঘ্ন দ্বারা ইহা এমনি প্রপীড়িত হইয়া আছে যে, ইহাকে দেখিতে পাওয়াও একটি সহজ ব্যাপার নহে,—মোহ শোক ভয়ের পর্ব্বত-রাশি ভেদ করিয়া তবে ইহাকে দেখিতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার মঙ্গল ভাব এই যে, তাহাতে কিছু মাত্র বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, তাহা অতীব পরিশুদ্ধ। আমাদের এই পৃথিবীটির আদিম অবস্থায় আমরা যদি ইহার উপরে উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে ইহার মুখশ্রী এখনকার মত এরূপ হইবার পক্ষে কি না ভয়ানক প্রতিবন্ধক-সমূহ আমাদের নেত্র-

গোচর হইত? কিন্তু সে কালের সেই সকল ভূত-সংগ্রাম কি মঙ্গলের কর্ণকে বধির করিতে পারিয়াছিল?—না মহাভূত সকলের প্রবল প্রকোপ মঙ্গলের হস্তকে রোধ করিতে পারিয়াছিল? এই প্রকার এই যে প্রভূত মঙ্গল ভাব, ইহা নিঃশঙ্কে ও নিরুদ্বেগে সমুদায় জগতের উপরে নিয়ত কার্য্য করিতেছে,—কোন বাধা মানে না, বিঘ্ন মানে না, ও স্বকার্য্য-সাধনে কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। সকল নিয়মেরই উপরে এই মঙ্গলের নিয়ম রহিয়াছে, কিন্তু ইহার উপরে আর কাহারও নিয়ম নাই। এক্ষণে বলা বাহুল্য যে, প্রথম প্রকার পরিমিত মঙ্গল ভাব—জীবাত্মার, ও দ্বিতীয় প্রকার সর্ব্বমঙ্গল ভাব—পরমাত্মার; এবং এই দুয়ের মধ্যে এই রূপ সম্বন্ধ যে, জীবাত্মার মঙ্গল ভাব যে পর্য্যন্ত না পরমাত্মার মঙ্গল ভাবের সহিত আপনার যোগ সংস্থাপন করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত উহা সংসার-ভারে প্রপীড়িত হইয়া এরূপ মৃতবৎ হইয়া থাকে যে, উহা আছে কি নাই তাহা লক্ষ্য হওয়াই দুষ্কর।

দর্শন-শাস্ত্র-বিশেষের আলোচনা দ্বারা আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, যত আমরা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইব ততই আমাদের স্বাধীনতার নির্ব্বাণ হইবে; কিন্তু সত্য এই যে, যত আমরা ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান-প্রেম-ইচ্ছাতে সম্মিলিত হইব ততই আমরা স্বাধীন হইব। শিশু যেমন মাতার ক্রোড়ে গিয়া স্বাধীন হয়, বালক যেমন ক্রীড়াক্ষেত্রে গিয়া স্বাধীন হয়, যুবা যেমন বয়স্য-দলের মধ্যে গিয়া স্বাধীন হয়, জীবাত্মা সেই রূপ পরমাত্মার সন্নিধানে গিয়া স্বাধীন হয়। স্বাধীন ইচ্ছা যে কি-রূপ—এক্ষণে তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

আত্মার অভ্যন্তরে স্বাধীন ইচ্ছার অবয়ব অন্বেষণ করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রথমতঃ আত্মামাত্রেই অগ্রে নিয়ম স্থির করে পশ্চাৎ সেই নিয়ম পালন করে—এই রূপে কার্য্য করে। যথা, আমি যদি অগ্রে এই রূপ নিয়ম করি যে, "আমি চলিব" এবং পশ্চাৎ যদি সেই নিয়ম পালন

করি অর্থাৎ তদনুসারে চলি, তবেই সেই কার্য্যকে বলা যাইতে পারে—আত্মার কার্য্য, কি না আমার আপনার কার্য্য; কিন্তু যদি আমি সুষুপ্তি-অবস্থায় শয্যা ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন করি, তাহা হইলে সে কার্য্য আমার আপন নিয়মানুসারে না হওয়াতে তাহা কখনই আমার আত্মার কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইলে. জ্ঞান ও বিশ্বাসের অনুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য,—কর্ত্তব্যের ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ মূল-নিয়ম। স্বাধীন শব্দের অর্থ আপনার অধীন—আত্মার অধীন; যে ইচ্ছা আত্মার অধীন তাহা কাযেই আত্মার নিজের গুণ-সকলের সহিত ঐক্য হইতে চায়; ইচ্ছা ব্যতিরেকে আত্মার আর দুইটি গুণ—জ্ঞান এবং প্রীতি; অতএব স্বাধীন ইচ্ছার একটি অব্যর্থ লক্ষণ এই যে, তাহা জ্ঞান ও প্রীতি শ্রদ্ধাদি ভাবের সহিত স্বভাবতই ঐক্য হয়। এই জন্য কোন প্রাচীন ঋষি তৈত্তিরীয় উপনিষদের

এক স্থানে এই রূপ কহিয়াছেন যে, “ শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং” শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না ;— শ্রদ্ধার সহিত দান করাই যে স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য এবং অশ্রদ্ধার সহিত দান করা যে সে রূপ নহে, ইহা সকল মনুষ্যেরই মনে স্বভাবতঃ প্রতীয়মান হয়। অতএব সত্য-জ্ঞান-মূলক শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের অনুযায়ী আচরণকেই স্বাধীন কার্য্য বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে ইহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইবে যে, ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে যখন আমাদের শ্রদ্ধা রহিয়াছে, তখন তাঁহাতে আত্মা সমর্পণ করাই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য এবং তাহার বিপরীতাচরণ করাই পরাধীনতার লক্ষণ।

আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের যাহা প্রধান লক্ষ্য তাহাকেই যেমন বলা যায়—পারমার্থিক সত্য, সেইরূপ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার যাহা প্রধান লক্ষ্য তাহাকেই বলা যায়—পারমার্থিক মঙ্গল। আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান

যেমন দেখাইয়া দেয় যে, সকলের মূলে এক জন মহান্ পুরুষ বর্ত্তমান আছেন—যিনি পরম সত্য; সেইরূপ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা চাহে যে, সকলের উপরে এক জন বিধাতা পুরুষের বর্ত্তমান থাকা উচিত—যিনি সর্ব্বতো-ভাবে মঙ্গল স্বরূপ,—সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে যিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন। ঈশ্ব-রের সহিত যোগেই আমরা স্বাধীন হই; এই হেতু আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা হইতে যে কোন নিয়ম স্বতঃ উদীরিত হয়, তাহা ঈশ্ব-রের ইচ্ছাকেই জ্ঞাপন করে; এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা-মূলক আমাদের এই যে স্বাধীন ইচ্ছা ইহা-দ্বারা যে সকল নিয়ম প্রকটিত হয়, তাহাই ন্যায় ও ধর্ম্মের নিয়ম। অন্তরতম পরমাত্মার সহিত নিগূঢ় সহবাসে আত্মা যখন পরিতৃপ্ত হয়, তখন বিষয়ের আকর্ষণ তাহার উপরে বল করিতে পারে না; এই হেতু এ অবস্থায় আত্মা বিষয় হইতে নিয়ম ভিক্ষা করে না কিন্তু ঈশ্বর-দত্ত আপন অকৃত্রিম স্বভাব হইতে নিয়ম উদ্ভাবন করে,—পরমাত্মা হইতেই নিয়ম

চাহিয়া পায়। ধর্ম্মের নিয়ম কি? ইহার তথ্য নির্ণয় করিতে গেলে এক দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যা কহিবে না, অন্যের ধন অপহরণ করিবে না, ব্যভিচার করিবে না,—ধর্ম্মের নিয়ম এইরূপ বহুসংখ্যক কিন্তু আর এক দিকে দেখিলে, উক্ত তাবতের সার এই একটি মূলনিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া পবিত্র হইবে। আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার সার্ব্ব-লৌকিক মঙ্গল ভাব যাহা আমরা উপলব্ধি করি, তাহা যে এখানে আছে ওখানে নাই, এ জীবে আছে ও জীবে নাই, এ মনুষ্যে আছে ও মনুষ্যে নাই, এমন কদাপি নহে;—তাহা সর্ব্বত্র-গামী,—তাহা আত্মপর-নির্ব্বিশেষ। ঈশ্বরের হস্ত হইতে এই রূপ সার্ব্ব-লৌকিক মঙ্গল-রস পান করিয়াই সাধু মহাত্মারা স্বাধীন হন,—স্বাধীন হইয়া কি করেন? না—কেবল আপনার আপনার মঙ্গল নহে, কিন্তু মঙ্গল—যাহা আত্মপর-নির্ব্বিশেষ, তাহারই অনুষ্ঠানে

সচেষ্ট হন ; ঈশ্বরের মঙ্গল-সন্নিধানের গুণে নির্ভয় হইয়া, তাঁহারা মঙ্গল সাধন কার্য্যে সর্ব্বদাই এরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকেন যে, যখনই কোন মঙ্গল কার্য্য তাঁহারদের সামর্থ্যের মধ্যে আইসে, তখনই তাঁহারা সুবিবেচনা ও সুনিয়ম পূর্ব্বক তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করেন। কারণ, ঈশ্বরের উপাসনা-জনিত যাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাসটি দৃঢ় হইয়াছে যে, ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করিবেনই, তিনি কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য কেন না সযত্ন হইবেন। এই রূপে যাঁহারা স্বাধীন ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের হইয়া কার্য্য করেন—যাঁহারা কেবল আপনার আপনার নহে কিন্তু জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁহারা আপনাকে যেমন প্রতারণা করেন না, পরকেও সেই রূপ প্রতারণা করেন না; আপনার অধিকারকে যেমন অবহেলা করেন না, পরের অধিকারকেও সেই রূপ অমান্য করেন না ; আপনাকে যেমন বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন, পরকেও সেই রূপ বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে

দেখেন,—তাঁহারা স্বভাবতই এই প্রকার আচরণ করেন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে. মিথ্যা কহিবে না, পরের ধন অপহরণ করিবে না. ব্যভিচার করিবে না, এ সকলই এই এক মূল-নিয়ম হইতে ব্যবকলন করিয়া পাওয়া যায় যে, সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরেতে শ্রদ্ধার সহিত আত্ম-সমর্পণ করিবে। "যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

পঞ্চম অধ্যায়।

স্বার্থিক মঙ্গল এবং তদনুযায়ী মূল-নিয়ম।

আমাদের আত্মা আপন ইচ্ছায় পরমাত্মা কর্ত্তৃক নিয়মিত হইলে, সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন আমাদের মনের প্রবৃত্তি-সকল আমাদের স্বীয় আত্মা কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়, তখনই আমাদের স্বার্থিক মঙ্গল সম্পাদিত হয়।

স্বার্থিক মঙ্গল-সাধনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যদি কোন প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তবে তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, যে কারণে ইহা কর্ত্তব্য যে, সমুদায় জগৎ ঈশ্বরের অধীন হইয়া চলে, সেই কারণেই কর্ত্তব্য যে, আমাদের সমুদায় প্রবৃত্তি আমাদের আত্মার অধীন হইয়া চলে। ঈশ্বরের অধীন হইয়া চলা যে কি কারণে কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের অধীন হইয়া আমরা যখন জগতের মঙ্গল-সাধনে ব্রতী হই, তখন আমারদের নিজের নিজের মঙ্গল-সাধন কি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে? কখনই না;—আমরা প্রতিজনেই জগতের অন্তর্গত. এই জন্য জগতের মঙ্গল সাধন করিতে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে আমারদের আপনারদের মঙ্গলও সাধন করিতে হয়।

সমুদায় আত্মার মঙ্গল সাধন করা স্বতন্ত্র এবং বিষয়াভিমুখীন আত্মার প্রবৃত্তি-সকলের মঙ্গল সাধন করা স্বতন্ত্র। আমরা যদি কেবল আমারদের জ্ঞানেরই উন্নতি সাধন করি, তাহা হইলে তাহাতে আমারদের ভাবের উন্নতি

সাধন করা হয় না; যদি কেবল ভাবেরই উন্নতি সাধন করি, তাহা হইলে তাহাতে আমারদের জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা হয় না; এই রূপ, যে মঙ্গল আমারদের কোন একটি বিশেষ অবস্থার উপযোগী, তাহা অন্য এক অবস্থার অনুপযোগী হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। অতএব আমারদের সমুদায় আত্মার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমাদের সর্ব্ব-প্রথমে কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে আমাদের মনের বৃত্তি-সকল আত্মার অধীনে পরিচালিত হয়।

প্রথম কর্ত্তব্যটি সাধনের নাম পারমার্থিক মঙ্গল-সাধন। আমরা আমারদের নিজের চেষ্টায় কেবল আপন প্রবৃত্তি-বিশেষকে বিষয়েতে নিয়োগ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের সমুদায় আত্মাকে চরিতার্থ করিতে হইলে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা কোন রূপেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না; পরমাত্মাতে আত্ম-সমর্পণ করিলেই আমারদের সমুদায় আত্মা চরিতার্থ হয়, ইহাতেই আমাদের

ধর্ম্ম হয়, ইহারই নাম পারমার্থিক মঙ্গল, এ মঙ্গলের বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য যাহা উপরে উল্লিখিত হইল, কি না—আমারদের মনের বৃত্তি-সকলকে আত্মার অধীনে রাখিয়া সাংসারিক কার্য্য-সকল নির্ব্বাহ করা, ইহারই নাম স্বার্থিক মঙ্গল-সাধন, ইহারই বিষয় এক্ষণে বিবেচনা করা যাইতেছে।

আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, প্রবৃত্তি-সকলকে আত্মার বশীভূত করাকে যদি স্বার্থ-সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে স্বার্থ শব্দের চলিত অর্থের প্রতি নিতান্তই বিমুখ হইয়া উহাকে এক অযোগ্য উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়; কিন্তু স্বার্থ-সাধন শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি যদি একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ওরূপ ভ্রম কখনই মনে স্থান পাইতে পারিবে না। স্বার্থ-সাধন শব্দের অর্থ এই যে, আমাদের নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করা; এরূপ করিতে হইলে আমাদের প্রবৃত্তি-সক-

লকে আপন বশে রাখা নিতান্তই প্রয়োজনীয়; কেন না যদি আমারদের প্রবৃত্তি-সকল বিনা-নিয়মে যথা তথা ধাবিত হয়, তাহা হইলে কি রূপে আমরা আমারদের নিজের কোন অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইব? মনে কর যে, কতক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে আপাততঃ আমারদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; দেখ, এই একটি স্বার্থ উপযুক্ত-রূপে সাধন করিতে হইলে, আপন মনোবৃত্তি-সকলকে কেমন বশীভূত করিতে হয়,—আলস্যকে পরাজয় করিতে হয়, বিলাস-লালসাকে দমন করিতে হয়, তৎপরতা অভ্যাস করিতে হয়; এই রূপ যখন আমারদের মনোবৃত্তি-সকল ক্রমে ক্রমে আমাদের আত্মার বশে সংস্থাপিত হয়, তখনই আমরা যথার্থ রূপে স্বার্থ-সাধনের—কি না স্বকীয় অভীষ্ট সাধনের উপযুক্ত হই। পুনশ্চ যখন আমারদের মনোনীত অর্থ-লাভে আমরা কৃতকার্য্য হই, তখন তাহাকে আমরা ইহারই জন্য স্বার্থ-সিদ্ধি বলি, যেহেতু তাহাতে আমরা

আমারদের মনোবৃত্তি-সকলকে যথাভিরুচি সুনিয়ম অনুসারে চালাইতে নানা প্রকার পথ পাই। কিন্তু সেই অর্থ-সহকারে যদি আমরা কেবল উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি-সকলের সেবায় রত হই, সুতরাং প্রবৃত্তি-সকলকে নিয়ম-বদ্ধ করিয়া পরিচালনা করিতে ভার বোধ করি, তাহা হইলে সে অর্থ-দ্বারা আমার-দের স্বার্থ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা আমারদের অনর্থই সাধিত হয়। পূর্ব্বে অব-ধারিত হইয়াছে যে, সর্ব্ব-জগতের সমশুভা-কাঙ্ক্ষী পরমাত্মার অধীনে আত্মাকে নিযুক্ত করাকে পরমার্থ-সাধন কহে,—এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে যে, স্বীয় প্রবৃত্তি-সকলকে আত্মার অধীন করিয়া পরিচালনা করাকেই স্বার্থ-সাধন কহে।

সমুদায় জগতের মঙ্গল—যাহা আমাদের কাহারও নিজের অভিপ্রেত ক্ষুদ্র মঙ্গল নহে, পরন্তু যাহা অসীম মঙ্গল, যাহা অসীম উন্ন-তির চিরবাঞ্ছিত লাভাতীত অনন্ত ফল, সে মঙ্গলের প্রবর্ত্তক কেবল একমাত্র পরমেশ্বর;

এই জন্য সে মঙ্গল যদিও আমারদের প্রজ্ঞাতে অনিবার্য্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি তাহাকে আমরা বুদ্ধিতে কোন রূপেই আয়ত্ত করিতে পারি না; কেবল আমারদের নিজের কল্পিত মঙ্গলকেই আমরা আপন বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি এবং স্বীয় বুদ্ধিতে মঙ্গল কল্পনা করিয়া যে পরিমাণে আমরা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারি, সেই পরিমাণে সেই কল্পিত মঙ্গলের মূলীভূত প্রজ্ঞা-নিহিত বাস্তবিক মঙ্গলেতে আমাদের বিশ্বাস বল পাইতে থাকে। আমাদের আত্মার স্বভাবই এই যে, সে প্রজ্ঞা-দ্বার দিয়া পরমাত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বুদ্ধি-দ্বার দিয়া বিষয়-কল্পনায় ব্যাপৃত হয়, উভয় কার্য্যই নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় এক যোগে নির্ব্বাহ করে; তুলাদণ্ড যেমন—এ দিকে শিরঃসমুন্নত কণ্টক দ্বারা গগন-শিখরের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করে ওদিকে স্কন্ধালম্বিত রজ্জু দ্বারা ধরাকৃষ্ট ভারদ্বয় বহন করে, উভয় কার্য্যই একত্র নিষ্পন্ন করে,—সেই রূপ।

ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর-নির্ব্বিশেষ মঙ্গলকে যদিও আমরা আয়ত্ত করিতে পারি না, কিন্তু আমরা তাহার অধীন হইতে পারি, আমরা তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। যদিও আমরা শুদ্ধ কেবল নিজের চেষ্টায় সে মঙ্গল-সাধনের বিন্দুমাত্রও সম্পন্ন করিতে পারি না, তথাপি আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি যে, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছা কর্ত্তৃক যেন আমরা-সকলে নিয়-মিত হই; এই রূপ যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আমাদের প্রার্থনার যোগ হয়, তখন তাহা হইতে প্রসূত অমৃত ফল-স্বরূপ এই একটি সত্য তিনি আমারদের আত্মাতে সমর্পণ করেন যে, তাঁহার সেই মঙ্গল ইচ্ছা নির-ন্তরই সাধিত হইতেছে, তাহার জন্য কিছু-মাত্র শঙ্কা নাই;—কথায় তিনি আমাদিগকে কিছুই বলেন না, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রেত মঙ্গল-ভাবের যথা-পরিমাণ আভাস দ্বারা আমারদের আত্মাকে এরূপ পূর্ণ করেন যে, তাহাতে নিমেষের মধ্যে আমাদের আত্মা

অনুপম বল বীর্য্য ও শান্তিতে পরিপ্লাবিত হয়। এই রূপ, ঈশ্বরের প্রসাদ যাহা সতত সর্ব্বত্র অপার-করুণাবনত রহিয়াছে, তাহাকে আমারদের নিজ আত্মাতে আদরের সহিত আহ্বান-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে গ্রহণ করা এবং তথায় তাহাকে অটল রূপে প্রতিষ্ঠা করা, আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ তাহাকে সাধ্যানুসারে পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, স্বদেশের মধ্যে, পৃথিবীর মধ্যে, উত্তরোত্তর ক্রমশঃ বিস্তার করা—আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

আদান প্রদানের সামঞ্জস্য-বিধি যাহা জগতের মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, পারমার্থিক জগতের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। আমরা ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিলে, ঈশ্বর আমারদের আত্মাতে তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করিয়া আমারদের সমুদায় কামনা পূর্ণ করেন। আত্মপর-নির্ব্বিশেষ পূর্ণ মঙ্গলেতে আমরা যে পরিমাণে আমাদের আত্মা সমর্পণ করি, সে মঙ্গলও সেই

পরিমাণে আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে আসিয়া বসতি গ্রহণ করে। এই রূপে,—অসীম আকাশ ব্যাপিয়া, যুগ-যুগান্তর পরিমাপন করিয়া, সমুদায় জগতের মধ্যে যে এক অসীম মঙ্গল-ভাব স্বকার্য্য-সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার কণা-মাত্র প্রসাদ যদি আমরা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমরা কি না সম্পদ লাভ করি? তাহা হইলে সমুদায় জগৎ যেমন একটি সুন্দর শৃঙ্খলায় গ্রথিত হইয়া ঈশ্বরের অধীনে নিযুক্ত রহিয়াছে, সেই রূপ আমাদের মনের সমুদায় প্রবৃত্তি সুশৃঙ্খলার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের নিজ নিজ আত্মার অধীনে সংস্থাপিত হয়। এই রূপ যখন আমরা ঈশ্বরাভিপ্রেত মঙ্গল-ভাব অনুসারে আমাদের প্রবৃত্তি-সকলকে যথানিয়মে পরিচালনা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হই, তখনই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বার্থের পথ অবলম্বন করি। কেন না, ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তি—ইহারা আমাদের স্বার্থ-সাধনের উপায় মাত্র; সাক্ষাৎ স্বার্থ

সাধন কি? না স্বকীয় মনের বৃত্তি-সকলকে সামঞ্জস্যরূপে চরিতার্থ করা, ইহা হইলেই স্বার্থ-সাধনের কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না।

শুদ্ধ কেবল পারমার্থিক মঙ্গল-সাধনের নিয়ম এই যে, ঈশ্বরের অধীন হইয়া পাপ হইতে বিরত হইয়া, সকল অবস্থাতেই মঙ্গল সাধন করিতে হইবে; এবং তদুত্তর স্বার্থিক মঙ্গল-সাধনের নিয়ম এই যে, ঈশ্বর আমাকে আপাততঃ যেরূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন সে অবস্থাতেও মঙ্গল সাধন করিতে হইবে;—যথা; ঈশ্বর আমাকে এই রূপ মনোবৃত্তি-সকল দিয়াছেন—এসকলকে যথোপযুক্ত রূপে চালনা করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ শরীর দিয়াছেন—ইহাকে যথোপযুক্ত রূপে পোষণ করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ পরিবার দিয়াছেন—পরিবারস্থিত-সকলের প্রতি সম্বন্ধোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি সহকারে যথোপযুক্ত রূপ ব্যবহার করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ সমাজে সমর্পিত করিয়াছেন,—অতএব

মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে হইবে, সমতুল্য ব্যক্তিকে সমাদর করিতে হইবে, অনুগত ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে, এই রূপ সকলের প্রতি যথোচিত ভদ্র ব্যবহার করিতে হইবে ; তিনি আমাকে এই রূপ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন,—অতএব স্বদেশের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, স্বদেশের যাহাতে গৌরব রক্ষা হয়, তাহার জন্য যত্ন পাইতে হইবে ; তিনি আমাকে এই পৃথিবীতে রাখিয়াছেন,—পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করা যতটুকু আমাদের সাধ্যায়ত্ত তাহা করিতে হইবে। পুনশ্চ যদি এ রূপ হয় যে, আমি কৃষকের গৃহে জন্মিয়া কৃষিকার্য্যই শিক্ষা করিয়াছি, তাহা হইলে সেই কার্য্যই উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবে ; যদি এরূপ হয় যে, আমি ধনবানের গৃহে জন্মিয়া ধনোপার্জ্জন-বিষয়ে অথবা কোন বিদ্যা-বিশেষের অনুশীলন-বিষয়ে শিক্ষিত হইয়াছি, তাহা হইলে যাহাতে আমার অবস্থার উপযুক্ত রূপে সেই ধনের আয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে অথবা সেই বিদ্যা-

বিশেষের আলোচনা হইতে পারে, তাহা করিতে হইবে ইত্যাদি।

কিন্তু এরূপ কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে. উপস্থিত সকল অবস্থাই আমাদের বিহিত স্বার্থ সাধনের পক্ষে সমান রূপ অনুকূল হইবে; প্রত্যুত ইহা সকলেরই দৃষ্টিপথে সর্ব্বদাই পড়িয়া আছে যে, কোন অবস্থা আমাদের স্বার্থের অল্প অনুকূল, কোন অবস্থা তাহার অধিক অনুকূল, কোন অবস্থা তাহার প্রতিকূল,—আমরা প্রতি জনেই এই রূপ নানাবিধ শুভাশুভ অবস্থার মধ্যে নিয়তই স্থিতি করিতেছি; ইহার মধ্যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কর্ত্তব্য এই যে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আপন শুভ বুদ্ধিকে সর্ব্বদা সতেজ রাখা,—যেন বাহিরের কোন অশুভ ঘটনার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা আপনারাও আবার আমাদের মঙ্গলের প্রতিকূল হইয়া না দাঁড়াই। আকাশস্থিত চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা যখন ভূমিতে পদচারণ করি তখন বোধ হয় যেন চন্দ্র আমা-

দের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে ; সেই রূপ পরি-
বর্ত্তনশীল ঘটনা-সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া
আমরা যখন কার্য্য করি, তখন মনে হয় যে,
সেই ঘটনা-সকলের সঙ্গে আমরা আপ-
নারাও পরিবর্ত্তিত হইতেছি, কিন্তু যখন
আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন
ভাবে স্বপদে দণ্ডায়মান থাকি, তখন দেখিতে
পাই যে, আমরা আপনারা স্থির রহিয়াছি,
বাহিরের ঘটনা-সকলই পরিবর্ত্তিত হই-
তেছে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখা
উচিত যে, এক মাত্র পরমেশ্বরই কেবল
সর্ব্বতোভাবে অপরিবর্ত্তনীয় ; এতদ্ভিন্ন আমা-
রদের এই যে আত্মা ইহা ক্রমে ক্রমে যত
পরিপক্ক হয় ততই অধিকতর অবিচলিত
ভাবে কার্য্য করিতে পারে ; যেমন বাল-
কের চঞ্চল মন বয়োধিক্য সহকারে ক্রমে
ক্রমে স্থৈর্য্য লাভে সমর্থ হয়,—সেই রূপ।
তথাপি আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, আমরা
যতদূর পারি ব্রহ্মেতে অবিচল রূপে সংস্থিত
থাকিয়া—মনোমধ্যে কেবল মাঙ্গলিক বিষয়-

সকলই কল্পনা করি, এবং বাহিরের শুভা-শুভ ঘটনা-সকলকে সেই প্রকার কল্পনার স্রোতে সংগঠিত করিয়া লইতে সাধ্যমতে চেষ্টা করি; ইহাতে যদি আমাদের সে চেষ্টা বিফলও হয়, তথাপি আমাদের মনের স্বচ্ছন্দতা অকুতোভয়তা কার্য্যদক্ষতা, এই প্রকার সকল অমূল্য স্থায়ী ফল প্রাপ্তি হইতে আমরা কখনই বঞ্চিত হইব না; ঈশ্বরের অধীন হইয়া, বিচক্ষণতা সাহস ধৈর্য্য ইত্যাদি সদ্‌গুণ দ্বারা মনের প্রবৃত্তি-সকলকে বশীভূত করিয়া আমরা যদি আমাদের কোন ন্যায্য অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তাহার কোন না কোন ফল আমরা অবশ্যই লাভ করিব, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

পুনর্ব্বার কহিতেছি যে, ঈশ্বর আমাদিগকে যে রূপ সাংসারিক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন,—আপন প্রবৃত্তি-সকলকে দমন করিয়া সেই অবস্থার উপযুক্ত রূপে সংসার-কার্য্যে রত হওয়া, অগ্রে বর্ত্তমান অবস্থার উপযুক্ত হওয়া পশ্চাতে সাধ্যা-

সুসারে ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করা. বিহিত স্বার্থ-সাধনের ইহাই পদ্ধতি। আমি যদি বর্ত্তমান সমাজেরই উপযুক্ত না হই, তাহা হইলে সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি-সাধনের জন্য চেষ্টা করা কি আমার পক্ষে কখন শোভা পায়? আমি যদি স্বদেশেরই মঙ্গল সাধন করিতে অযোগ্য হই, তাহা হইলে পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবার ভার গ্রহণ করা কি আমার পক্ষে শোভা পায়? আমি যদি স্বদেশকে ঘৃণা করি, স্বদেশের নিন্দাবাদ করিতে লজ্জা বোধ না করি, তাহা হইলে পৃথিবীকে ভালবাসা কি আমার পক্ষে শোভা পায়? আমি যদি আপনার মনকে বশীভূত করিতে যত্ন না করি, তাহা হইলে উপদেশ অথবা বহির্দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যের উন্নতি সাধন করিতে সচেষ্ট হওয়া কি আমার পক্ষে ভাল দেখায়? পূর্ব্ব অধ্যায়ে দৃষ্ট হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়া আত্মপর-নির্ব্বিশেষ মঙ্গল সাধন করা আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু সে মঙ্গল সাধনের বিহিত

উপায় যে কি—তাহা অধুনা এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, আপনার মঙ্গল সাধন করিয়া পরিবারের মঙ্গল সাধন করিতে উপযুক্ত হইবে, পরিবারের মঙ্গল সাধন করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে উপযুক্ত হইবে, সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবার উপযুক্ত হইবে, ইত্যাদি। বর্ত্তমান স্থলে বিধানের এই যে অগ্র পশ্চাৎ ভাব, যথা,—অগ্রে আপনার মঙ্গল সাধন করিবে পরে অন্যের মঙ্গল সাধন করিবে ইত্যাদি,—ইহা সময়ের অগ্র পশ্চাৎ নহে;—একই সময়ে যদি আমি আপনার মঙ্গল সাধন করিতে পারি, পরিবারের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, তবে তাহা আমার পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য; বীর পুরুষেরা যখন স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে সমরে আহূত হন, তখন তাঁহারা এই রূপ মনে করেন যে, দেশের মঙ্গল হইলেই সমাজের মঙ্গল হইবে, সমাজের মঙ্গল হইলেই আমার পরিবারের মঙ্গল

হইবে, পরিবারের মঙ্গল হইলে তাহাতেই আমার মঙ্গল ;—এই রূপ আপনার পর্য্যন্ত মঙ্গল মনে কল্পনা করিয়া রণে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য ; অগ্র পশ্চাৎ ভাব ব্যক্ত করিবার কেবল এই মাত্র তাৎপর্য্য যে, জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য উপযুক্ত হইতে হইলে তাহার (সময় সম্বন্ধে নহে কিন্তু আবশ্যকতা সম্বন্ধে) প্রথম উপায়—নিজের মঙ্গল সাধন করা, দ্বিতীয় উপায়—পরিবারের মঙ্গল সাধন করা, ইত্যাদি। পুরাবৃত্তেও এই রূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন মহাত্মা জগতের কোন বিশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তিনি প্রথমে আপনার মঙ্গলের জন্যই চেষ্টা পাইয়াছেন, পরে পারিষদ্‌বর্গের, পরে স্বদেশের, এই রূপেই তিনি ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদনিক্ষেপ করিয়াছেন। জগদ্‌বিখ্যাত মহাত্মগণের চরিতাবলি পাঠ কর—দেখিবে যে, যাঁহারা নীচ পদবী হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পদবীতে

আরোহণ করিয়াছেন; অথবা ক্ষুদ্র ব্যাপারে হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বৃহৎ ব্যাপারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারাই সমধিক সিদ্ধি-লাভে সমর্থ হইয়াছেন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, পারমার্থিক মঙ্গল সাধন করা যদি সত্যই আমারদের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে স্বার্থিক মঙ্গল সাধন করা তাহার একটি আনুষঙ্গিক উপলক্ষ না হইয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহার সার সংকলন করিয়া স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, স্বার্থকে পরমার্থের অধীন করিয়া বিহিত রূপে তাহার সাধন করিবে; অর্থাৎ—আমার আপনার মঙ্গল, আমার পরিবারের মঙ্গল, আমার দেশের মঙ্গল, ইত্যাদি আমার সম্পর্কীয় যে কোন মঙ্গল হউক না, সমুদায়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর-নির্ব্বিশেষ অনন্ত মঙ্গলের অন্তর্গত, এই রূপ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া

যেমন পরমার্থত আমাদের সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য; সেই রূপ আবার গৃহস্থ হওয়া, সামাজিক হওয়া, স্বদেশানুরক্ত হওয়া, ধর্ম্মানুগত স্বার্থ-সাধন উদ্দেশে এই সকল উপায় অবলম্বন করা, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য তাহার আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাকৃতিক মঙ্গল এবং তদনুযায়ী মূল-নিয়ম।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে নির্দ্ধারিত হইল যে, আমাদের বিষয়াভিমুখীন প্রবৃত্তি-সকলকে—এক কথায় এই যে—মনকে, আত্মার অধীনে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। আত্মা যেমন পরমাত্মাকে চায়, মন সেই রূপ বিষয়কে চায়; এবং মনের এই বিষয়-কামনা কেবল বিষয়েতে পর্য্যবসিত হইয়া নিরর্থক না যায়, এই

জন্য ইহা কর্ত্তব্য যে, মনকে যথোচিত রূপে আত্মার বশে রাখা হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ বিষয়-কামনা-সকলকে তাহারদের বৈধ চরিতার্থতা হইতে বঞ্চিত করিয়া মনকে যে অনর্থক কষ্ট দেওয়া—ইহা কখনই আমারদের কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কি রূপ বিষয়-কামনা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এবং কি রূপ বিষয়-কামনাই বা তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ, ইহা জানিতে হইলে তাহার এই মাত্র উপায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, "যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ। তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্ব্বিকৃতিশ্চ যা"। যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে এবং কল্যাণেতে নিবেশিত হইয়াছে, তিনিই সম্যক্ বুঝিয়াছেন—প্রকৃতিই বা কি এবং বিকৃতিই বা কি।

ধর্ম্ম-জীবী আত্মা এবং অন্ন-জীবী শরীর—পরমেশ্বর আমাদিগকে উভয়ই দিয়াছেন। আত্মা সদসদ্ বিবেচনা পূর্ব্বক ধীর-ভাবে কার্য্য করে, শরীর উপস্থিত অভাবের তাড়-

নায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া কার্য্য করে; আত্মা পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া ভোজ্য সামগ্রী-সকলের আয়োজন করে, কিন্তু ক্ষুধার উদ্দীপন-সময়ে সে সকল সামগ্রী যখন ভোজনার্থে পরিবেশিত হয়, তখন আমাদের শারীরিক প্রকৃতি ভাবনা চিন্তার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া সে সকলের দ্বারা অবিলম্বে ক্ষুন্নিবৃত্তি-কার্য্যে রত হয়। কিন্তু মনুষ্যের উপর ক্ষুৎপিপাসাদি প্রবৃত্তি-সকলের কদাপি এত বল হইতে পারে না—যদি পারে এমন হয় তবে তাহা হইতে দেওয়া উচিত হয় না—যে তাহার সদসদ্ বিবেচনা তৎকর্ত্তৃক একেবারে পরাভূত হইয়া যাইবে। অতএব আত্মাকে সদসদ্ বিবেচনাতে নিযুক্ত রাখিয়া তদনুসারে আমরা যদি আমাদের কোন শারীরিক বা মানসিক প্রকৃতিকে চরিতার্থ করিতে পারি তবে তাহা করা অবশ্যই আমাদের কর্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই রূপ ভাব ব্যক্ত করেন যে, প্রকৃতি যে—সেও

প্রজ্ঞাবান্, প্রকৃতিরও এক প্রকার সদসদ্ বিবেচনা আছে ; বৃক্ষ আপন আধার-ভূমিস্থ অসার বস্তু হইতে সার বস্তু বিবেচনা করিয়া লয়, মধুমক্ষিকা পুষ্প হইতে মধু বিবিক্ত করিয়া লয়, পক্ষীরা শাবকদিগের বাসোপযুক্ত করিয়া নীড় নির্ম্মাণ করে, এ সকল কার্য্য যদি প্রজ্ঞার না হইবে তবে আর কাহার ? সাংখ্য দর্শনের মত এই যে, প্রকৃতির সন্নিধি-বশতঃ আত্মা সুখ দুঃখে মুহ্যমান হয় এবং আত্মার সন্নিধি-বশতঃ প্রকৃতি প্রাজ্ঞ জীবের ন্যায় কার্য্য করে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই রূপ প্রতীতি হইবে যে, প্রজ্ঞা কেবল পরমাত্মাতেই মূল সমেত অবস্থান করে, তথা হইতেই তাহার মহিমা অবতীর্ণ হইয়া—আধ্যাত্মিক জগতে বুদ্ধির আশ্রয়-ভূমি রূপে এবং ভৌতিক জগতে প্রকৃতির আশ্রয়-ভূমি রূপে—দুয়েতে দুই রূপে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধিরও ধন নহে, প্রকৃতিরও ধন নহে, উহা বুদ্ধি এবং প্রকৃতি উভয়ের মূলস্থিত ঈশ্বরেরই

ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরের ধনেই আমরা ধনী. তাঁহা-রই ধনে প্রকৃতি ধনবতী।

আমাদের আত্মার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আত্মা করুক এবং আমারদের প্রকৃতির যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রকৃতি করুক. তাহা হইলেই আমাদের আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়ই সমবেত হইয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই। আমাদের আত্মার কর্ত্তব্য এই যে, সে জ্ঞান ভাব এবং স্বাধীন ইচ্ছা সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করে, প্রকৃতির কর্ত্তব্য এই যে, সে অজ্ঞাতসারে অন্ধভাবে ঈশ্বরের কার্য্য করে; প্রকৃতির যাহা কর্ত্তব্য সে তাহা অনুক্ষণই সাধন করিতেছে তাহাতে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই; আমাদের আত্মা যেন আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি সেই রূপ যত্নশীল হয়, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। যে পথে চলিলে জ্ঞান-ভাব এবং ধর্ম্মের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়—আত্মা সেই ঈশ্বরের পথে স্বেচ্ছায় সঞ্চরণ করুক, প্রকৃতির অন্ধকারময় পথে

বিচরণ করিবার তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; প্রকৃতির পথে প্রকৃতিই বিচরণ করুক। প্রকৃতির গুণে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস যথা-নিয়মে গমনাগমন করিতেছে; আমাদের আত্মারও এ রূপ ক্ষমতা আছে যে, সে আপন ইচ্ছাক্রমে সেই নিশ্বাস প্রশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে নিয়মিত করে; কিন্তু আত্মা যদি ঐরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি প্রকৃতির কার্য্য-সকল স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে আত্মারও কোন লভ্য নাই, প্রকৃতিরও কোন লভ্য নাই; প্রত্যুত আত্মার সেই অনধিকার চর্চার ছিদ্র দিয়া— আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়েরই কার্য্যের মধ্যে কতকগুলি অনিয়ম প্রবেশ করে। অত-এব উপস্থিত প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতা কার্য্য প্রকৃতির হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য এরূপ করিলে ঈশ্বরাভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়-মানুসারে উক্ত কার্য্য যথোচিত রূপে নির্ব্বা-হিত হইতে পারে; সে প্রাকৃতিক নিয়ম এই রূপ যে, যাহাতে আমাদের সমুদায় প্রবৃ-

ত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতার পক্ষে কোন ব্যাঘাত না জন্মে বরং তাহার পক্ষে আরও সুযোগ হয়, সেই নিয়মানুসারে প্রত্যেক প্রবৃত্তি স্ব স্ব চরিতার্থতায় নিযুক্ত থাকুক; এক কথায় এই যে, যখন যে কোন প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়, তাহা যেন আমাদের বৈধ স্বার্থকে অতিক্রম না করে, বরং তাহার পোষকতাতেই নিযুক্ত থাকে। প্রাকৃতিক নিয়ম প্রণালীর উদাহরণ ;—ক্ষুধার সময় আমাদের প্রকৃতি কেবল সেই টুকু মাত্র আহার চায় যাহাতে আমাদের অবসন্ন দেহ মনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইতে পারে; এই উপস্থিত ক্ষুৎপ্রবৃত্তিটি প্রকৃতি-অনুসারে চরিতার্থ হইলে আর আর সমুদায় প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়; কিন্তু যদি প্রকৃতির প্রতিকূলে অপরিমিত আহার করা যায়, তাহা হইলে আমাদের শরীর মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং উপস্থিত ভোগলালসা ভিন্ন অন্যান্য প্রবৃত্তি সকলের উপযুক্ত চরিতার্থতার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এই

রূপ, প্রকৃতি-অনুযায়ী পরিশ্রম করিলে সমুদায় শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হয়, কিন্তু অস্বাভাবিক পরিশ্রম করিলে তাহার বিপরীত ফল হস্তগত হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্যই এই যে, প্রত্যেক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা—অন্যান্য প্রবৃত্তি সকলের বৈধ চরিতার্থতার পোষকতা করুক ; ইহার অন্যথায় যদি কোন এক প্রবৃত্তি এরূপে চরিতার্থ হয় যে, তাহাতে আর আর প্রবৃত্তির বৈধ চরিতার্থতার ব্যাঘাত জন্মে, তবে তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী তাহার কোন সংশয় নাই।

পরমার্থ অথবা ধর্ম্ম আমাদের লক্ষ্য হইলে যেমন স্বার্থ তাহার এক আনুষঙ্গিক উপলক্ষ হয়, সেই রূপ বৈধ স্বার্থ অথবা, সমুদায় প্রবৃত্তির বৈধ চরিতার্থতা আমাদের লক্ষ্য হইলে, যে কোন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হউক তাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সহজেই চরিতার্থ হয়, অর্থাৎ ;—ক্ষুধার সময় ভোজ্য সামগ্রী চাই, কার্য্যের সময় কার্য্যালয়ে উপ-

স্থিত হওয়া চাই, শয়নের সময় শয্যা প্রস্তুত থাকা চাই, এই রূপ নানাবিধ প্রবৃত্তি যথা-কালে চরিতার্থ হওয়া চাই, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহার পর যে দ্রব্য আবশ্যক তাহা পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করা—স্বার্থের কার্য্য ; এবং এই রূপে সমুদায় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা উদ্দেশে পূর্ব্ব হইতে দ্রব্যাদি সকল স্বার্থ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া থাকিলে. ক্ষুধা বা কর্ম্ম-পটুতা বা নিদ্রা—যখন যে প্রবৃত্তি উত্তে-জিত হউক তাহা প্রকৃতির নিয়মানুসারে আপনা হইতেই স্ব স্ব চরিতার্থতা-পথের অনু-বর্ত্তী হইতে পারে ।

স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই রূপ অবধারিত হইয়াছে যে, পর-মার্থের অনুগত হইয়া স্বার্থ সাধন করা কর্ত্তব্য ; এক্ষণে প্রাকৃতিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, বৈধ স্বার্থের অনুগত হইয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য ।

সপ্তম অধ্যায়।

উপসংহার।

আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি এইরূপ যে, তাহা কতক দূর যায়, তাহার ওদিকে আর যায় না। ইহা কেবল নহে যে, আমরা আমাদের জন্ম-সময়ে অজ্ঞান ছিলাম এবং মৃত্যু-সময়ে অজ্ঞান হইব; ফলতঃ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানিতে পাই যে, অন্তরের বার্ত্তা আমরা অল্প যাহা কিছু জানিতেছি, তাহার একটুকু ওদিকে গেলে প্রগাঢ় অজ্ঞানান্ধকার আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু সেই অন্ধকার-রূপ প্রশান্ত আবরণ আমাদের আত্মার পক্ষে পুষ্টি-জনক তাহার আর সন্দেহ নাই; নিস্তব্ধ নিশীথে মাতার ক্রোড়ে নিদ্রা যাওয়া যে রূপ, সেই রূপ জাগ্রত ঈশ্বরের ক্রোড়ে বিদ্যা-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আমরা কিয়ৎকাল

বিশ্রাম করিলে, বিকৃতির অবস্থা হইতে প্রকৃতিতে পদ নিক্ষেপ করিতে পারি। লোকে আক্ষেপ করে যে, শৈশব-সুলভ অকলঙ্ক সুখরত্ন গেলে আর ফিরে না; কিন্তু আমারদের অন্তঃকরণের মধ্যে এমন এক নিভৃত প্রদেশ আছে, যেখানে গেলে এখনই আমরা নিরীহ নিরাশ্রয় অজ্ঞান শিশু হইয়া যাই; যেখান হইতে আমরা আবার নূতন রূপে জীবন আরম্ভ করিতে পারি, যেখান হইতে পুনর্জাত হইয়া ফিরিয়া আইলে পূর্ব্ব জীবনের যে সকল মঙ্গল বৃত্তান্ত তাহাই আমাদের সম্বল হয়, যে সকল অমঙ্গল বৃত্তান্ত তাহা বস্তুতঃ যেমন অসৎ, কার্য্যতও তেমনি অসৎ রূপে পরিণত হয়। অতএব আমরা যে ঈশ্বরের আশ্রয়ে বাস করিতেছি ইহা জানিতে হইলে, আমাদের জন্ম কালের এবং মৃত্যুকালের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ এবং কল্পনা করিবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই, আপন অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এখনই আমরা তাহাতে নিঃসংশয় হইতে পারি।

যেখানে উত্তীর্ণ হইবার সময় আমাদের বুদ্ধির দীপালোক ম্লান হইয়া যায়, যেখানে আপনাকে অপূর্ণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই খানেই পরমেশ্বরের পূর্ণ মুখ-চ্ছবি বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বর আমাদের আত্মার স্রষ্টা পাতা এবং পরিত্রাতা—এই সুসংবাদ প্রজ্ঞা আমাদের প্রশান্ত আত্মাতে অতীব সুমধুর নিস্বনে সর্ব্বদাই বলিয়া দিতেছে, আমরা স্তব্ধ হইয়া শুনিলেই হয়। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, পরমেশ্বর আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান দিয়াছেন বলিয়াই আমরা আপনার গভীর অজ্ঞতা অবগত হইতে পারিতেছি এবং তাঁহার প্রতি সোৎসুক নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছি। তিনি আপনার একটুকু আভাস দেখাইয়া মনুষ্যকে ব্যাকুল করিয়া দিয়াছেন মনুষ্য তাই আর নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, কেবল দিবা নিশি তাঁহারই পদ চিহ্ন অনুসরণ করিয়া এক প্রদেশ হইতে উৎকৃষ্টতর আর এক প্রদেশে উপনীত হই-

তেছে। পশু পক্ষীদিগকে এ ভাবনা ভাবিতে হয় না; সুতরাং এ আনন্দেরও সহিত পরিচিত হইতে হয় না; কেবল মনুষ্যেরই এই অনন্য-পরিহার্য্য ব্যাকুলতা, মনুষ্যেরই এই অনন্য-বিতরিত আনন্দ।

আমরা অজ্ঞান ছিলাম, এক্ষণে জ্ঞান পাইয়াছি; জ্ঞান পাইয়া তদ্দ্বারা আমাদের অজ্ঞতা অবগত হইতেছি; এবং আপনার সেই অজ্ঞতার মধ্য দিয়া পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বরের আশ্রয়ে নির্ভর করিতেছি; অনন্তর তাঁহার প্রসাদে বুদ্ধির অতীত মূল-সত্য সকল আমাদের আত্মাতে দিন দিন উজ্জ্বলতর ভাবে দীপ্তি পাইতেছে, মূল-সত্য সকল দ্বারা আমাদের বুদ্ধি সংশোধিত হইতেছে, এবং সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধির চালনা দ্বারা আমাদের শ্রীসম্বৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া অবস্থার উন্নতি হইতেছে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বর যেমন আমাদের জ্ঞানের স্রষ্টা, সেই রূপ তিনি আমাদের জ্ঞানের পালনকর্ত্তা ও প্রবর্দ্ধয়িতা; কিন্তু পূর্ব্বে

আমাদের অনিচ্ছায় আমরা ঈশ্বর-প্রসাদে অজ্ঞান হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের ইচ্ছা চাই, যত্ন চাই, প্রার্থনা চাই, তাহা হইলে ঈশ্বর-প্রসাদে প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধির মলিন মুখকে উজ্জ্বল করিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগকে জ্ঞান দান করিবে ; এই রূপ করিয়া আমরা অনন্তকাল পুনঃ পুনঃ উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকিব।

আমাদের প্রথম শৈশবাবস্থায় আমরা প্রকৃতির সুকোমল ক্রোড়ে নিমগ্ন হইয়া থাকি ; আমাদের আত্মা তখন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে ; এবং ক্ষুধা হইলে ক্রন্দন, হস্তপদ পরিচালনা, প্রকৃতি আমাদের হইয়া এই সকল কার্য্য অবিশ্রান্ত সম্পন্ন করিতে থাকে। ক্রমে আমাদের অন্তঃকরণে জ্ঞান আবির্ভূত হয় ; ক্রমে আমরা জানিতে থাকি যে, এই বস্তুটিতে আমার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষে মাতাই আমার সহায়। পূর্ব্বে ক্ষুধা হইত এবং স্তন্য পান দ্বারা

তাহা নিবৃত্ত হইত, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাশান্তির কারণ কি তাহার আ-ভাস আমাদের জ্ঞানে অল্পে অল্পে প্রতি-ভাত হইতে থাকে; কারণ-ভাব বস্তু-ভাব জাতি-ভাব এই সকল ভাব ভিতর হইতে কার্য্য করিতে থাকে; সুতরাং এই সময়ে বিষয়-বিষয়ীর ভাব পরিস্ফুট হয়। পূর্ব্বে প্রকৃতি যাহা করিত তাহাই হইত; এক্ষণে আমরা আপনারা আমাদের সম্মুখস্থিত দ্রব্যাদি সকলের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে মনোনিবেশ করি; শৈশবাস্থায় প্রবৃত্তি চরি-তার্থ হইলেই যথেষ্ট হইত, বাল্যাবস্থায় তদ্ব্যতিরেকে স্বার্থ সাধনের চেষ্টা আসিয়া আমাদের সঙ্গ গ্রহণ করে; এক্ষণে "এ বস্তু তোমার নহে এ বস্তু আমার"—এই রূপে ক্রীড়া সামগ্রী বিশেষে আমরা আপনার স্বত্ব বলবৎ করিতে সচেষ্ট হই; ক্রমে ক্রমে আমাদের এরূপ অভ্যাস হয় যে, উপস্থিত প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে আপাততঃ অগ্রাহ্য করি, এবং যাহাতে স্ব স্ব প্রবৃত্তি সকল আমা-

দের ইচ্ছানুসারে চরিতার্থ হইতে পারে তদু-পলক্ষে নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টান্বিত হই। বাল্যকালে অধিকাংশ আ-মরা কেবল আপনারই উদ্দেশে কার্য্য করি; বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা আমরা আপনারই মনের উন্নতি সাধন করি, ক্রীড়া এবং ব্যায়ামাদি দ্বারা আমরা আপনারই শরীরের উন্নতি সাধন করি, তদ্ব্যতীত পরিবারের ভরণ পোষণ, জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, বাল্যকালে এস-কল লইয়া আমাদিগকে ভারগ্রস্ত হইতে হয় না; পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে পরিবার, সমাজ, দেশ, এই সকল লইয়া নানা চিন্তায় নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতে হয়। এস-ময়ে আমাদের আপনাদের যে কতটুকু বল এবং কি যে দুর্ব্বলতা তাহার সবিশেষ পরি-চয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং আপনার সেই অকিঞ্চনতার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের নিরতিশয় মহত্ত্ব আমাদের জ্ঞাননেত্রে উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই রূপে মনুষ্যের জীবন প্রাকৃতিক মঙ্গল হইতে স্বার্থিক মঙ্গলে

এবং স্বার্থিক মঙ্গল হইতে পারমার্থিক মঙ্গ
ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে থাকে। কি
কি প্রাকৃতিক কি স্বার্থিক সমুদায় মঙ্গলই
পারমার্থিক মঙ্গলের অন্তর্গত। শিশু
প্রকৃতির হস্তে লালিত পালিত হয়, বাল
যে আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হ
যুবক যে আপন স্বার্থকে ক্রমশ অন্যে
স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া তাহাকে উত্ত
রোত্তর সুচারু রূপে সংগঠিত করে, এ সক
লেরই সহিত পরমেশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভা
ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছে; এবং আমর
মঙ্গলের পথে কতক দূর অগ্রসর হইলে
তাহা স্পষ্ট রূপে আমাদের জ্ঞানচক্ষুতে
প্রতিভাত হয়। পারমার্থিক মঙ্গলের সূর্য্যা
লোকে উত্থিত হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য এ
যে, সংসারের কঠোরতা-সকল বিস্মরণ পূর্ব্ব
প্রেমপূর্ণ পরমেশ্বরের আলিঙ্গনে আপনাকে
বিক্রীত করি; শরীর যন্ত্রের যন্ত্রণা হইতে
কৌশলে অবসৃত হইয়া অপার গম্ভীর সর্ব্ব
তঃপ্রসারিত প্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন হই। কৌশল

কর্ম্মকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনা কেবল এই জন্য উপকারী যে, তাহাতে আমাদের তর্ক-শক্তি বিশেষ-রূপে মার্জ্জিত ও পরিস্ফুট হয়; কিন্তু, তাহাতে যে আমাদের জীবনের প্রতি কোন ফল দর্শে, ইহা কেহই স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, যাঁহারা তর্ক শিক্ষা করিতে অভিলাষী হন, তাঁহারা ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন, তাহা হইলেই তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে; কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা তাঁহাদের সে পথে কিছুই সাহায্য দিতে পারিবে না, বরং নানা রূপ বাধা আনিয়া ফেলিবে। তত্ত্ব-বিদ্যার প্রণালী এই যে, ঈশ্বর-প্রসাদাৎ আমরা যাহা কিছু জানি, তাহার

প্রতি যেন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি; এবং আমাদের যাহা বিশ্বাস, তদনুযায়ী যেন কার্য্য করি। পরন্তু তর্ক-শিক্ষার প্রণালী এই যে, মূল-তত্ত্ব-বিষয়ে আমরা যাহা কিছু জানি তাহাতে যেন সংশয় করি; সংশয় অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য চলিতে পারে না, সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের কার্য্য, ভগ্ন-কর্ণ তরীর ন্যায় অতীব অনিয়মে চলিতে থাকে। অতএব তত্ত্ববিদ্যা এবং তর্কশাস্ত্র উভয়কে এক দৃষ্টিতে দেখা অতীব ভ্রম, তাহার আর সন্দেহ নাই। উদাহরণ ;—তত্ত্ব-বিদ্যা বলেন, " আমি আছি"—ইহা আমরা, তর্ক দ্বারা নহে কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদাৎ, জানিতেছি; এসো ইহাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি, অতঃপর এসো আমরা সেই বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করি,—অর্থাৎ জড়পদার্থের নিয়মানুসারে নহে কিন্তু আত্মার নিয়মানুসারে কার্য্য করি—পশুবৎ নহে কিন্তু মনুষ্যোচিত কার্য্য করি। তর্ক-বুদ্ধি বলেন, " আমি আছি"—এই এক তথ্য যাহা আমরা জানিতেছি, এসো ইহার প্রতি আমরা সংশয়

করি, কার্য্যের জন্য ভাবিতে হইবে না, কার্য্য—দেহাদির অবস্থানুসারে আপনা আপনি চলিতে থাকিবে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, তর্ক বিতর্কেরই কার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন যোগ নাই, প্রত্যুত তত্ত্ব-বিদ্যার—কার্য্যের সহিত অব্যবহিত যোগ রহিয়াছে। পুনশ্চ তত্ত্ব-বিদ্যার সিদ্ধান্ত-সকলের সত্যতার ইহা একটি সামান্য প্রমাণ নহে যে, সে-সকলেতে আমরা অন্তঃকরণের সহিত বিশ্বাস করিতে পারি ও সেই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া আমরা বলের সহিত কার্য্য করিতে পারি। পরন্তু শুদ্ধ কেবল তর্ক বিতর্কের সিদ্ধান্ত সকলেতে আমরা কখনই অন্তঃকরণের সহিত সায় দিতে পারি না, এবং তদনুসারে স্থির-ভাবে কার্য্য করিতেও সমর্থ হই না। ইহার উদাহরণ ;—আত্মা এক, ভাবাত্মক, স্বাধীন,—এই এক জ্ঞান যাহা আমাদের অন্তরে রহিয়াছে, ইহাতে আমরা অক্ষুব্ধ-চিত্তে বিশ্বাস করিতে পারি, এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে যত্ন করিলে অবশ্যই আমরা

মঙ্গলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হই। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে, আত্মা এক নহে, ভাবাত্মক নহে, স্বাধীন নহে, এরূপ সহস্র সহস্র তর্ক উত্থাপিত হইলেও তাহাতে আমাদের অন্তঃকরণের বিশ্বাস কখনই সায় দিবে না, এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে গেলেই তাহার অকিঞ্চিৎকরতা তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইবে।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানের মূলতত্ত্ব-সকল অবধারিত হইয়াছে, ভোগকাণ্ডে ভাবের মূল-আদর্শ-সকল নিরূপিত হইয়াছে, এক্ষণে কার্য্যের মূল নিয়ম কি কি তাহারই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নিয়মান্বেষণের প্রণালী।

নিয়ম-সকল অনুধাবন করিবার প্রণালী দুই রূপ, এবং তদনুসারে দুইটি নাম দ্বারা

তাহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক্ রূপে চিহ্নিত করা যাইতে পারে, যথা,—একের নাম আরোহিকা, অন্যের নাম অবরোহিকা। বিশেষ বিশেষ নিয়মিত ঘটনা-সকল অবলম্বন-পূর্ব্বক উত্তরোত্তর সাধারণ নিয়ম-রাজ্যে আরোহণ করিবার যে প্রণালী—আরোহিকা নাম তাহারই প্রতি বর্ত্তিতে পারে; এবং সাধারণ নিয়ম হইতে নিয়মিত ঘটনা-সকলে অবতরণ করিবার যে প্রণালী, তাহাই অবরোহিকা নামের অভিধেয়। ইহার মধ্যে আরোহিকা-প্রণালী—ভৌতিক নিয়ম-সকলের অনুসন্ধান-কালেই বিশিষ্ট রূপে উপকারে আইসে, এবং অবরোহিকা-প্রণালী আধ্যাত্মিক নিয়ম-সকলেতেই বিশিষ্ট রূপে সংলগ্ন হয়। আমরা দেখি যে, ইষ্টক প্রস্তর ও আর আর সামগ্রী স্ব স্ব অবলম্বন হইতে বিচ্যুত হইলে ধরাভিমুখে নিপতিত হয়, ইহা হইতে আমরা এই এক নিয়ম আহরণ করিয়া লই যে, পৃথিবীর উপরে যত কিছু সামগ্রী আছে—সকলকেই পৃথিবী আপনার দিকে আকর্ষণ

করে। এস্থলে কেবল ইষ্টক প্রস্তর প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তুরই অধঃপতন দৃষ্টি করা হইল, কিন্তু নিয়ম যে-টি নির্দ্ধারিত হইল তাহা নির্ব্বিশেষে তাবৎ বস্তুরই অধঃ-পতনের কারণোপযোগী। এই রূপ বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরীক্ষা হইতে সাধারণ নিয়ম-সকলে উত্থান করিবার যে প্রণালী, যাহার নাম আরোহিকা রাখা গেল, তাহা ভৌতিক কার্য্য সম্বন্ধেই বিশেষ-রূপে ফলদায়ক হয়। অপর, নিয়মিত বিষয়-সকল হইতে নিয়মে আরো-হণ না করিয়া, আমরা যখন নিয়ন্তা বিষয়ী হইতে নিয়মে অবরোহণ করি, তখনকার এই যে অবরোহিকা-প্রণালী, ইহা আধ্যাত্মিক নিয়মান্বেষণের পক্ষেই বিশেষ রূপে ফল-দায়ক হয়। আধ্যাত্মিক নিয়ম দুই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, মিশ্র এবং বিশুদ্ধ; যথা,—যদি এ রূপ একটি নিয়ম করা যায় যে, আমি অমুক সময়ে আহার করিব, তবে তাহাতে বুঝায় যে,—প্রথমতঃ আমি আরো-হিকা-প্রণালী দ্বারা এই নিয়মটি অবধারণ করি-

য়াছি যে, ঐ সময়ে আহার করিলে শরীর ভাল থাকে, দ্বিতীয়তঃ অবরোহিকা-প্রণালী দ্বারা এই নিয়মটি ধার্য্য করিয়াছি যে, যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য; এই উভয় নিয়মের সাম্মিশ্র হইতেই এই নিয়মটি উৎপন্ন হইতে পারে যে, "আমি অমুক সময়ে আহার করিব", এই জন্য এ নিয়মটির প্রীতি মিশ্র উপাধি সম্যক্‌ রূপে সংলগ্ন হয়। পরন্তু, আমার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য, এ নিয়মটি কোন ভৌতিক ব্যাপার হইতে নহে কিন্তু কেবল-মাত্র আত্মা হইতেই উদ্ভাবিত হইয়া থাকে; অমুক সময়ে আহার করিব, এ নিয়ম কিছু সকলের পক্ষে সকল অবস্থাতে সংলগ্ন হয় না; কিন্তু "আমার যাহাতে মঙ্গম হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য" এ নিয়মটি সকল আত্মা হইতে সকল অবস্থাতেই নিরন্তর উদীরিত হইতেছে; পূর্ব্বের ঐ নিয়মটির কিয়-দংশ ভৌতিক পরীক্ষা হইতে সংকলিত হই-য়াছে, কিন্তু শেষের এ নিয়টিকে আত্মা স্বয়ং

উৎপাদন করিয়া কার্য্য-সকলেতে বহমান করিতেছে। আরোহিকা এবং অবরোহিকা প্রণালীর আর এক যোগ্যতর নাম রাখা যাইতে পারে, যথা,—সংকলন-প্রণালী এবং ব্যবকলন-প্রণালী; অনেক বিশেষ বিশেষ দৃষ্ট ঘটনা হইতে এক এক সাধারণ নিয়ম সংকলন করিবার যে প্রণালী, সংকলন-প্রণালী বলাতে তাহা স্পষ্ট রূপে বোধগম্য হইতে পারে; এবং নিয়ন্তা হইতে নিয়ম দোহন করিবার যে প্রণালী, ব্যবকলন-প্রণালী বলাতে তাহা স্পষ্ট রূপে অভিজ্ঞাত হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়।

মঙ্গলের কর্ত্তব্যতা।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, ব্যব কলন-প্রণালী অনুসারেই মূল নিয়ম-সকলের

সন্ধান করিতে হইবে ; বাহিরের ঘটনা-সকল হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আত্মার পতি দৃষ্টি করিতে হইবে।

আত্মা যে নিয়মটি প্রকাশ করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক, তাহা এই,—যে যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই কর্ত্তব্য। এ নিয়মটি সর্ব্ববাদি-সম্মত ; কিন্তু ইহার মধ্যেও বিবাদের এই এক সূত্র সংগোপিত রহিয়াছে যে, মঙ্গল যে কি—এ বিষয়ে নানা ব্যক্তির নানা মত হইবার কিছুই বাধা নাই। এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সত্য কি? তাহা হইলে আপাততঃ তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ্ জীব, জন্তু, এ সকলই সত্য ; কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে পরম সত্য কি? তবে তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, পরমাত্মাই কেবল এক মাত্র পরম সত্য। এই রূপই বলা যাইতে পারে যে, নিয়মিত আহার, নিদ্রা, আচার, ব্যবহার, এ সকলই মঙ্গল ; কিন্তু ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে, যাহার গুণে

আমরা তাঁহার প্রেমময় সন্নিধানে ক্রমশ আকৃষ্ট হইতেছি, তাহাই প্রধানতম মঙ্গল, ও পরম মঙ্গল; এবং এই মঙ্গলের সহিত যাহার যে পরিমাণে যোগ, তাহা সেই পরিমাণেই মঙ্গল। আপনার যাহাতে মঙ্গল হয়, সকল আত্মাই এই রূপ নিয়মে কার্য্য করে; সুতরাং একমাত্র যাঁহার নিয়মের অধীন হইয়া সকল আত্মা ঐ রূপ মঙ্গল-নিয়মে কার্য্য করিতেছে, তিনি অবশ্য সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-স্বরূপ। মঙ্গল-নিয়ম—পরমাত্মা কর্ত্তৃক আমাদের আত্মাতে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, এবং তাহারই গুণে আমরা আবার স্বীয় স্বীয় বিষয়-কার্য্য-সকল মঙ্গল-নিয়মে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছি। আমাদের আত্মাকে বিষয়-পিঞ্জর হইতে নির্ম্মুক্ত করত তাহাকে একবার স্বাধীনতা দিয়া দেখা উচিত যে, সে আপন নিয়মে কিরূপ কার্য্য করে; ধৃত পক্ষী যেমন পিঞ্জর হইতে নিষ্কৃতি পাইলে প্রথমে সে অগম অরণ্য-নিকেতনের মধ্যে গিয়া নিমগ্ন হয়, পরে তাহার

যথার্থ গীতধ্বনি সেখান হইতে নিজ মূর্ত্তিতে নিঃসারিত হইতে থাকে,—সেই রূপ আত্মা স্বাধীনতা পাইলে প্রথমে সে অন্তরতম প্রিয়-তম পরমাত্মাতে গভীর নিমগ্ন হয়, তাহার পরে তাহা হইতে প্রকৃত মঙ্গল কার্য্য-সকল সংসার-ক্ষেত্রে অনর্গল নিঃসারিত হইতে থাকে।

অতএব মঙ্গল কি—জানিতে হইলে, প্রথমে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের মধ্যে তাহার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ জীবাত্মা স্বীয় বিষয়-কার্য্যেতে সেই মঙ্গলের ভাব কিরূপে প্রয়োগ করে তাহার প্রতি দৃষ্টি করা বিধেয়; অবশেষে অজ্ঞান প্রকৃতি মঙ্গলের পক্ষে কিরূপ উপযোগী তাহা নিরূপণ করিবার সদুপায় হইতে পারিবে। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ-স্থলে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে পারমার্থিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে; জীবা-ত্মার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ-স্থলে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে, তাহাকে স্বার্থিক মঙ্গল

বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে; এবং অজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে প্রাকৃতিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

পারমার্থিক মঙ্গল এবং তদনুযায়ী

মূল-নিয়ম।

আমাদের মধ্যে যাহার যে কিছু মঙ্গল ভাব রহিয়াছে তাবতেরই মূল পরমাত্মা, ইহা আমরা জ্ঞানে জানিতেছি এবং জ্ঞানের এ বাক্যটিতে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাও স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইতেছে; এই জন্য আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, আমরা আপনা আপনাকে ঈশ্বরের সেই মঙ্গল ইচ্ছাতে অসংকোচে সমর্পণ করি,—এই রূপ মনে করিয়া যে, তাঁহার যাহা ইচ্ছা সেই অনু-

সারে তিনি আমাদিগকে নিয়মিত করুন। এই রূপ, জ্ঞানের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ইচ্ছার সহিত, ঈশ্বর কর্ত্তৃক মঙ্গল নিয়মে নিয়মিত হওয়া---জ্ঞানবান্ আত্মা মাত্রেরই প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের এরূপ যোগ রহিয়াছে যে, আমরা যত স্বাধীন হইব তত তাঁহাকে চাহিব; কেননা, আমরা যদি স্বাধীন হইলাম, তবে যিনি সর্ব্বতোভাবে আমাদের মঙ্গল চাহেন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা আর কাহাকে চাহিব? পুনশ্চ যাহা বিশুদ্ধ-রূপে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা—ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাহার মূল; যথা, "আমার মঙ্গল হউক" এ ইচ্ছাটি আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা (কেন না আত্মা স্ববশ হইলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল চাহে না), সর্ব্বমঙ্গলাকর পরমেশ্বরই আমাদের প্রত্যে-কের এই স্বাধীন ইচ্ছাটিকে নিয়ত উদ্দীপন করিতেছেন, তাই আমাদের এ ইচ্ছা রাশি রাশি বিপদের তরঙ্গ-মধ্যেও নির্ব্বাপিত হয় না;—সহস্র দুর্ব্বিপাকের মধ্যে পড়িলেও

কোন মনুষ্যই ভিতরে ভিতরে মঙ্গল চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হয় না।

প্রতি আত্মাতেই যে ঈশ্বর-প্রদত্ত মঙ্গল ভাব নিগূঢ় আছে, ইহা সত্য কি মিথ্যা জানিতে হইলে কোন পুস্তকে বলিয়াছে কি না বলিয়াছে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া—একেবারেই আমাদের স্ব স্ব আত্মাতে দৃষ্টি করা বিধেয়। কেন না আত্মা হইতে ব্যবকলন করিয়া আমরা যে কোন সত্য প্রাপ্ত হই তাহারই প্রতি আমরা নিরুদ্বেগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি; পরন্তু এখান-ওখান হইতে সংকলন করিয়া আমরা যে সকল মতামত ধার্য্য করি, তাহা যেমন সত্য হইতে পারে তেমনি অসত্যও হইতে পারে, সুতরাং তাহা কখনই সম্যক্ রূপে বিশ্বাস্য হইতে পারে না। মঙ্গল-ভাব যদিও আমাদের আপন আপন আত্মাতেই রহিয়াছে, তথাপি যে আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না—ইহার অবশ্য কারণ আছে, যথা;—

আমাদের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে

দুই রূপ মঙ্গল ভাব দেখিতে পাওয়া যায় এক রূপ মঙ্গল ভাব এই যে, তাহার পদে পদে বাধা বিঘ্ন, চতুর্দ্দিকে প্রতিবন্ধক,—কোথাও প্রলোভন কুহক-জাল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, কোথাও বিভীষিকা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, কোথাও জটিল হৃদয়-গ্রন্থি পথ-রোধ করিয়া রহিয়াছে। এই প্রকার মঙ্গল ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই সচরাচর বলা গিয়া থাকে যে, শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি ; রাশি রাশি বাধা বিঘ্ন দ্বারা ইহা এমনি প্রপীড়িত হইয়া আছে যে, ইহাকে দেখিতে পাওয়াও একটি সহজ ব্যাপার নহে,—মোহ শোক ভয়ের পর্ব্বত-রাশি ভেদ করিয়া তবে ইহাকে দেখিতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার মঙ্গল ভাব এই যে, তাহাতে কিছু মাত্র বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, তাহা অতীব পরিশুদ্ধ। আমাদের এই পৃথিবীটির আদিম অবস্থায় আমরা যদি ইহার উপরে উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে ইহার মুখশ্রী এখনকার মত এরূপ হইবার পক্ষে কি না ভয়ানক প্রতিবন্ধক-সমূহ আমাদের নেত্র-

গোচর হইত? কিন্তু সে কালের সেই সকল ভূত-সংগ্রাম কি মঙ্গলের কর্ণকে বধির করিতে পারিয়াছিল?—না মহাভূত সকলের প্রবল প্রকোপ মঙ্গলের হস্তকে রোধ করিতে পারিয়াছিল? এই প্রকার এই যে প্রভূত মঙ্গল ভাব, ইহা নিঃশঙ্কে ও নিরুদ্বেগে সমুদায় জগতের উপরে নিয়ত কার্য্য করিতেছে,—কোন বাধা মানে না, বিঘ্ন মানে না, ও স্বকার্য্য-সাধনে কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। সকল নিয়মেরই উপরে এই মঙ্গলের নিয়ম রহিয়াছে, কিন্তু ইহার উপরে আর কাহারও নিয়ম নাই। এক্ষণে বলা বাহুল্য যে, প্রথম প্রকার পরিমিত মঙ্গল ভাব—জীবাত্মার, ও দ্বিতীয় প্রকার সর্ব্বমঙ্গল ভাব—পরমাত্মার; এবং এই দুয়ের মধ্যে এই রূপ সম্বন্ধ যে, জীবাত্মার মঙ্গল ভাব যে পর্য্যন্ত না পরমাত্মার মঙ্গল ভাবের সহিত আপনার যোগ সংস্থাপন করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত উহা সংসার-ভারে প্রপীড়িত হইয়া এরূপ মৃতবৎ হইয়া থাকে যে, উহা আছে কি নাই তাহা লক্ষ্য হওয়াই দুষ্কর।

দর্শন-শাস্ত্র-বিশেষের আলোচনা দ্বারা আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, যত আমরা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইব ততই আমাদের স্বাধীনতার নির্ব্বাণ হইবে ; কিন্তু সত্য এই যে, যত আমরা ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান-প্রেম-ইচ্ছাতে সম্মিলিত হইব ততই আমরা স্বাধীন হইব। শিশু যেমন মাতার ক্রোড়ে গিয়া স্বাধীন হয়, বালক যেমন ক্রীড়াক্ষেত্রে গিয়া স্বাধীন হয়, যুবা যেমন বয়স্য-দলের মধ্যে গিয়া স্বাধীন হয়, জীবাত্মা সেই রূপ পর-মাত্মার সন্নিধানে গিয়া স্বাধীন হয়। স্বাধীন ইচ্ছা যে কি-রূপ—এক্ষণে তাহার প্রতি মনো-নিবেশ করা যাইতেছে।

আত্মার অভ্যন্তরে স্বাধীন ইচ্ছার অব-য়ব অন্বেষণ করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রথমতঃ আত্মামাত্রেই অগ্রে নিয়ম স্থির করে পশ্চাৎ সেই নিয়ম পালন করে—এই রূপে কার্য্য করে। যথা, আমি যদি অগ্রে এই রূপ নিয়ম করি যে, “আমি চলিব” এবং পশ্চাৎ যদি সেই নিয়ম পালন

করি অর্থাৎ তদনুসারে চলি, তবেই সেই কার্য্যকে বলা যাইতে পারে—আত্মার কার্য্য, কি না আমার আপনার কার্য্য; কিন্তু যদি আমি সুষুপ্তি-অবস্থায় শয্যা ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন করি, তাহা হইলে সে কার্য্য আমার আপন নিয়মানুসারে না হওয়াতে তাহা কখনই আমার আত্মার কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইলে. জ্ঞান ও বিশ্বাসের অনুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য,—কর্ত্তব্যের ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ মূল-নিয়ম। স্বাধীন শব্দের অর্থ আপনার অধীন—আত্মার অধীন; যে ইচ্ছা আত্মার অধীন তাহা কাযেই আত্মার নিজের গুণ-সকলের সহিত ঐক্য হইতে চায়; ইচ্ছা ব্যতিরেকে আত্মার আর দুইটি গুণ—জ্ঞান এবং প্রীতি; অতএব স্বাধীন ইচ্ছার একটি অব্যর্থ লক্ষণ এই যে, তাহা জ্ঞান ও প্রীতি শ্রদ্ধাদি ভাবের সহিত স্বভাবতই ঐক্য হয়। এই জন্য কোন প্রাচীন ঋষি তৈত্তিরীয় উপনিষদের

এক স্থানে এই রূপ কহিয়াছেন যে, “ শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং” শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না ;— শ্রদ্ধার সহিত দান করাই যে স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য এবং অশ্রদ্ধার সহিত দান করা যে সে রূপ নহে, ইহা সকল মনুষ্যেরই মনে স্বভাবতঃ প্রতীয়মান হয়। অতএব সত্য-জ্ঞান-মূলক শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের অনুযায়ী আচরণকেই স্বাধীন কার্য্য বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে ইহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইবে যে, ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে যখন আমাদের শ্রদ্ধা রহিয়াছে, তখন তাঁহাতে আত্মা সমর্পণ করাই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য এবং তাহার বিপরীতাচরণ করাই পরাধীনতার লক্ষণ।

আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের যাহা প্রধান লক্ষ্য তাহাকেই যেমন বলা যায়—পারমার্থিক সত্য, সেইরূপ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার যাহা প্রধান লক্ষ্য তাহাকেই বলা যায়—পারমার্থিক মঙ্গল। আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান

যেমন দেখাইয়া দেয় যে, সকলের মূলে এক জন মহান্ পুরুষ বর্ত্তমান আছেন—যিনি পরম সত্য ; সেইরূপ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা চাহে যে, সকলের উপরে এক জন বিধাতা পুরুষের বর্ত্তমান থাকা উচিত—যিনি সর্ব্বতো-ভাবে মঙ্গল স্বরূপ,—সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে যিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন। ঈশ্ব-রের সহিত যোগেই আমরা স্বাধীন হই ; এই হেতু আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা হইতে যে কোন নিয়ম স্বতঃ উদীরিত হয়, তাহা ঈশ্ব-রের ইচ্ছাকেই জ্ঞাপন করে ; এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা-মূলক আমাদের এই যে স্বাধীন ইচ্ছা ইহা-দ্বারা যে সকল নিয়ম প্রকটিত হয়, তাহাই ন্যায় ও ধর্ম্মের নিয়ম। অন্তরতম পরমাত্মার সহিত নিগূঢ় সহবাসে আত্মা যখন পরিতৃপ্ত হয়, তখন বিষয়ের আকর্ষণ তাহার উপরে বল করিতে পারে না ; এই হেতু এ অবস্থায় আত্মা বিষয় হইতে নিয়ম ভিক্ষা করে না কিন্তু ঈশ্বর-দত্ত আপন অকৃত্রিম স্বভাব হইতে নিয়ম উদ্ভাবন করে,—পরমাত্মা হইতেই নিয়ম

চাহিয়া পায়। ধর্ম্মের নিয়ম কি? ইহার তথ্য নির্ণয় করিতে গেলে এক দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যা কহিবে না, অন্যের ধন অপহরণ করিবে না, ব্যভিচার করিবে না,—ধর্ম্মের নিয়ম এইরূপ বহুসংখ্যক কিন্তু আর এক দিকে দেখিলে, উক্ত তাবতের সার এই একটি মূলনিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া পবিত্র হইবে। আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার সার্ব্ব-লৌকিক মঙ্গল ভাব যাহা আমরা উপলব্ধি করি, তাহা যে এখানে আছে ওখানে নাই, এ জীবে আছে ও জীবে নাই, এ মনুষ্যে আছে ও মনুষ্যে নাই, এমন কদাপি নহে;—তাহা সর্ব্বত্রগামী,—তাহা আত্মপর-নির্ব্বিশেষ। ঈশ্বরের হস্ত হইতে এই রূপ সার্ব্ব-লৌকিক মঙ্গল-রস পান করিয়াই সাধু মহাত্মারা স্বাধীন হন,—স্বাধীন হইয়া কি করেন? না—কেবল আপনার আপনার মঙ্গল নহে, কিন্তু মঙ্গল—যাহা আত্মপর-নির্ব্বিশেষ, তাহারই অনুষ্ঠানে

সচেষ্ট হন ; ঈশ্বরের মঙ্গল-সন্নিধানের গুণে নির্ভয় হইয়া, তাঁহারা মঙ্গল সাধন কার্য্যে সর্ব্বদাই এরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকেন যে, যখনই কোন মঙ্গল কার্য্য তাঁহারদের সামর্থ্যের মধ্যে আইসে, তখনই তাঁহারা সুবিবেচনা ও সুনিয়ম পূর্ব্বক তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করেন। কারণ, ঈশ্বরের উপাসনা-জনিত যাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাসটি দৃঢ় হইয়াছে যে, ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করিবেনই, তিনি কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য কেন না সযত্ন হইবেন। এই রূপে যাঁহারা স্বাধীন ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের হইয়া কার্য্য করেন—যাঁহারা কেবল আপনার আপনার নহে কিন্তু জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁহারা আপনাকে যেমন প্রতারণা করেন না, পরকেও সেই রূপ প্রতারণা করেন না ; আপনার অধিকারকে যেমন অবহেলা করেন না, পরের অধিকারকেও সেই রূপ অমান্য করেন না ; আপনাকে যেমন বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন, পরকেও সেই রূপ বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে

দেখেন,—তাঁহারা স্বভাবতই এই প্রকার আচরণ করেন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, মিথ্যা কহিবে না, পরের ধন অপহরণ করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, এ সকলই এই এক মূল-নিয়ম হইতে ব্যবকলন করিয়া পাওয়া যায় যে, সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরেতে শ্রদ্ধার সহিত আত্ম-সমর্পণ করিবে। "যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

পঞ্চম অধ্যায়।

স্বার্থিক মঙ্গল এবং তদনুযায়ী মূল-নিয়ম।

আমাদের আত্মা আপন ইচ্ছায় পরমাত্মা কর্ত্তৃক নিয়মিত হইলে, সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন আমাদের মনের প্রবৃত্তি-সকল আমাদের স্বীয় আত্মা কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়, তখনই আমাদের স্বার্থিক মঙ্গল সম্পাদিত হয়।

স্বার্থিক মঙ্গল-সাধনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যদি কোন প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তবে তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, যে কারণে ইহা কর্ত্তব্য যে, সমুদায় জগৎ ঈশ্বরের অধীন হইয়া চলে, সেই কারণেই কর্ত্তব্য যে, আমাদের সমুদায় প্রবৃত্তি আমাদের আত্মার অধীন হইয়া চলে। ঈশ্বরের অধীন হইয়া চলা যে কি কারণে কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের অধীন হইয়া আমরা যখন জগতের মঙ্গল-সাধনে ব্রতী হই, তখন আমারদের নিজের নিজের মঙ্গল-সাধন কি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে? কখনই না;—আমরা প্রতিজনেই জগতের অন্তর্গত. এই জন্য জগতের মঙ্গল সাধন করিতে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে আমারদের আপনারদের মঙ্গলও সাধন করিতে হয়।

সমুদায় আত্মার মঙ্গল সাধন করা স্বতন্ত্র এবং বিষয়াভিমুখীন আত্মার প্রবৃত্তি-সকলের মঙ্গল সাধন করা স্বতন্ত্র। আমরা যদি কেবল আমারদের জ্ঞানেরই উন্নতি সাধন করি, তাহা হইলে তাহাতে আমারদের ভাবের উন্নতি

সাধন করা হয় না; যদি কেবল ভাবেরই উন্নতি সাধন করি, তাহা হইলে তাহাতে আমারদের জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা হয় না; এই রূপ, যে মঙ্গল আমারদের কোন একটি বিশেষ অবস্থার উপযোগী, তাহা অন্য এক অবস্থার অনুপযোগী হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। অতএব আমারদের সমুদায় আত্মার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমাদের সর্ব্ব-প্রথমে কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে আমাদের মনের বৃত্তি-সকল আত্মার অধীনে পরিচালিত হয়।

প্রথম কর্ত্তব্যটি সাধনের নাম পারমার্থিক মঙ্গল-সাধন। আমরা আমারদের নিজের চেষ্টায় কেবল আপন প্রবৃত্তি-বিশেষকে বিষয়েতে নিয়োগ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের সমুদায় আত্মাকে চরিতার্থ করিতে হইলে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা কোন রূপেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না; পরমাত্মাতে আত্ম-সমর্পণ করিলেই আমারদের সমুদায় আত্মা চরিতার্থ হয়, ইহাতেই আমাদের

ধর্ম্ম হয়, ইহারই নাম পারমার্থিক মঙ্গল, এ মঙ্গলের বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য যাহা উপরে উল্লিখিত হইল, কি না—আমাদের মনের বৃত্তি-সকলকে আত্মার অধীনে রাখিয়া সাংসারিক কার্য্য-সকল নির্ব্বাহ করা, ইহারই নাম স্বার্থিক মঙ্গল-সাধন. ইহারই বিষয় এক্ষণে বিবেচনা করা যাইতেছে।

আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, প্রবৃত্তি-সকলকে আত্মার বশীভূত করাকে যদি স্বার্থ-সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে স্বার্থ শব্দের চলিত অর্থের প্রতি নিতান্তই বিমুখ হইয়া উহাকে এক অযোগ্য উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ; কিন্তু স্বার্থ-সাধন শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি যদি একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ওরূপ ভ্রম কখনই মনে স্থান পাইতে পারিবে না। স্বার্থ-সাধন শব্দের অর্থ এই যে. আমাদের নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করা ; এরূপ করিতে হইলে আমাদের প্রবৃত্তি-সক-

লকে আপন বশে রাখা নিতান্তই প্রয়োজ-
নীয় ; কেন না যদি আমারদের প্রবৃত্তি-সকল
বিনা-নিয়মে যথা তথা ধাবিত হয়, তাহা
হইলে কি রূপে আমরা আমারদের নিজের
কোন অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইব ? মনে
কর যে, কতক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে
পারিলে আপাততঃ আমারদের অভীষ্ট সিদ্ধ
হয় ; দেখ, এই একটি স্বার্থ উপযুক্ত-রূপে
সাধন করিতে হইলে, আপন মনোবৃত্তি-সক-
লকে কেমন বশীভূত করিতে হয়,—আল-
স্যকে পরাজয় করিতে হয়, বিলাস-লালসাকে
দমন করিতে হয়, তৎপরতা অভ্যাস করিতে
হয় ; এই রূপ যখন আমারদের মনো-
বৃত্তি-সকল ক্রমে ক্রমে আমাদের আত্মার
বশে সংস্থাপিত হয়, তখনই আমরা যথার্থ
রূপে স্বার্থ-সাধনের—কি না স্বকীয় অভীষ্ট
সাধনের উপযুক্ত হই। পুনশ্চ যখন আমার-
দের মনোনীত অর্থ-লাভে আমরা কৃতকার্য্য
হই, তখন তাহাকে আমরা ইহারই জন্য
স্বার্থ-সিদ্ধি বলি, যেহেতু তাহাতে আমরা

আমারদের মনোবৃত্তি-সকলকে যথাভিরুচি সুনিয়ম অনুসারে চালাইতে নানা প্রকার পথ পাই। কিন্তু সেই অর্থ-সহকারে যদি আমরা কেবল উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি-সকলের সেবায় রত হই, সুতরাং প্রবৃত্তি-সকলকে নিয়ম-বদ্ধ করিয়া পরিচালনা করিতে ভার বোধ করি, তাহা হইলে সে অর্থ-দ্বারা আমার-দের স্বার্থ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা আমারদের অনর্থই সাধিত হয়। পূর্ব্বে অব-ধারিত হইয়াছে যে, সর্ব্ব-জগতের সমশুভা-কাঙ্ক্ষী পরমাত্মার অধীনে আত্মাকে নিযুক্ত করাকে পরমার্থ-সাধন কহে,—এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে যে, স্বীয় প্রবৃত্তি-সকলকে আত্মার অধীন করিয়া পরিচালনা করাকেই স্বার্থ-সাধন কহে।

সমুদায় জগতের মঙ্গল—যাহা আমাদের কাহারও নিজের অভিপ্রেত ক্ষুদ্র মঙ্গম নহে, পরন্তু যাহা অসীম মঙ্গল, যাহা অসীম উন্ন-তির চিরবাঞ্ছিত লাভাতীত অনন্ত ফল, সে মঙ্গলের প্রবর্ত্তক কেবল একমাত্র পরমেশ্বর;

এই জন্য সে মঙ্গল যদিও আমারদের প্রজ্ঞাতে অনিবার্য্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি তাহাকে আমরা বুদ্ধিতে কোন রূপেই আয়ত্ত করিতে পারি না; কেবল আমারদের নিজের কল্পিত মঙ্গলকেই আমরা আপন বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি এবং স্বীয় বুদ্ধিতে মঙ্গল কল্পনা করিয়া যে পরিমাণে আমরা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারি, সেই পরিমাণে সেই কল্পিত মঙ্গলের মূলীভূত প্রজ্ঞা-নিহিত বাস্তবিক মঙ্গলেতে আমাদের বিশ্বাস বল পাইতে থাকে। আমাদের আত্মার স্বভাবই এই যে, সে প্রজ্ঞা-দ্বার দিয়া পরমাত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বুদ্ধি-দ্বার দিয়া বিষয়-কল্পনায় ব্যাপৃত হয়, উভয় কার্য্যই নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় এক যোগে নির্ব্বাহ করে; তুলাদণ্ড যেমন—এ দিকে শিরঃসমুন্নত কণ্টক দ্বারা গগন-শিখরের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করে ওদিকে স্কন্ধালম্বিত রজ্জু দ্বারা ধরাকৃষ্ট ভারদ্বয় বহন করে, উভয় কার্য্যই একত্র নিষ্পন্ন করে,—সেই রূপ।

ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর-নির্ব্বিশেষ মঙ্গলকে যদিও আমরা আয়ত্ত করিতে পারি না, কিন্তু আমরা তাহার অধীন হইতে পারি, আমরা তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। যদিও আমরা শুদ্ধ কেবল নিজের চেষ্টায় সে মঙ্গল-সাধনের বিন্দুমাত্রও সম্পন্ন করিতে পারি না, তথাপি আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি যে, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছা কর্ত্তৃক যেন আমরা-সকলে নিয়-মিত হই; এই রূপ যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আমাদের প্রার্থনার যোগ হয়, তখন তাহা হইতে প্রসূত অমৃত ফল-স্বরূপ এই একটি সত্য তিনি আমারদের আত্মাতে সমর্পণ করেন যে, তাঁহার সেই মঙ্গল ইচ্ছা নির-ন্তরই সাধিত হইতেছে, তাহার জন্য কিছু-মাত্র শঙ্কা নাই;—কথায় তিনি আমাদিগকে কিছুই বলেন না, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রেত মঙ্গল-ভাবের যথা-পরিমাণ আভাস দ্বারা আমারদের আত্মাকে এরূপ পূর্ণ করেন যে, তাহাতে নিমেষের মধ্যে আমাদের আত্মা

অনুপম বল বীর্য্য ও শান্তিতে পরিপ্লাবিত হয়। এই রূপ, ঈশ্বরের প্রসাদ যাহা সতত সর্ব্বত্র অপার-করুণাবনত রহিয়াছে, তাহাকে আমারদের নিজ আত্মাতে আদরের সহিত আহ্বান-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে গ্রহণ করা এবং তথায় তাহাকে অটল রূপে প্রতিষ্ঠা করা, আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ তাহাকে সাধ্যানুসারে পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, স্বদেশের মধ্যে, পৃথিবীর মধ্যে, উত্তরোত্তর ক্রমশঃ বিস্তার করা—আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

আদান প্রদানের সামঞ্জস্য-বিধি যাহা জগতের মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, পারমার্থিক জগতের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। আমরা ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিলে, ঈশ্বর আমারদের আত্মাতে তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করিয়া আমারদের সমুদায় কামনা পূর্ণ করেন। আত্মপর-নির্ব্বিশেষ পূর্ণ মঙ্গলেতে আমরা যে পরিমাণে আমাদের আত্মা সমর্পণ করি, সে মঙ্গলও সেই

পরিমাণে আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে আসিয়া বসতি গ্রহণ করে। এই রূপে,—অসীম আকাশ ব্যাপিয়া, যুগ-যুগান্তর পরিমাপন করিয়া, সমুদায় জগতের মধ্যে যে এক অসীম মঙ্গল-ভাব স্বকার্য্য-সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার কণা-মাত্র প্রসাদ যদি আমরা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমরা কি না সম্পদ লাভ করি? তাহা হইলে সমুদায় জগৎ যেমন একটি সুন্দর শৃঙ্খলায় গ্রথিত হইয়া ঈশ্বরের অধীনে নিযুক্ত রহিয়াছে, সেই রূপ আমাদের মনের সমুদায় প্রবৃত্তি সুশৃঙ্খলার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের নিজ নিজ আত্মার অধীনে সংস্থাপিত হয়। এই রূপ যখন আমরা ঈশ্বরাভিপ্রেত মঙ্গল-ভাব অনুসারে আমাদের প্রবৃত্তি-সকলকে যথানিয়মে পরিচালনা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হই, তখনই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বার্থের পথ অবলম্বন করি। কেন না, ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তি—ইহারা আমাদের স্বার্থ-সাধনের উপায় মাত্র; সাক্ষাৎ স্বার্থ

সাধন কি? না স্বকীয় মনের বৃত্তি-সকলকে সামঞ্জস্যরূপে চরিতার্থ করা, ইহা হইলেই স্বার্থ-সাধনের কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না।

শুদ্ধ কেবল পারমার্থিক মঙ্গল-সাধনের নিয়ম এই যে, ঈশ্বরের অধীন হইয়া পাপ হইতে বিরত হইয়া, সকল অবস্থাতেই মঙ্গল সাধন করিতে হইবে; এবং তদুত্তর স্বার্থিক মঙ্গল-সাধনের নিয়ম এই যে, ঈশ্বর আমাকে আপাততঃ যেরূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন সে অবস্থাতেও মঙ্গল সাধন করিতে হইবে;—যথা; ঈশ্বর আমাকে এই রূপ মনোবৃত্তি-সকল দিয়াছেন—এসকলকে যথোপযুক্ত রূপে চালনা করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ শরীর দিয়াছেন—ইহাকে যথোপযুক্ত রূপে পোষণ করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ পরিবার দিয়াছেন—পরিবারস্থিত-সকলের প্রতি সম্বন্ধোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি সহকারে যথোপযুক্ত রূপ ব্যবহার করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ সমাজে সমর্পিত করিয়াছেন,—অতএব

মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে হইবে, সমতুল্য ব্যক্তিকে সমাদর করিতে হইবে, অনুগত ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে, এই রূপ সকলের প্রতি যথোচিত ভদ্র ব্যবহার করিতে হইবে ; তিনি আমাকে এই রূপ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন,—অতএব স্বদেশের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, স্বদেশের যাহাতে গৌরব রক্ষা হয়, তাহার জন্য যত্ন পাইতে হইবে ; তিনি আমাকে এই পৃথিবীতে রাখিয়াছেন,— পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করা যতটুকু আমাদের সাধ্যায়ত্ত তাহা করিতে হইবে। পুনশ্চ যদি এ রূপ হয় যে, আমি কৃষকের গৃহে জন্মিয়া কৃষিকার্য্যই শিক্ষা করিয়াছি, তাহা হইলে সেই কার্য্যই উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবে ; যদি এরূপ হয় যে, আমি ধনবানের গৃহে জন্মিয়া ধনোপার্জ্জন-বিষয়ে অথবা কোন বিদ্যা-বিশেষের অনুশীলন-বিষয়ে শিক্ষিত হইয়াছি, তাহা হইলে যাহাতে আমার অবস্থার উপযুক্ত রূপে সেই ধনের আয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে অথবা সেই বিদ্যা-

বিশেষের আলোচনা হইতে পারে, তাহা করিতে হইবে ইত্যাদি।

কিন্তু এরূপ কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, উপস্থিত সকল অবস্থাই আমাদের বিহিত স্বার্থ সাধনের পক্ষে সমান রূপ অনুকূল হইবে; প্রত্যুত ইহা সকলেরই দৃষ্টিপথে সর্ব্বদাই পড়িয়া আছে যে, কোন অবস্থা আমাদের স্বার্থের অল্প অনুকূল, কোন অবস্থা তাহার অধিক অনুকূল, কোন অবস্থা তাহার প্রতিকূল,—আমরা প্রতি জনেই এই রূপ নানাবিধ শুভাশুভ অবস্থার মধ্যে নিয়তই স্থিতি করিতেছি; ইহার মধ্যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কর্ত্তব্য এই যে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আপন শুভ বুদ্ধিকে সর্ব্বদা সতেজ রাখা,—যেন বাহিরের কোন অশুভ ঘটনার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা আপনারাও আবার আমাদের মঙ্গলের প্রতিকূল হইয়া না দাঁড়াই। আকাশস্থিত চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা যখন ভূমিতে পদচারণ করি তখন বোধ হয় যেন চন্দ্র আমা-

দের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে ; সেই রূপ পরিবর্ত্তনশীল ঘটনা-সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা যখন কার্য্য করি, তখন মনে হয় যে, সেই ঘটনা-সকলের সঙ্গে আমরা আপনারাও পরিবর্ত্তিত হইতেছি, কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন ভাবে স্বপদে দণ্ডায়মান থাকি, তখন দেখিতে পাই যে, আমরা আপনারা স্থির রহিয়াছি, বাহিরের ঘটনা-সকলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, এক মাত্র পরমেশ্বরই কেবল সর্ব্বতোভাবে অপরিবর্ত্তনীয় ; এতদ্ভিন্ন আমাদের এই যে আত্মা ইহা ক্রমে ক্রমে যত পরিপক্ক হয় ততই অধিকতর অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিতে পারে ; যেমন বালকের চঞ্চল মন বয়োধিক্য সহকারে ক্রমে ক্রমে স্থৈর্য্য লাভে সমর্থ হয়,—সেই রূপ। তথাপি আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, আমরা যতদূর পারি ব্রহ্মেতে অবিচল রূপে সংস্থিত থাকিয়া—মনোমধ্যে কেবল মাঙ্গলিক বিষয়-

সকলই কল্পনা করি, এবং বাহিরের শুভা-শুভ ঘটনা-সকলকে সেই প্রকার কল্পনার স্রোতে সংগঠিত করিয়া লইতে সাধ্যমতে চেষ্টা করি ; ইহাতে যদি আমাদের সে চেষ্টা বিফলও হয়, তথাপি আমাদের মনের স্বচ্ছ-ন্দতা অকুতোভয়তা কার্য্যদক্ষতা, এই প্রকার সকল অমূল্য স্থায়ী ফল প্রাপ্তি হইতে আমরা কখনই বঞ্চিত হইব না ; ঈশ্বরের অধীন হইয়া, বিচক্ষণতা সাহস ধৈর্য্য ইত্যাদি সদ্‌গুণ দ্বারা মনের প্রবৃত্তি-সকলকে বশীভূত করিয়া আমরা যদি আমাদের কোন ন্যায্য অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তাহার কোন না কোন ফল আমরা অবশ্যই লাভ করিব, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

পুনর্ব্বার কহিতেছি যে, ঈশ্বর আমা-দিগকে যে রূপ সাংসারিক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন,—আপন প্রবৃত্তি-সক-লকে দমন করিয়া সেই অবস্থার উপযুক্ত রূপে সংসার-কার্য্যে রত হওয়া, অগ্রে বর্ত্ত-মান অবস্থার উপযুক্ত হওয়া পশ্চাতে সাধ্যা-

মুসারে ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করা. বিহিত স্বার্থ-সাধনের ইহাই পদ্ধতি। আমি যদি বর্ত্তমান সমাজেরই উপযুক্ত না হই, তাহা হইলে সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি-সাধনের জন্য চেষ্টা করা কি আমার পক্ষে কখন শোভা পায়? আমি যদি স্বদেশেরই মঙ্গল সাধন করিতে অযোগ্য হই, তাহা হইলে পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবার ভার গ্রহণ করা কি আমার পক্ষে শোভা পায়? আমি যদি স্বদেশকে ঘৃণা করি, স্বদেশের নিন্দাবাদ করিতে লজ্জা বোধ না করি, তাহা হইলে পৃথিবীকে ভালবাসা কি আমার পক্ষে শোভা পায়? আমি যদি আপনার মনকে বশীভূত করিতে যত্ন না করি, তাহা হইলে উপদেশ অথবা বহির্দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যের উন্নতি সাধন করিতে সচেষ্ট হওয়া কি আমার পক্ষে ভাল দেখায়? পূর্ব্ব অধ্যায়ে দৃষ্ট হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়া আত্মপর-নির্ব্বিশেষ মঙ্গল সাধন করা আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু সে মঙ্গল সাধনের বিহিত

উপায় যে কি—তাহা অধুনা এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, আপনার মঙ্গল সাধন করিয়া পরিবারের মঙ্গল সাধন করিতে উপযুক্ত হইবে, পরিবারের মঙ্গল সাধন করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে উপযুক্ত হইবে, সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবার উপযুক্ত হইবে, ইত্যাদি। বর্ত্তমান স্থলে বিধানের এই যে অগ্র পশ্চাৎ ভাব, যথা,—অগ্রে আপনার মঙ্গল সাধন করিবে পরে অন্যের মঙ্গল সাধন করিবে ইত্যাদি,—ইহা সময়ের অগ্র পশ্চাৎ নহে ;—একই সময়ে যদি আমি আপনার মঙ্গল সাধন করিতে পারি, পরিবারের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, তবে তাহা আমার পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য ; বীর পুরুষেরা যখন স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে সমরে আহূত হন, তখন তাঁহারা এই রূপ মনে করেন যে, দেশের মঙ্গল হইলেই সমাজের মঙ্গল হইবে, সমাজের মঙ্গল হইলেই আমার পরিবারের মঙ্গল

হইবে, পরিবারের মঙ্গল হইলে তাহাতেই আমার মঙ্গল ;—এই রূপ আপনার পর্য্যন্ত মঙ্গল মনে কল্পনা করিয়া রণে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য ; অগ্র পশ্চাৎ ভাব ব্যক্ত করিবার কেবল এই মাত্র তাৎপর্য্য যে, জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য উপযুক্ত হইতে হইলে তাহার (সময় সম্বন্ধে নহে কিন্তু আবশ্যকতা সম্বন্ধে) প্রথম উপায়—নিজের মঙ্গল সাধন করা, দ্বিতীয় উপায়—পরিবারের মঙ্গল সাধন করা, ইত্যাদি। পুরাবৃত্তেও এই রূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন মহাত্মা জগতের কোন বিশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তিনি প্রথমে আপনার মঙ্গলের জন্যই চেষ্টা পাইয়াছেন, পরে পারিষদ্‌বর্গের, পরে স্বদেশের, এই রূপেই তিনি ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদনিক্ষেপ করিয়াছেন। জগদ্‌বিখ্যাত মহাত্মগণের চরিতাবলি পাঠ কর—দেখিবে যে, যাঁহারা নীচ পদবী হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পদবীতে

আরোহণ করিয়াছেন; অথবা ক্ষুদ্র ব্যাপারে হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বৃহৎ ব্যাপারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারাই সমধিক সিদ্ধি-লাভে সমর্থ হইয়াছেন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, পারমার্থিক মঙ্গল সাধন করা যদি সত্যই আমারদের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে স্বার্থিক মঙ্গল সাধন করা তাহার একটি আনুষঙ্গিক উপলক্ষ না হইয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহার সার সংকলন করিয়া স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, স্বার্থকে পরমার্থের অধীন করিয়া বিহিত রূপে তাহার সাধন করিবে; অর্থাৎ—আমার আপনার মঙ্গল, আমার পরিবারের মঙ্গল, আমার দেশের মঙ্গল, ইত্যাদি আমার সম্পর্কীয় যে কোন মঙ্গল হউক না, সমুদায়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর-নির্ব্বিশেষ অনন্ত মঙ্গলের অন্তর্গত, এই রূপ জানিয়া তদনু-সারে কার্য্য করিতে হইবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া

যেমন পরমার্থত আমাদের সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য; সেই রূপ আবার গৃহস্থ হওয়া, সামাজিক হওয়া, স্বদেশানুরক্ত হওয়া, ধর্ম্মানুগত স্বার্থ-সাধন উদ্দেশে এই সকল উপায় অবলম্বন করা, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য তাহার আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাকৃতিক মঙ্গল এবং তদনুযায়ী মূল-নিয়ম।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে নির্দ্ধারিত হইল যে, আমাদের বিষয়াভিমুখীন প্রবৃত্তি-সকলকে—এক কথায় এই যে—মনকে, আত্মার অধীনে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। আত্মা যেমন পরমাত্মাকে চায়, মন সেই রূপ বিষয়কে চায়; এবং মনের এই বিষয়-কামনা কেবল বিষয়েতে পর্য্যবসিত হইয়া নিরর্থক না যায়, এই

জন্য ইহা কর্ত্তব্য যে, মনকে যথোচিত রূপে আত্মার বশে রাখা হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ বিষয়-কামনা-সকলকে তাহারদের বৈধ চরিতার্থতা হইতে বঞ্চিত করিয়া মনকে যে অনর্থক কষ্ট দেওয়া—ইহা কখনই আমারদের কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কি রূপ বিষয়-কামনা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এবং কি রূপ বিষয়-কামনাই বা তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ, ইহা জানিতে হইলে তাহার এই মাত্র উপায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, "যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ। তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্ব্বিকৃতিশ্চ যা"। যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে এবং কল্যাণেতে নিবেশিত হইয়াছে, তিনিই সম্যক্ বুঝিয়াছেন—প্রকৃতিই বা কি এবং বিকৃতিই বা কি।

ধর্ম্ম-জীবী আত্মা এবং অন্ন-জীবী শরীর—পরমেশ্বর আমাদিগকে উভয়ই দিয়াছেন। আত্মা সদসদ্ বিবেচনা পূর্ব্বক ধীর-ভাবে কার্য্য করে, শরীর উপস্থিত অভাবের তাড়-

নায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া কার্য্য করে; আত্মা পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া ভোজ্য সামগ্রী-সকলের আয়োজন করে, কিন্তু ক্ষুধার উদ্দী-পন-সময়ে সে সকল সামগ্রী যখন ভোজ-নার্থে পরিবেশিত হয়, তখন আমাদের শারীরিক প্রকৃতি ভাবনা চিন্তার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া সে সকলের দ্বারা অবিলম্বে ক্ষুন্নি-বৃত্তি-কার্য্যে রত হয়। কিন্তু মনুষ্যের উপর ক্ষুৎপিপাসাদি প্রবৃত্তি-সকলের কদাপি এত বল হইতে পারে না—যদি পারে এমন হয় তবে তাহা হইতে দেওয়া উচিত হয় না—যে তাহার সদসদ্ বিবেচনা তৎকর্ত্তৃক একে-বারে পরাভূত হইয়া যাইবে। অতএব আ ত্মাকে সদসদ্ বিবেচনাতে নিযুক্ত রাখিয়া তদনুসারে আমরা যদি আমাদের কোন শারীরিক বা মানসিক প্রকৃতিকে চরিতার্থ করিতে পারি তবে তাহা করা অবশ্যই আমা-দের কর্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই রূপ ভাব ব্যক্ত করেন যে, প্রকৃতি যে—সেগু

প্রজ্ঞাবান্, প্রকৃতিরও এক প্রকার সদসদ্
বিবেচনা আছে; বৃক্ষ আপন আধার-ভূমিস্থ
অসার বস্তু হইতে সার বস্তু বিবেচনা করিয়া
লয়, মধুমক্ষিকা পুষ্প হইতে মধু বিবিক্ত
করিয়া লয়, পক্ষীরা শাবকদিগের বাসোপ-
যুক্ত করিয়া নীড় নির্ম্মাণ করে, এ সকল কার্য্য
যদি প্রজ্ঞার না হইবে তবে আর কাহার?
সাংখ্য দর্শনের মত এই যে, প্রকৃতির সন্নিধি-
বশতঃ আত্মা সুখ দুঃখে মুহ্যমান হয় এবং
আত্মার সন্নিধি-বশতঃ প্রকৃতি প্রাজ্ঞ জীবের
ন্যায় কার্য্য করে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া
দেখিলে এই রূপ প্রতীতি হইবে যে, প্রজ্ঞা
কেবল পরমাত্মাতেই মূল সমেত অবস্থান
করে, তথা হইতেই তাহার মহিমা অবতীর্ণ
হইয়া—আধ্যাত্মিক জগতে বুদ্ধির আশ্রয়-
ভূমি রূপে এবং ভৌতিক জগতে প্রকৃতির
আশ্রয়-ভূমি রূপে—দুয়েতে দুই রূপে প্রতি-
ফলিত হয়। সুতরাং প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধি-
রও ধন নহে, প্রকৃতিরও ধন নহে, উহা বুদ্ধি
এবং প্রকৃতি উভয়ের মূলস্থিত ঈশ্বরেরই

ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরের ধনেই আমরা ধনী, তাঁহারই ধনে প্রকৃতি ধনবতী।

আমাদের আত্মার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আত্মা করুক এবং আমারদের প্রকৃতির যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রকৃতি করুক, তাহা হইলেই আমাদের আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়ই সমবেত হইয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই। আমাদের আত্মার কর্ত্তব্য এই যে, সে জ্ঞান ভাব এবং স্বাধীন ইচ্ছা সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করে, প্রকৃতির কর্ত্তব্য এই যে, সে অজ্ঞাতসারে অন্ধভাবে ঈশ্বরের কার্য্য করে; প্রকৃতির যাহা কর্ত্তব্য সে তাহা অনুক্ষণই সাধন করিতেছে তাহাতে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই; আমাদের আত্মা যেন আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি সেই রূপ যত্নশীল হয়, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। যে পথে চলিলে জ্ঞান-ভাব এবং ধর্ম্মের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়—আত্মা সেই ঈশ্বরের পথে স্বেচ্ছায় সঞ্চরণ করুক, প্রকৃতির অন্ধকারময় পথে

বিচরণ করিবার তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; প্রকৃতির পথে প্রকৃতিই বিচরণ করুক। প্রকৃতির গুণে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস যথা-নিয়মে গমনাগমন করিতেছে; আমাদের আত্মারও এ রূপ ক্ষমতা আছে যে, সে আপন ইচ্ছাক্রমে সেই নিশ্বাস প্রশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে নিয়মিত করে; কিন্তু আত্মা যদি ঐরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি প্রকৃতির কার্য্য-সকল স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে আত্মারও কোন লভ্য নাই, প্রকৃতিরও কোন লভ্য নাই; প্রত্যুত আত্মার সেই অনধিকার চর্চার ছিদ্র দিয়া— আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়েরই কার্য্যের মধ্যে কতকগুলি অনিয়ম প্রবেশ করে। অত-এব উপস্থিত প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতা কার্য্য প্রকৃতির হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য এরূপ করিলে ঈশ্বরাভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়-মানুসারে উক্ত কার্য্য যথোচিত রূপে নির্ব্বা-হিত হইতে পারে; সে প্রাকৃতিক নিয়ম এই রূপ যে, যাহাতে আমাদের সমুদায় প্রবৃ-

ত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতার পক্ষে কোন ব্যাঘাত না জন্মে বরং তাহার পক্ষে আরও সুযোগ হয়, সেই নিয়মানুসারে প্রত্যেক প্রবৃত্তি স্ব স্ব চরিতার্থতায় নিযুক্ত থাকুক; এক কথায় এই যে, যখন যে কোন প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়, তাহা যেন আমাদের বৈধ স্বার্থকে অতিক্রম না করে, বরং তাহার পোষকতাতেই নিযুক্ত থাকে। প্রাকৃতিক নিয়ম প্রণালীর উদাহরণ ;—ক্ষুধার সময় আমাদের প্রকৃতি কেবল সেই টুকু মাত্র আহার চায় যাহাতে আমাদের অবসন্ন দেহ মনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইতে পারে; এই উপস্থিত ক্ষুৎপ্রবৃত্তিটি প্রকৃতি-অনুসারে চরিতার্থ হইলে আর আর সমুদায় প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়; কিন্তু যদি প্রকৃতির প্রতিকূলে অপরিমিত আহার করা যায়, তাহা হইলে আমাদের শরীর মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং উপস্থিত ভোগলালসা ভিন্ন অন্যান্য প্রবৃত্তি সকলের উপযুক্ত চরিতার্থতার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এই

রূপ, প্রকৃতি-অনুযায়ী পরিশ্রম করিলে সমুদায় শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হয়, কিন্তু অস্বাভাবিক পরিশ্রম করিলে তাহার বিপরীত ফল হস্তগত হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্যই এই যে, প্রত্যেক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা— অন্যান্য প্রবৃত্তি সকলের বৈধ চরিতার্থতার পোষকতা করুক ; ইহার অন্যথায় যদি কোন এক প্রবৃত্তি এরূপে চরিতার্থ হয় যে, তাহাতে আর আর প্রবৃত্তির বৈধ চরিতার্থতার ব্যাঘাত জন্মে, তবে তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী তাহার কোন সংশয় নাই।

পরমার্থ অথবা ধর্ম্ম আমাদের লক্ষ্য হইলে যেমন স্বার্থ তাহার এক আনুষঙ্গিক উপলক্ষ হয়, সেই রূপ বৈধ স্বার্থ অথবা, সমুদায় প্রবৃত্তির বৈধ চরিতার্থতা আমাদের লক্ষ্য হইলে, যে কোন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হউক তাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সহজেই চরিতার্থ হয়, অর্থাৎ ;—ক্ষুধার সময় ভোজ্য সামগ্রী চাই, কার্য্যের সময় কার্য্যালয়ে উপ-

স্থিত হওয়া চাই, শয়নের সময় শয্যা প্রস্তুত থাকা চাই, এই রূপ নানাবিধ প্রবৃত্তি যথা-কালে চরিতার্থ হওয়া চাই, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহার পর যে দ্রব্য আবশ্যক তাহা পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করা—স্বার্থের কার্য্য; এবং এই রূপে সমুদায় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা উদ্দেশে পূর্ব্ব হইতে দ্রব্যাদি সকল স্বার্থ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া থাকিলে. ক্ষুধা বা কর্ম্ম-পটুতা বা নিদ্রা—যখন যে প্রবৃত্তি উত্তে-জিত হউক তাহা প্রকৃতির নিয়মানুসারে আপনা হইতেই স্ব স্ব চরিতার্থতা-পথের অনু-বর্ত্তী হইতে পারে।

স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই রূপ অবধারিত হইয়াছে যে, পর-মার্থের অনুগত হইয়া স্বার্থ সাধন করা কর্ত্তব্য; এক্ষণে প্রাকৃতিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, বৈধ স্বার্থের অনুগত হইয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়।

উপসংহার।

আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি এইরূপ যে, তাহা কতক দূর যায়, তাহার ওদিকে আর যায় না। ইহা কেবল নহে যে, আমরা আমাদের জন্ম-সময়ে অজ্ঞান ছিলাম এবং মৃত্যু-সময়ে অজ্ঞান হইব; ফলতঃ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানিতে পাই যে, অন্তরের বার্ত্তা আমরা অল্প যাহা কিছু জানিতেছি, তাহার একটুকু ওদিকে গেলে প্রগাঢ় অজ্ঞানান্ধকার আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু সেই অন্ধকার-রূপ প্রশান্ত আবরণ আমাদের আত্মার পক্ষে পুষ্টি-জনক তাহার আর সন্দেহ নাই; নিস্তব্ধ নিশীথে মাতার ক্রোড়ে নিদ্রা যাওয়া যে রূপ, সেই রূপ জাগ্রত ঈশ্বরের ক্রোড়ে বিদ্যা-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আমরা কিয়ৎকাল

বিশ্রাম করিলে, বিকৃতির অবস্থা হইতে প্রকৃতিতে পদ নিক্ষেপ করিতে পারি। লোকে আক্ষেপ করে যে, শৈশব-সুলভ অকলঙ্ক সুখরত্ন গেলে আর ফিরে না; কিন্তু আমারদের অন্তঃকরণের মধ্যে এমন এক নিভৃত প্রদেশ আছে, যেখানে গেলে এখনই আমরা নিরীহ নিরাশ্রয় অজ্ঞান শিশু হইয়া যাই; যেখান হইতে আমরা আবার নূতন রূপে জীবন আরম্ভ করিতে পারি, যেখান হইতে পুনর্জাত হইয়া ফিরিয়া আইলে পূর্ব্ব জীবনের যে সকল মঙ্গল বৃত্তান্ত তাহাই আমাদের সম্বল হয়, যে সকল অমঙ্গল বৃত্তান্ত তাহা বস্তুতঃ যেমন অসৎ, কার্য্যতও তেমনি অসৎ রূপে পরিণত হয়। অতএব আমরা যে ঈশ্বরের আশ্রয়ে বাস করিতেছি ইহা জানিতে হইলে, আমাদের জন্ম কালের এবং মৃত্যুকালের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ এবং কল্পনা করিবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই, আপন অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এখনই আমরা তাহাতে নিঃসংশয় হইতে পারি।

যেখানে উত্তীর্ণ হইবার সময় আমাদের বুদ্ধির দীপালোক ম্লান হইয়া যায়, যেখানে আপনাকে অপূর্ণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই খানেই পরমেশ্বরের পূর্ণ মুখ-চ্ছবি বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বর আমাদের আত্মার স্রষ্টা পাতা এবং পরিত্রাতা—এই সুসংবাদ প্রজ্ঞা আমাদের প্রশান্ত আত্মাতে অতীব সুমধুর নিস্বনে সর্ব্বদাই বলিয়া দিতেছে, আমরা স্তব্ধ হইয়া শুনিলেই হয়। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, পরমেশ্বর আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান দিয়াছেন বলিয়াই আমরা আপনার গভীর অজ্ঞতা অবগত হইতে পারিতেছি এবং তাঁহার প্রতি সোৎসুক নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছি। তিনি আপনার একটুকু আভাস দেখাইয়া মনুষ্যকে ব্যাকুল করিয়া দিয়াছেন মনুষ্য তাই আর নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, কেবল দিবা নিশি তাঁহারই পদ চিহ্ন অনুসরণ করিয়া এক প্রদেশ হইতে উৎকৃষ্টতর আর এক প্রদেশে উপনীত হই-

তেছে। পশু পক্ষীদিগকে এ ভাবনা ভাবিতে হয় না; সুতরাং এ আনন্দেরও সহিত পরিচিত হইতে হয় না; কেবল মনুষ্যেরই এই অনন্য-পরিহার্য্য ব্যাকুলতা, মনুষ্যেরই এই অনন্য-বিতরিত আনন্দ।

আমরা অজ্ঞান ছিলাম, এক্ষণে জ্ঞান পাইয়াছি; জ্ঞান পাইয়া তদ্দ্বারা আমাদের অজ্ঞতা অবগত হইতেছি; এবং আপনার সেই অজ্ঞতার মধ্য দিয়া পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বরের আশ্রয়ে নির্ভর করিতেছি; অনন্তর তাঁহার প্রসাদে বুদ্ধির অতীত মূল-সত্য সকল আমাদের আত্মাতে দিন দিন উজ্জ্বলতর ভাবে দীপ্তি পাইতেছে, মূল-সত্য সকল দ্বারা আমাদের বুদ্ধি সংশোধিত হইতেছে, এবং সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধির চালনা দ্বারা আমাদের শ্রীসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া অবস্থার উন্নতি হইতেছে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বর যেমন আমাদের জ্ঞানের স্রষ্টা, সেই রূপ তিনি আমাদের জ্ঞানের পালনকর্ত্তা ও প্রবর্দ্ধয়িতা; কিন্তু পূর্ব্বে

আমাদের অনিচ্ছায় আমরা ঈশ্বর-প্রসাদে অজ্ঞান হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের ইচ্ছা চাই, যত্ন চাই, প্রার্থনা চাই, তাহা হইলে ঈশ্বর-প্রসাদে প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধির মলিন মুখকে উজ্জ্বল করিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগকে জ্ঞান দান করিবে; এই রূপ করিয়া আমরা অনন্তকাল পুনঃ পুনঃ উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকিব।

আমাদের প্রথম শৈশবাবস্থায় আমরা প্রকৃতির সুকোমল ক্রোড়ে নিমগ্ন হইয়া থাকি; আমাদের আত্মা তখন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে; এবং ক্ষুধা হইলে ক্রন্দন, হস্তপদ পরিচালনা, প্রকৃতি আমাদের হইয়া এই সকল কার্য্য অবিশ্রান্ত সম্পন্ন করিতে থাকে। ক্রমে আমাদের অন্তঃকরণে জ্ঞান আবির্ভূত হয়; ক্রমে আমরা জানিতে থাকি যে, এই বস্তুটিতে আমার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষে মাতাই আমার সহায়। পূর্ব্বে ক্ষুধা হইত এবং স্তন্য পান দ্বারা

তাহা নিবৃত্ত হইত, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাশান্তির কারণ কি তাহার আ-ভাস আমাদের জ্ঞানে অল্পে অল্পে প্রতি-ভাত হইতে থাকে; কারণ-ভাব বস্তু-ভাব জাতি-ভাব এই সকল ভাব ভিতর হইতে কার্য্য করিতে থাকে; সুতরাং এই সময়ে বিষয়-বিষয়ীর ভাব পরিস্ফুট হয়। পূর্ব্বে প্রকৃতি যাহা করিত তাহাই হইত; এক্ষণে আমরা আপনারা আমাদের সম্মুখস্থিত দ্রব্যাদি সকলের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে মনোনিবেশ করি; শৈশবাস্থায় প্রবৃত্তি চরি-তার্থ হইলেই যথেষ্ট হইত, বাল্যাবস্থায় তদ্ব্যতিরেকে স্বার্থ সাধনের চেষ্টা আসিয়া আমাদের সঙ্গ গ্রহণ করে; এক্ষণে "এ বস্তু তোমার নহে এ বস্তু আমার"—এই রূপে ক্রীড়া সামগ্রী বিশেষে আমরা আপনার স্বত্ব বলবৎ করিতে সচেষ্ট হই; ক্রমে ক্রমে আমাদের এরূপ অভ্যাস হয় যে, উপস্থিত প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে আপাততঃ অগ্রাহ্য করি, এবং যাহাতে স্ব স্ব প্রবৃত্তি সকল আমা-

দের ইচ্ছানুসারে চরিতার্থ হইতে পারে তদু-
পলক্ষে নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে
চেষ্টান্বিত হই। বাল্যকালে অধিকাংশ আ-
মরা কেবল আপনারই উদ্দেশে কার্য্য করি;
বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা আমরা আপনারই মনের
উন্নতি সাধন করি, ক্রীড়া এবং ব্যায়ামাদি
দ্বারা আমরা আপনারই শরীরের উন্নতি
সাধন করি, তদ্ব্যতীত পরিবারের ভরণ পোষণ.
জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন. বাল্যকালে এস-
কল লইয়া আমাদিগকে ভারগ্রস্ত হইতে
হয় না; পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে পরিবার,
সমাজ, দেশ, এই সকল লইয়া নানা চিন্তায়
নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতে হয়। এস-
ময়ে আমাদের আপনাদের যে কতটুকু বল
এবং কি যে দুর্ব্বলতা তাহার সবিশেষ পরি-
চয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং আপনার সেই
অকিঞ্চনতার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের নিরতিশয়
মহত্ত্ব আমাদের জ্ঞাননেত্রে উজ্জ্বলতর রূপে
প্রকাশ পাইতে থাকে। এই রূপে মনুষ্যের
জীবন প্রাকৃতিক মঙ্গল হইতে স্বার্থিক মঙ্গলে

এবং স্বার্থিক মঙ্গল হইতে পারমার্থিক মঙ্গ
ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে থাকে। কিন্
কি প্রাকৃতিক কি স্বার্থিক সমুদায় মঙ্গলই
পারমার্থিক মঙ্গলের অন্তর্গত। শিশু
প্রকৃতির হস্তে লালিত পালিত হয়. বালক
যে আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়
যুবক যে আপন স্বার্থকে ক্রমশ অন্যের
স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া তাহাকে উত্ত
রোত্তর সুচারু রূপে সংগঠিত করে, এ সক
লেরই সহিত পরমেশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভা
ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছে; এবং আমরা
মঙ্গলের পথে কতক দূর অগ্রসর হইলে
তাহা স্পষ্ট রূপে আমাদের জ্ঞানচক্ষুতে
প্রতিভাত হয়। পারমার্থিক মঙ্গলের সূর্য্যা
লোকে উত্থিত হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য এ
যে, সংসারের কঠোরতা-সকল বিস্মরণ পূর্ব্বক
প্রেমপূর্ণ পরমেশ্বরের আলিঙ্গনে আপনাকে
বিক্রীত করি; শরীর যন্ত্রের যন্ত্রণা হইতে
কৌশলে অবসৃত হইয়া অপার গম্ভীর সর্ব্ব
তঃপ্রসারিত প্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন হই। কৌশল